

কৈলাস ও মানসতীর্থ

স্বামী অপূর্বানন্দ



উদ্বোধন কার্যালয়, কলিকাতা

প্রকাশক
স্বামী আত্মবোধানন্দ
উদ্বোধন কার্যালয়
১, উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলিকাতা—৩

মুদ্রাকর
শ্রীজিতেন্দ্রনাথ দে
এক্সপ্রেস প্রিণ্টার্স লিমিটেড্
২০-এ, গৌর লাহা স্ট্রীট, কলিকাতা—৬

দ্বিতীয় সংস্করণ
আষাঢ়, ১৩৬২

আড়াই টাকা

নিবেদন

প্রধানতঃ তীর্থদেবতার টানেই যাত্রীরা যান তীর্থভ্রমণে। আমরাও কৈলাস ও মানসসরোবর-দর্শনে যে গিয়েছিলাম তারও পটভূমিকা ছিল কৈলাসপতি মহেশ্বরের দুর্নিবার আকর্ষণ। তবে ভ্রমণকাহিনী একপ্রকার ইতিহাসও বটে—তাই পশ্চিম-তিব্বত-ভ্রমণের এই বিবরণের মধ্যে আমরা ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গীতে কিছু কিছু আলোচনার অবতারণা করেছি। তিব্বত ও তিব্বতীদের সম্বন্ধে নূতন যে-সব তথ্য পেয়েছি তাও গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হল।

ভৌগোলিক পরিস্থিতি, রাষ্ট্রব্যবস্থা এবং ভাষার দিক দিয়ে পার্থক্য সত্ত্বেও ভারত ও তিব্বতের মধ্যে ধর্ম ও সংস্কৃতিগত একটা নিবিড় একত্ব পূর্বেও ছিল এখনও রয়েছে।

এই পুস্তকখানি-প্রণয়নে অনেকের কাছ থেকেই প্রচুর সহায়তা পেয়েছি; বিখ্যাত চিত্রশিল্পী শ্রীমণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত প্রচ্ছদপটটি এঁকে দিয়েছেন। সকলকেই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি। এই তীর্থযাত্রার বর্ণনা পড়ে কেউ যদি প্রাণে পরমদেবতার মানস-সান্নিধ্য ও ভাবস্পর্শ লাভ করেন তা হলেই নিজেকে ধন্য মনে করব।

গ্রন্থখানি উদ্বোধন আফিসে শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানীর সেবায় উৎসর্গ করা হ'ল।

শ্রীবিবেকানন্দ আশ্রম
শ্যামলাতল, আলমোড়া
বৈশাখ, ১৩৬০

গ্রন্থকার

সূচীপত্র

"... তোমার উদ্দেশে ॥
সূর্য প্রদক্ষিণ করি ফিরে সে পূজার নৃত্যতালে
ভক্ত উপাসিকা।
নম্রভালে আঁকে তার প্রতিদিন উদয়াস্তকালে
রক্তরশ্মি-টিকা।
সমুদ্র-তরঙ্গ সদা মন্দ্রস্বরে মন্ত্রপাঠ করে,
উচ্চারে নামের শ্লোক অরণ্যের উচ্ছ্বাসে, মর্মরে,
বিচ্ছেদের মরুশূন্যে স্বপ্নচ্ছবি দিকে দিগন্তরে
রচে মরীচিকা ॥ ..."

রবীন্দ্রনাথ

যাত্রা

কৈলাসের টান একটি শাশ্বত আদর্শের প্রতি টান। দেবতার পরম আবাহন। কৈলাস—বিশাল পর্বত, মনোহর বা কর্কশ প্রাকৃতিক স্থানমাত্র নয়, উহা যেন দিগম্বর সদাশিবের ভাবঘন প্রতীক। যুগযুগান্তর ধরে শত শত প্রাণে কৈলাসের আকর্ষণ জেগেছিল, কিন্তু অনেকেই সে আহ্বানে সাড়া দিতে পারে নি। সেইসব অতৃপ্ত বাসনাময় প্রাণগুলি যেন এক হয়ে সাড়া দিয়েছিল আমার ভিতর। হরগৌরীর আহ্বান আমার এ ক্ষুদ্র প্রাণে জ্বেলে দিল অমোঘ মিলনের আশার প্রদীপ। দুর্নিবার আকর্ষণ অনুভব করতে লাগলাম। অতৃপ্তদের প্রতিনিধিরূপে চলেছি কর্পূরগৌর মহাদেবের চরণতলে।

* * *

আমরা ছিলাম সাতজন।[১] সহযাত্রিগণ শ্যামলাতালে যে দিন এলেন, সেদিন শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের তৎকালীন অধ্যক্ষ স্বামী বিরজানন্দ মহারাজও ওখানে রয়েছেন। কৈলাসযাত্রীদের পেয়ে তিনি খুবই আ. . ন্দিত হলেন। এ আশ্রমটি উক্ত স্বামীজীরই প্রতিষ্ঠিত। সে প্রায় ৩৮ বৎসর পূর্বের কথা। মায়াবতী অদ্বৈতাশ্রমের অধ্যক্ষের পদ এবং উক্ত আশ্রম-পরিচালিত ইংরেজী মাসিক পত্রিকা 'প্রবুদ্ধ ভারতের' সম্পাদনকার্য হতে অবসর গ্রহণ করে তপস্যাদিতে কালাতিপাত করার ইচ্ছায় তিনি হিমালয়ের নিভৃত প্রদেশে ঐ আশ্রমটি স্থাপন করেন।

---

১ আমরা আট জন যাত্রা করেছিলাম একসঙ্গে। কিন্তু ধারচুলা নামক স্থান হতে অসুস্থ হয়ে এক জনকে ফিরে আসতে হয়েছিল।

কৈলাস ও মানসতীর্থ

শ্যামলাতালে প্রকৃতির অপূর্ব প্রকাশ। একদিকে নন্দাদেবী প্রভৃতি হিমালয়ের অভ্রভেদী চিরতুষারশৃঙ্গ ও শত শত মাইল বিস্তৃত হিমানীর ধ্যানমগ্ন সৌন্দর্য ; অন্যদিকে সমতল প্রদেশের সুদূরপ্রসারী মনোহর দৃশ্যাবলী মনকে যেন হাতছানি দিয়ে অসীমের ইঙ্গিত করে। পর্বতচূড়ায়-চূড়ায় ঘন শ্যামশ্রী। প্রভাতের প্রথম সূর্যকিরণ-উদ্ভাসিত হয়ে ক্রমে বিলীয়মান শেষ রশ্মি-চুম্বিত হয় আশ্রম-প্রাঙ্গণ। তিনটি সরোবর পর পর বিন্যস্ত থেকে স্থানের সৌন্দর্যকে আরও সমৃদ্ধ করেছে। শ্যামল প্রাকৃতিক আবেষ্টনীর মধ্যে সরোবরের তীরেই অবস্থিত বলে, আশ্রমস্থাপয়িতা স্থানটির নাম রেখেছেন শ্যামলাতাল। হিমালয়ের পাদদেশে টনকপুর রেলষ্টেশন হতে পনর মাইল দূরে—৪৯৪৪ ফুট উচ্চ এক পর্বতশিখরে সুশোভিত করে আশ্রমটি অবস্থিত।

যদিও স্বামী বিরজানন্দ একান্তে তপঃ-সাধনায় ডুবে থাকবার জন্য ঐ নির্জন স্থানটি নির্বাচন করে আশ্রম নির্মাণ করেছিলেন, কিন্তু 'আত্মনো মোক্ষার্থং' তাঁর ধ্যানমগ্ন মনের কোণে ধ্বনিত হতে লাগল স্বীয় গুরুদেব-উপদিষ্ট. 'জগদ্ধিতায়' মন্ত্র। গরীব, পীড়িত, দুঃস্থ পাহাড়ী-নারায়ণদের কষ্টে বিচলিতপ্রাণ তিনি তাদের রোগমুক্তির জন্য প্রথমে নিজেই কিছু কিছু ঔষধ-পথ্যাদি-বিতরণে ব্রতী হলেন। তাঁর এই সুদীর্ঘকালব্যাপী কঠোর তপস্যা ও আপ্রাণ সেবাব্রতের ফলে শ্যামলাতালে ধীরে ধীরে একটি সর্বাঙ্গসুন্দর সেবাকেন্দ্র গড়ে উঠেছে।

শ্যামলাতাল আশ্রমে একদিন বিশ্রামের পর—২৪শে জ্যৈষ্ঠ, বুধবার ভোরে স্বামী বিরজানন্দজীর প্রাণভরা শুভাশিস মস্তকে নিয়ে 'দুর্গা দুর্গা' বলে সুদীর্ঘ যাত্রাপথে বেরিয়ে পড়লাম। বিদায়কালে স্বামীজী বললেন, "আমার শ্রদ্ধাপ্রণতি কৈলাসপতির চরণে নিবেদন করো।" সুগন্ধি ধূপকাঠি প্রভৃতি পূজোপকরণও তিনি দিয়েছিলেন।

যাত্রা

সামান্য সামান্য বৃষ্টি হচ্ছে। আকাশ মেঘমলিন। প্রস্তর-সংকুল উঁচু-নীচু বনময় পার্বত্য পথ। ডানদিকে পাহাড়ীদের গ্রাম। বন্যজন্তুর চিৎকার শুনতে পাওয়া যায়। খানিকক্ষণ সকলেই চুপচাপ। নিজ নিজ চিন্তায় মগ্ন। মনে মনে জগতের সকল দায়িত্ব থেকে বিদায় নিয়েছি—চলেছি নির্বাণের পথে। সংসারের সকল বৈচিত্র্য পিছনে ফেলে চলেছি—সেই অজানার সন্ধানে। এ অগ্রগতির পশ্চাতে রয়েছে এক পরম আহ্বান—দুর্নিবার আকর্ষণ। যে দেবতার অনুপ্রেরণায় এ তুচ্ছ ক্ষুদ্র জীবনকে মহত্তর জীবনে মগ্ন করতে চলেছি, সারাটি মনঃপ্রাণ দিয়ে সেই পরম দেবতার চরণে শরণ নিলাম। দুর্গম অনির্দিষ্ট পথের তিনিই একমাত্র আলোকস্তম্ভ।

ঘনবনানী-পরিবেষ্টিত তিন মাইল চড়াই-উৎরাই পথ অতিক্রম করে সুখীটাং-এ এসেছি. তখনও বেশ বৃষ্টি হচ্ছে। বৃষ্টির অভাবে এ অঞ্চলের লোকেরা হায়! হায়! করছিল। আমাদের যাত্রার দিন প্রথম বৃষ্টি—পাহাড়ীরা খুবই শুভ মনে করছে। সুখীটাং ডাকঘরে বসে সঙ্গী ভদ্রলোক তিন জন প্রত্যেকেই বাড়িতে যাত্রার প্রারম্ভের সংবাদ এবং চিঠিপত্র গার্বিয়াং-এর ঠিকানায় পাঠাবার নির্দেশ দিয়ে পত্র লিখলেন। কৈলাস-যাত্রীদের বিদায় দেবার জন্য বহু পরিচিত ও অপরিচিত পাহাড়ী এখানে সমবেত হয়েছিল।

সুখীটাং-এর চার মাইল পরেই 'চলতী' নদী। নিবিড় বনস্থলীর ভিতর দিয়ে বন্ধুর পথ। শেষ বসন্তের ঝরা পাতায় পাতায় পথ আচ্ছন্ন। নূতন সোনালী পাতায় গাছ ভরে গেছে। কোথাও বনফুলের গন্ধে বাতাস ভারাক্রান্ত। মধুমক্ষিকার গুঞ্জনও শোনা যায়। ঘোঁৎ ঘোঁৎ করতে করতে একটি বন্য বরাহ আমাদের খানিকটা তাড়া করে এসে আবার ছুটে পালিয়ে গেল। ভয়চকিত বন্য বানর ও হনুমান হুপ্ হুপ্

করে গাছে গাছে লাফিয়ে চলে যাচ্ছে। বন্য-ময়ূরের ডাক শোনা যাচ্ছে না। কোথাও ঝরনার ঝঙ্কার শুনতে পাওয়া যায়। বসন্ত-উৎসবে মত্ত বন্য পক্ষীর কাকলী বনস্থলীকে মুখরিত করে রেখেছে। এ পার্বত্য প্রদেশে তিনটি মাত্র ঋতু—বর্ষা শীত বসন্ত।

অতি সাবধানে পা ফেলে ফেলে চলেছি। সারাটি পথই আঁকাবাকা খাড়া-উৎরাই। জনবিরল স্থান। একটু উপর হতে চলন্তী নদীর গভ দেখা গেল। নদীতে হাঁটুমাত্র জল কিন্তু খুবই খরস্রোত। কোন রকমে নদী পার হওয়া গেল। সামনে একটি বড় খাড়া পর্বত—তারই গা ঘেঁষে সংকীর্ণ পথ। নদীর ধারে বসে খানিকক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে ধীরে ধীরে ডিউরীর চড়াই শুরু করা গেল। চার মাইল পথ ডিউরী পর্যন্ত—সবটুকুই চড়াই। এ চার মাইলে তিন হাজার ফুট উঠতে হয়। প্রখর রোদ। গরমও বোধ হচ্ছিল ভীষণ। উঠছি—এ উঠার যেন শেষ নেই।

যত উপরে উঠতে লাগলাম সুদূরপ্রসারী অবারিত শোভা। পর্বত-চূড়ার শ্যামশ্রীর. উপর প্রখর রক্তিম 'সূর্যলেখা'। বাঁদিকে নীচে সগর্জনে বয়ে চলেছিল চলন্তী নদীর নীল নির্মল প্রবাহ। কোথাও পর্বত-গাত্র ভেদ করে ক্ষীণ ঝরনা পথের ধারে নেমে এসেছে। নিজের দৈন্য নিয়েও সুশীতল জলদানে ক্লান্ত পথিকদের করছে পরিতৃপ্ত। ঝরনার পাশে বসে, সুমিষ্ট জল পান করে, খানিক ক্ষণ বিশ্রাম নিতে লাগলাম। প্রায় বারটায় দুপুর-রোদে ঐ কঠিন চড়াইটি শেষ করে খুবই ক্লান্ত অবস্থায় ডিউরীতে হাজির হওয়া গেল।

পাহাড়ের আবহাওয়ার এমনই একটা সঞ্জীবনী শক্তি আছে যে, কিছুক্ষণ বিশ্রামের পরেই সকল ক্লান্তি দূর হয়ে যায়। একটি উঁচু পাহাড়ের চূড়ায় অবস্থিত ডিউরী ডাকবাংলোটি অতি সুন্দর। বহুদূরব্যাপী

পার্বত্য শোভা বাংলোর বারান্দায় বসেই সম্ভোগ করা যায়। চারিদিকে উদার পর্বতশ্রেণী। বিভিন্ন আকৃতি ও উচ্চতার ঢেউ-খেলান চূড়াগুলি যেন নৃত্যভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ঊর্ধ্বে পরিচ্ছন্ন নীল আকাশ দূর চক্রবালে মিশে গেছে পর্বতগাত্রে।

ডিউরীতে ডাকবাংলো ছাড়াও আশপাশে, পাহাড়ের গায়ে গায়ে কয়েকটি দোকান ও পাহাড়ীদের বাড়ি। বাংলোর চৌকিদার স্থানীয় খ্রীষ্টান। ছোট ছেলে দুটিও চৌকিদারের সঙ্গে এসে 'গুড্ মর্ণিং' জানাল। খ্রীষ্টান বলেই বোধ হয়, পাহাড়ী হলেও ছেলে দুটির চালচলনে ওরই মধ্যে একটু পারিপাট্য আছে। মাথার চুল আঁচড়ানো—যা পাহাড়ে বড় একটা দেখা যায় না।

খ্রীষ্টান মিশনারিরা হিমালয়ে বিশেষকরে তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর পাহাড়ীদের খ্রীষ্টানধর্মে টেনে আনবার চেষ্টার ত্রুটি করে নি। স্থানে স্থানে ছোট ছোট প্রার্থনাগার, স্কুল ইত্যাদি স্থাপন করে এবং নানা প্রকার প্রলোভন দেখিয়ে তারা পাহাড়ীদের খ্রীষ্টান করার অনেক প্রচেষ্টা করেছে ও করছে। বিধাতার ইচ্ছা বোধ হয় অন্যরূপ। তাদের ঐ মহতী চেষ্টা অনেকাংশে নিষ্ফল হয়েছে। বহু বৎসরের পরিশ্রমের ফলেও বেশীসংখ্যক পাহাড়ীদের ধর্মত্যাগ করাতে পারে নি। গত দু-তিন বৎসর যাবৎ হিমালয়ের নানা দুর্গম ও নিভৃত প্রদেশে প্রায় দেড়হাজার মাইল পদব্রজে ভ্রমণ করে এবং পার্বত্য অঞ্চলের লোকদের সঙ্গে নানা অবস্থার ভিতর দিয়ে অতি ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হয়ে আমার এই ধারণা জন্মেছে যে, এরা গরীব কিন্তু দারিদ্র্য তাদের ধর্মবিশ্বাসকে ম্লান করতে পারে নি। তারা অতি অন্ধবিশ্বাসী ও ঘোরকুসংস্কারাচ্ছন্ন, কিন্তু প্রাণে প্রাণে হিন্দু। হয়তো তারা প্রকৃত

হিন্দুধর্মের কিছুই জানে না বা বোঝে না—ভূত-প্রেতের উপাসনা করে, কিন্তু তারা নিজেদের হিন্দু বলে জানে।

যে অল্পসংখ্যক পাহাড়ী খ্রীষ্টান হয়েছিল তাদের মধ্যেও অনেকেই আর্যসমাজীদের দ্বারা সংস্কৃত হয়ে পুনরায় সনাতন হিন্দুধর্মের আশ্রয় গ্রহণ করেছে। গত কয়েক বৎসরের মধ্যে আর্যসমাজী প্রচারকগণ বিশেষ করে হিমালয়ের নিম্নশ্রেণীর হিন্দুদের মধ্যে খুবই প্রভাব বিস্তার করেছেন। পাহাড়ীদের মধ্যে চল্লিশ-পঞ্চাশ বৎসর পূর্বেও এমন একশ্রেণীর হিন্দু ছিল, যারা এমন কি মৃত গরুর মাংস পর্যন্ত খেতে দ্বিধা বোধ করত না। তাদের সামাজিক আচার-পদ্ধতিও ছিল অত্যন্ত ঘৃণিত রুচির পরিচায়ক। কিন্তু আর্যসমাজীদের প্রচারের ফলে অল্প দিনের মধ্যেই ঐ-সকল হিন্দুদের ভিতর নানা প্রকার সংস্কার প্রবর্তিত হয়েছে। সর্বাপেক্ষা শুভ লক্ষণ এই যে—তাদের মধ্যেও জন্মেছে একটা খুব বড় রকমের আত্মমর্যাদাবোধ। আর সঙ্গে সঙ্গে তাদের মনে নবজাগরণের একটা বিরাট সাড়া পড়ে গেছে। আর্যসমাজীদের এ মহতী প্রচেষ্টা বড়ই শুভ। পার্বত্য অঞ্চলের এইসকল অনুন্নত সমাজকে প্রকৃত ধর্মালোক দেবার মস্ত বড় দায়িত্ব পড়ে রয়েছে হিন্দু-সমাজ-সংস্কারকদের উপর।

আহারাদির পর একটু বিশ্রাম নিয়েই রওনা হয়েছি বাগেলার দিকে। রাতটা ওখানেই কাটাবার কথা। কোন রকমে আরও পাঁচ-ছয় মাইল যেতে পারলেই আজকের মতন বিশ্রাম। দিন ক্রমে গড়াল অপরাহ্ণের দিকে। ধীরে ধীরে চলেছি। 'ময়দান' পথ অর্থাৎ চড়াই-উৎরাই বেশী নেই। পথের বৈচিত্র্য ও দুর্গমত্ব বিশেষ ছিল না। মাঝে মাঝে বন্য গোলাপের গন্ধ পাওয়া যাচ্ছিল। 'কাফল পাকো' পাখীর প্রাণ-মাতানো সুর কানে ভেসে আসে। পাহাড়ের গা ঘেঁষে পথ। দূরে

দূরে পাহাড়ীদের বাড়ি। শ্যামল বনানীর ভিতর হতে ভেসে আসছিল রাখাল বালকদের বাঁশীর সুর। স্থানীয় লোকেরা প্রায় সকলেই চাষী। পাহাড়ের ঢালু গায়ে খাঁজ কেটে কেটে জমি তৈরী করে নিয়ে তাতে প্রয়োজনীয় ফসল উৎপাদন করে। গম, যব, ধান, আলু, মণ্ডুয়া, মকাই এই সব। পাহাড়ীদের সঙ্গে পথে মাঝে মাঝে দেখা হয়। তারা পিঠে ভারী ভারী বোঝা নিয়ে যাচ্ছে।

একটা পাহাড়ের মোড় ঘুরতেই বাগেলা দেখা গেল—দূরত্ব যদিও প্রায় তিন মাইল। পার্বত্যপথ-অনভিজ্ঞ জনৈক সহযাত্রী বলে উঠলেন —"এ আর কি। ঐ তো দেখা যাচ্ছে, এক্ষুণ-ই পৌঁছে যাব।"

"আপনাকে বুঝি কখনও কুকুরে কামড়ায় নি?" একজন জিজ্ঞাসা করলেন।

"না। কুকুরে কামড়াবে কেন?"

"তাই জানতে চাচ্ছি। কুকুরে কামড়ালে বুঝতে পারতেন যে পাহাড়ের রাস্তার পরিমাণ কি রকম। এই কশৌলী পাহাড় থেকে তারাদেবীর পাহাড়ে আলো জ্বললে মনে হয় যেন কয়েক মিনিটের পথ মাত্র। যেতে কিন্তু পাক্কা পাঁচ ঘণ্টা।" সকলেই হো হো করে হেসে উঠলেন।

সন্ধ্যার কিছু পূর্বেই বাগেলায় পৌঁছেছি। কয়েকটি মাত্র দোকান। পথচারিগণ সাধারণতঃ এসব দোকানেই রাত কাটায়। আমরাও আশ্রয় নিলাম একটি দোকানে। এ অঞ্চলের লোকদের কাছে শ্যামলাতাল ও মায়াবতী আশ্রমের স্বামীজীরা খুবই পরিচিত। প্রায় পঁচিশ-ত্রিশ বৎসর যাবৎ এ দু আশ্রমের দাতব্য চিকিৎসালয় থেকে সহস্র সহস্র পীড়িত নরনারী পেয়ে আসছে বিনামূল্যে ঔষধ ও সেবা-যত্নাদি। বিশেষ করে টনকপুর

ছ্যত্রে পিথরাগড় পর্যন্ত এই সত্তর মাইলের অধিবাসিবৃন্দ রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসীদের সেবাব্রত বিশেষভাবে জানে। আর তাদের ধারণা যে এ সন্ন্যাসীরা সকলেই 'ডাক্তার স্বামী'। বাগেলায় পৌঁছিবার সঙ্গে সঙ্গেই চারিদিকে প্রচার হয়ে গেল যে, ডাক্তার স্বামীরা এসেছেন। অনেকে রোগী নিয়ে হাজির হল। আমাদের মধ্যে যিনি ডাক্তাব তিনি রোগীদের পবীক্ষা করে সঙ্গে কৈলাসযাত্রার জন্য যে ঔষধের বাক্স ছিল তা থেকে ঔষধ দিতে লাগলেন।

দোকানগুলি খুবই অপরিচ্ছন্ন। যতক্ষণ দিনের আলো ছিল, মাছির উৎপাত সকলকেই অতিষ্ঠ করেছে। রাত্রে ঐ দোকানে আরও কয়েকজন পথিক আশ্রয় নিল। দোকানের মেজেতে মাটির উপরই ঢালা বিছানা করে পাশাপাশি সকলে শোয়া গেল।

রান্নাদির ব্যবস্থা হয়েছে দোকানের নীচেই। ধোঁয়ার জ্বালায় সকলেই 'চোখ্ গেল—চোখ্ গেল' করতে লাগলেন। রাত্রে ছারপোকা ও পিশুপোকার দংশনে বিন্দুমাত্রও ঘুম হল না।

শেষ রাত্রে দেখা গেল সহযাত্রী বিছানায় বসে ধ্যানস্থ। মাঝে মাঝে টর্চ জ্বেলে ছারপোকা তথা পিশু-নিধন-যজ্ঞে ব্যাপৃত। বলে উঠলেন—"স্বামীজী! আর তো পারা যায় না। কৈলাসপতি মাথায় থাকুন। গায়ের চামড়া আর একটু মোটা না করলে আর উপায় নেই। গায়ের লোমগুলিও যদি আর একটু ঘন ও পুরু হত! এখান থেকেই প্রত্যাবর্তন করি।" বুঝলাম, এ তাঁর কথার কথা মাত্র। যে দুর্নিবার আকর্ষণ আত্মীয়স্বজনের স্নেহবেষ্টনী থেকে আকৃষ্ট করে পথে টেনে এনেছে, সেই আকর্ষণই 'আগে চল—আগে চল' মন্ত্রে অনুপ্রাণিত করে শত দুঃখকষ্টের ভিতর দিয়েও তাঁকে কৈলাসপতির পদপ্রান্তে পৌঁছে দেবে।

যাত্রা

ভোরের অস্পষ্ট আলোকেই বেরিয়ে পড়েছি। আকাশ ঘোরমেঘাচ্ছন্ন। রাত্রে বৃষ্টি হয়েছিল। তখনও অল্প অল্প বৃষ্টি; অথচ আমাদের এগিয়ে যেতেই হবে। নির্জন পথ। চারিদিকে ঘন পাইন ও ওকের বন। গাছে গাছে পাখীর নিদ্রাজড়িত কাকলি। বন্য মৃগের আর্তনাদ শোনা যাচ্ছে। বাঘেব সাড়া পেলে বা বাঘে তাড়া করলে তারা ঐ রকম চিৎকার করে। ভালুকের তারস্বরে চিৎকারে বন কেঁপে উঠছে। সাপের গতির মতন আঁকাবাঁকা পথকে দুরারোহ পর্বতমালা বেষ্টন করে আছে। পর্বতগাত্র ঘেঁষে চলেছি। নীচের অতলস্পর্শ গিরিখাতের দিকে তাকাতে প্রাণ কেঁপে উঠে। কোথাও হাজার ফিট নীচে অগাধ গিরিখাত—অন্ধকাবের গর্ভে লুক্কায়িত। চারি দিকেই বাঘ-ভালুকের আবাসস্থল নিবিড় বন। বড় বড় পাইন গাছগুলি নিঃশব্দ প্রহরীর মত যেন আমাদের গতিবিধি লক্ষ্য করছিল।

সকালের দিকে শীতের মধ্যে হাঁটতে ক্লান্তি কম হয়। ছয় হাজার ফুট উপরে উঠেছি। পাঁচ মাইল পথ অতিক্রম করে যখন বন্‌লেকে এলাম, ততক্ষণে প্রভাতের কিরণচ্ছটায় দশদিক আলোকিত। সুপ্তোত্থিত বনানী স্মিতহাস্যে আলোর দেবতাকে যেন বরণ করে নিল। বন্‌লেক থেকে একটি পথ সোজা গিয়েছে চাম্পাবৎ ও লোহাঘাট হয়ে পিথরাগড়ের দিকে। ওটি-ই জেলা বোর্ডের রাস্তা। আর বনবিভাগেব একটি পথ গিয়েছে মায়াবতীর কাছ ঘেঁষে আলমোড়া পর্যন্ত।

খানিক বিশ্রাম করে মায়াবতীর পথটি ধরা গেল। প্রথমেই একটি খাড়া চড়াই। ক্রমেই চড়াই—কেবল উঠছি। খানিক এগিয়েই পথের ধারে গাছ বা পাথর ধরে দাঁড়াতে হচ্ছে, পা আর চলতে চায় না। পাইন, রোডরেণ্ডাম, ওক, বাঁজ গাছের নিবিড় বনস্থলীর ভিতর দিয়ে

নির্জন অপ্রশস্ত পথ। লোকালয়ের চিহ্নমাত্র কোথাও নেই। দিনের বেলায় যেতেই গা ছম্ ছম্ করে। বাঘ-ভালুকের বাসা। কোথাও এতটুকু শব্দ শুনতে পাচ্ছি নে। এক অব্যক্ত নিবিড় মাধুর্যে পার্বত্য প্রদেশ পরিব্যাপ্ত। ছায়াশীতল প্রায় তিন মাইল পথ অতিক্রম করার পর বনের শেষ প্রান্ত থেকে বহু দূর বিস্তৃত হিমাদ্রির চিরতুষারমণ্ডিত উত্তুঙ্গ শিখরগুলি দেখে মুগ্ধ হয়ে গেলাম। শুভ্র হিমানী সূর্যকিরণসম্পাতে হেমবর্ণ-রঞ্জিত। ঐ দৃশ্যপট এতই সুন্দর যে একেবারে তন্ময় হয়ে যেতে হয়। যেন কোন স্বর্গীয় ভাস্কর যুগযুগান্তর কঠোর সাধনা করে এ অপার্থিব সৌন্দর্যসৌধ গড়ে তুলেছেন। দেখে দেখে বেড়ে যাচ্ছিল আরও অতৃপ্তি। চোখ আরও দেখতে চায় ঐ বিমল শোভা, আর মন চায় নিজ চিত্রপটে তার প্রতিকৃতি চিরতরে অঙ্কিত করে নিতে।

মায়াবতী পৌঁছবার প্রায় এক মাইল আগেই স্বামী দুর্গাত্মানন্দ ও আশ্রমের আরও দু'জন সন্ন্যাসীর সঙ্গে দেখা হল। তাঁরা এগিয়ে এসেছিলেন আমাদের স্বাগত করে নেবার জন্য। স্বামী দুর্গাত্মানন্দও আমাদের কৈলাস-যাত্রার একজন সঙ্গী। দূর হতেই পরস্পরের অভিনন্দনসূচক উচ্চ 'জয় কৈলাসপতিকী জয়' ধ্বনি পার্বত্য প্রদেশ প্রতিধ্বনিত করতে লাগল।

বেলা প্রায় বারটার সময় এক পর্বতচূড়ার শেষ প্রান্ত হতে একটু মোড় ঘুরতেই সামনে নীচের দিকে দেখা গেল মায়াবতী আশ্রম। শ্যামল আবেষ্টনীর মধ্যে উঁচু-নীচু স্তরে স্তরে সাজান আশ্রমবাড়িগুলি দেখাচ্ছিল অতি সুন্দর। আশ্রমে প্রবেশ করতেই আশ্রমবাসিগণ গাঢ় আলিঙ্গনপাশে আমাদের বদ্ধ করলেন।

৬৭০০ ফুট উচ্চে তপোভূমি হিমালয়ের অতি নিভৃত কোলে অদ্বৈত সাধনার কেন্দ্ররূপে এই অদ্বৈত আশ্রমটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন স্বামী

বিবেকানন্দ। ১৮৯৯ সালে আশ্রমস্থাপনার সময় হতেই স্বামীজীর পাশ্চাত্ত্য শিষ্য সেভিয়ার-দম্পতির প্রচুর অর্থব্যয় ও প্রাণপাত সেবা দ্বারা এ প্রতিষ্ঠানটি গুরুভক্তির অমরস্তম্ভে পরিণত হয়েছে। তাঁদের পুণ্যস্মৃতি আজও আশ্রমের সর্বত্র বিরাজমান! এই দীর্ঘ কালের ক্রমোন্নতির ফলে আজ অদ্বৈতাশ্রম একটি সর্বাঙ্গসুন্দর প্রতিষ্ঠান। সাধন-ভজন দ্বারা নিজ নিজ আধ্যাত্মিক জীবনের পূর্ণতাবিধান ছাড়াও আশ্রমের সন্ন্যাসিগণ রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-যুগবাণী ইংরেজী ভাষায় বহু গ্রন্থাকারে প্রকাশ করে বিশ্বমানবকে রামকৃষ্ণ-ভাবধারার সঙ্গে পরিচিত করেছেন। স্বামী বিবেকানন্দ-প্রতিষ্ঠিত ইংরেজী মাসিক পত্রিকা 'প্রবুদ্ধ ভারত'ও এ আশ্রম হতেই প্রকাশিত হয়। আশ্রম-কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গত ত্রিশ বৎসর যাবৎ পরিচালিত দাতব্য চিকিৎসালয় সম্প্রতি জনৈক দেশীয় রাজার বদান্যতায় সমগ্র জেলার মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট চিকিৎসালয় ও হাসপাতালরূপে গণ্য হয়েছে।

চারদিন মহানন্দে মায়াবতীতে কাটিয়েছি। আশ্রমবাসীদের কাছ থেকে পেয়েছি অনেক উৎসাহ। নব অনুপ্রেরণা নিয়ে ২৯শে জ্যৈষ্ঠ দ্বিপ্রহরে আহারাদির পর আমরা আট জন মায়াবতী হতে রওনা হলাম। মালপত্র 'বনজাড়া' ঘোড়াব পিঠে চলেছে। সহযাত্রীরা ঘোড়ায় চড়ে যাচ্ছিলেন। আমি প্রথম হতেই সংকল্প করেছিলাম যে পায়ে হেঁটেই ৺কৈলাস-দর্শনে যাব। সকলের ইচ্ছার বিরুদ্ধেও যাতায়াতের সারা পথ হেঁটেই অতিক্রম করেছিলাম। তের মাইলের পর আজ 'ছেরা'তে রাত কাটাতে হবে। প্রথম তিন মাইল উৎরাই পথ অতিক্রম করার পরেই লোহাঘাট—আলমোড়া জেলার একটি মহকুমা-শহর। সরকারী কাছারি, বন-বিভাগের দপ্তর, কালেক্টরী, জেলা বোর্ডের হাসপাতাল, মধ্য-ইংরেজী স্কুল, ডাকঘর, তারঘর, বেশ বড় বাজার, অনেকগুলি

বসত-বাটী আছে। সব বাড়িগুলিই পাথরের তৈরী। শহরটি ছোট হলেও বড়ই সুন্দর। পাহাড়ের কোলে কোলে পাহাড়ীদের বাড়িগুলি দেখতে ছবির মতন। দূরে পর্বতের সানুদেশে একটি ছোট শিবমন্দির। লোহাঘাট পার হবার পরেই বৃষ্টি শুরু হল। রাস্তা পাহাড়ী পথ হিসাবে প্রশস্ত ও সমতল। প্রচুর দেওদার ও পাইনের বন। ঘোড়া খচ্চর ও মানুষগুলি সকলেই বেশ চলছে, যেন কোন দৈববলে বলীয়ান। কোথাও না বসেই একেবারে তের মাইলের পড়াউ শেষ করে ছয়টায় ছেরাতে পৌঁছেছি। প্রাণে অফুরন্ত উদ্দীপনা, অন্তরে পথ-যাত্রার দুর্জয় সঙ্কল্প। ঘন পাইন-জংগলের ভিতর ডাকবাংলোতে আশ্রয় নেওয়া গেল। স্থানের উচ্চতা ৪২০০ ফুট। ক্রমে সন্ধ্যা নেমে এল। দিগন্তের শেষ সীমায় তুষার-মণ্ডিত একটি পর্বতশিখর অস্তগামী সূর্যকিরণে রাঙ্গা হয়ে উঠেছে। সহযাত্রী সানন্দে গান ধরলেন—

"সুন্দর তোমার নাম দীনশরণ হে।
বরিষে অমৃতধার, জুড়ায় শ্রবণ, ও প্রাণরমণ হে ॥
এক তব নাম ধন, অমৃত-ভবন হে,
অমর হয় সেইজন, যে করে কীর্তন হে ॥
গভীর বিষাদরাশি নিমেষে বিনাশে,
যখনি তব নামসুধা শ্রবণে পরশে :
হৃদয় মধুময় তব নামগানে, হয় হে হৃদয়নাথ চিদানন্দঘন হে ॥"

গানটির মধ্যে যে ব্যঞ্জনা, তা-ই যেন দিকে দিকে আর অন্তরে ফুটে উঠল।

জনৈক পাহাড়ী সহযাত্রী আমাশয়ে আক্রান্ত। রাতটা উৎকণ্ঠায় কেটেছে। কিন্তু তিনটার পরেই 'সাজ সাজ' রব পড়ে গেল। বিশ মাইল পার্বত্য পথ উল্লঙ্ঘন করে আজই পৌঁছতে হবে পিথরাগড়।

ভোরের অন্ধকারেই বেরিয়ে পড়েছি। সকালের দিকটা বেশ ঠাণ্ডা বোধ হচ্ছিল। আকাশ মেঘ-কাজল। জোর হাওয়া বইছিল, আর সঙ্গে সঙ্গে টিপ্ টিপ্ বৃষ্টি। বসে থাকলে চলবে না—এগিয়ে যেতেই হবে। দু পাশে উচ্চ পর্বতের ভিতর দিয়ে সংকীর্ণ পথ। ক্রমেই বেশী উৎরাই। এমন খাড়া-উৎরাই যে ঘোড়সওয়ারীদের ঘোড়ায় চড়ে যাওয়া চলে না। সকলেই চলেছি হেঁটে। প্রায় চার মাইল এ উৎরাই পথ—সরযূ নদীর ধার পর্যন্ত নেমে এসেছে। দুটি পর্বতকে বিদীর্ণ করে ভীম গর্জনে বয়ে যাচ্ছে সরয়' তারই ধারে ধারে পাহাড়ের গা ঘেঁষে প্রস্তরময় সংকীর্ণ পথ। পাথরে হোঁচট্ খেতে খেতে চলেছি। নদীর উপরকার প্রায় ১৫০ ফুট লম্বা ঝোলা পুল পার হয়ে খানিকটা আসার পরেই আরম্ভ হল চড়াই। ডাঃ দে মহা বিরক্ত হয়ে বললেন—"এত চড়াই-উৎরাইর বালাই কেন? সোজা রাস্তা হলেই তো হত।" প্রায় হাজার ফুট চড়াই করে উপরে উঠতেই দেখা গেল দূরে সরযূ ও রামগঙ্গার সঙ্গমস্থল। প্রভাতের স্বর্ণালোকে চারিদিক হাস্যময়। নদীর স্রোতজলে সেই স্বর্ণরশ্মি প্রতিফলিত হয়েছে। নয়নাভিরাম দৃশ্য।

স্থানটির নাম রামেশ্বর প্রয়াগ। পার্বত্য অঞ্চলের লোকেরা এ প্রয়াগকে মহাতীর্থজ্ঞানে দূর দূর স্থান হতে মৃতদেহ বয়ে এনে এখানে দাহ করে এবং সঙ্গমে অস্থিবিসর্জন দেয়। তখনও একটি শবদাহ হচ্ছিল।

কি এক অজানা টানে অন্তহীন পথে যেন আমরা সব কিছুই ছুঁয়ে ছুঁয়ে চলেছি। চারি পার্শ্বের বৃক্ষলতাহীন প্রস্তরময় পর্বতমালা—অথচ এমন সুন্দর! নগ্ন পর্বতের যে এমন সৌন্দর্য হতে পারে তা না দেখলে কল্পনা করা যায় না। প্রাণভরে দেখি, আবার এগিয়ে যাই। কোথাও প্রকাণ্ড অগাধ গিরিখাত—যেখানে দৃষ্টি আবছা হয়ে যায় সেখানে গিয়ে মিশেছে।

আবার কোথাও দেড়হাজার ফুট নীচে পার্বত্য একটি ক্ষুদ্র নদীর ধারে অপ্রশস্ত উপত্যকায় সবুজ শস্যক্ষেত্র-পরিবেষ্টিত ক্ষুদ্র গ্রাম। যেন জগতের সঙ্গে সকল সংযোগ ছিন্ন করে আশ্রয় নিয়েছে পর্বতের নিরাময় কোলে।

পাহাড়ী মেয়ের দল পিঠে শিশুসন্তানকে বেঁধে নিয়ে চলেছে—মাথায় প্রকাণ্ড কাঠের বোঝা। কুতূহলী দৃষ্টিতে আমাদের দেখছে। পাহাড়ে স্ত্রীলোকেরাই বেশী পরিশ্রমী। ঘরকন্নার কাজ ছাড়াও তারা চাষ-আবাদের কাজ করে, গৃহপালিত পশুদের জন্য বন থেকে ঘাস কাটে, কাঠ আনে, কম্বল বোনে, ঘি-তেল তৈরী করে, গম পিষে, ধান কোটে—না করে এমন কাজ নেই। মেয়েদের পর্দার বালাই নেই। তারা স্বাধীন প্রকৃতির। পুরুষেরা অপেক্ষাকৃত কম পরিশ্রমী, সেজন্য পাহাড়ে মেয়েদের কদর বেশী।

এগার মাইল পথ চলার পরে হাজির হলাম গুরনায়। গ্রামটি বর্ধিষ্ণু ও ব্রাহ্মণ-প্রধান। অনেকগুলি দোকান, ডাকঘর, বিদ্যালয়, একটি পান্থনিবাসও আছে। গ্রামবাসীরা সকলেই কৃষিজীবী। এ অঞ্চলে ব্রাহ্মণেরাও হলচালনা এবং চাষের অন্যান্য সব কাজই নিজের হাতে করে, অবশ্য উচ্চশ্রেণীর ব্রাহ্মণ ছাড়া। গুরনা গ্রামে ভয়ানক জলকষ্ট—বিশেষ করে গ্রীষ্মকালে। প্রায় আধমাইল দূরে নীচে একটি মাত্র ঝরনা। তা থেকেই জল বয়ে আনতে হয়। স্থানের উচ্চতা ৪৮২৫ ফুট। আহারাদির পর বিশ্রামের অবকাশ ছিল না, যেতে হবে আরও নয় মাইল। ধীরে ধীরে পথে নেমে এলাম। কেদারনাথ, বদরীনারায়ণ বা উত্তরাখণ্ডের অন্যান্য তীর্থপথের ন্যায় এ পথে কোন চটি নেই। যাত্রিসংখ্যাও অতি সামান্য। সেজন্য পথিকদের মতন যাত্রীদেরও কোন গ্রামে বা পথের পাশে দোকানে রাত কাটাতে হয়।

যাত্রা

যতই পিথরাগড়ের দিকে এগুচ্ছি, পর্বতমালাব উচ্চতা ক্রমে কমে আসতে লাগল। অসমান পর্বতচূড়াব পরিবর্তে ঢেউখেলান সমভাবে বিন্যস্ত পাহাড়গুলি দেখাচ্ছিল অতি সুন্দর। পিথরাগড়ের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের কথা শুনেছিলাম, কিন্তু তা যে এমন অনুপম সে ধারণা ছিল না। অরণ্যের সুস্নিগ্ধ শ্যামলিমা, বনমল্লিকার সুমিষ্ট গন্ধ, ফুলভারা-বনত বনগোলাপের বিতান, মধুপানে মত্ত ভ্রমরকুলের গুঞ্জন, পাখীর সুমধুর গান—এ যেন বসন্তসমারোহ। কিন্তু আমাদের এগিয়ে যেতে হবে। জনৈক সহযাত্রী ঘোড়া থেকে নেমে বললেন, "এ তো ছেড়ে যেতে ইচ্ছা হচ্ছে না!" খানিক ক্ষণ বসলেন। অবাক-মুগ্ধ দৃষ্টিতে সব দেখতে লাগলেন।

সূর্য ক্রমে পশ্চিম আকাশে ঢলে পড়েছে। আরামদায়ক রৌদ্র। আকাশ নীলকান্তমণির মতন উজ্জ্বল। দূরেও আশপাশের পাহাড়ের গায়ে গায়ে গৃহপালিত পশুব গলঘণ্টার ঐক্যতানশব্দ শুনতে পাচ্ছিলাম। আর রাখালবালকদের বিচিত্র অপরিচিত সুরে গান। সব কিছুই অতিক্রম করে চলেছি। প্রায় এক মাইল দূর হতেই পিথরাগড়ের 'গড়'টি দেখা যাচ্ছিল— এক পর্বতের সানুদেশে। বেশ প্রকাণ্ড দুর্গ। ... পূর্বে এস্থান নেপালরাজ্যেব অংশ ছিল। পিথরবংশীয় জনৈক নেপালী সর্দার এস্থান দখল কবে পাহাড়ের উপর ঐ দুর্গ নির্মাণ করেন এবং বংশের নামানুসারে স্থানেরও নাম রাখেন। ইংরেজ-সরকার নেপাল-রাজবংশীয়দের পরাস্ত করে ঐ স্থান ভারতের অন্তর্ভুক্ত করেছে।

প্রায় সমতল পথ দিয়েই চলেছি। দু'পার্শ্বে বহু দূর পর্যন্ত ধান্যক্ষেত্র। ফসলের প্রাচুর্য দেখে চোখ জুড়িয়ে যায়। পিথরাগড় খুবই উর্বর স্থান। এখানকার সুগন্ধি সরু বাসমতি চাউল বিখ্যাত। সন্ধ্যার পূর্বে

পিথরাগড়ে পৌঁছে একটি ধর্মশালার দ্বিতলে সে-রাত্রির মতন আশ্রয় নেওয়া গেল।

আজ সকলেই ক্লান্ত—বিশেষ করে ঘোড়াগুলি। সেজন্য পরদিন সকালে না বেরুনই স্থির হয়েছে। যাত্রিগণ মহাতৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলে আরাম করতে লাগলেন। সকালে শহর দেখতে বেরিয়েছি। এ মহকুমা-শহরটি ছোট, কিন্তু অতি মনোরম—উচ্চতা ৫৪৫০ ফুট। প্রায় ৩৫০০ লোকের বাস। চারিদিকেই সমৃদ্ধ গ্রাম। পাহাড়ের তুলনায় জনবহুল বলা যেতে পারে। বাজার, কাছারী, খাজানাখানা, বনবিভাগের বাংলো, মিউনিসিপাল অফিস, হাসপাতাল, উচ্চ-ইংরেজী স্কুল, তারঘর-সংযুক্ত ডাকঘর, ডাকবাংলো, টেনিস্ কোর্ট ইত্যাদি অনেক কিছু আছে। খ্রীষ্টান মিশনারিদের একটি বড় কেন্দ্র। অনেক বাড়ির উপর বেতারযন্ত্রের তারও খাটান রয়েছে। পিথরাগড়ই এ অঞ্চলের শেষ তারঘর।

অন্যান্য স্থানের হাইলেণ্ডারদের (পার্বত্য অধিবাসীদের) মতন পিথরাগড়ের লোকেরাও খুবই যুদ্ধপ্রিয়, বিশেষ করে ক্ষত্রিয়রা। লোক-গুলি দেখতে বেটে মজবুত, মঙ্গোলিয়ান টাইপ—নেপালী গুরখাদের মতন। বিগত বিশ্বমহাযুদ্ধের সময় ইংরেজ-সরকার পিথরাগড়ের এত বেশী লোক সৈন্যবিভাগে নিয়েছিল যে, আঠার থেকে পঞ্চাশ বৎসরের কর্মক্ষম লোক কদাচিৎ দেখা যেত। এমন কি চাষ-আবাদ করার লোকেরই বিশেষ অভাব হয়ে পড়েছিল, ফলে ঐ অঞ্চলে দেখা দিয়েছিল খাদ্যদ্রব্যের দারুণ অভাব।

আহারাদির পর কানালীচীনার দিকে রওনা হয়েছি। চৌদ্দ মাইলের পড়াউ। সামান্য চড়াই-উৎরাই। প্রখর রৌদ্র, চারদিক ঝাঁ ঝাঁ

করছে। দূর পাহাড়ের গায়ে গায়ে সাদা বাড়ীগুলি চমৎকার দেখাচ্ছিল। পার্বত্য পটভূমিতে সামান্য কুটীরটিও কেমন সুদৃশ্য হয়ে দাঁড়ায়! সহযাত্রীর আমাশয় বেড়েই চলেছে। ঔষধাদিতে কোন ফল হচ্ছে না। সকলেই চিন্তিত হয়ে পড়েছি। যাত্রা-প্রারম্ভেই এ বিপদ। শেষ পর্যন্ত যে কি দাঁড়াবে, তাই ভেবে উৎসাহ যেন ক্রমে দমে যাচ্ছে।

দু'জন পাহাড়ী পথিকের সঙ্গে দেখা হল। কাঁধের দুদিকে বোঝা ঝুলিয়ে নিয়ে চলেছে। যোগী দেখে 'নমো নারায়ণ' জানাল। পিথরা-গড় থেকে ধান কিনেছে। বিপরীত দিকে দু'মাইল উপরে এক পাহাড়ের চূড়ায় বাড়ী। দুর্গাদত্ত ও রত্নমণি নাম—দুজনেই ব্রাহ্মণ। তারাপ্রসন্ন বাবুর কাছ থেকে সিগারেট পেয়ে ভারি খুশী। দুর্গাদত্ত প্রৌঢ় ও বেশী কুতূহলী। জিজ্ঞাসা করল—'বাবাজী, কোথায় যাবে?'

"কৈলাসতীর্থে। শিবজীকে দর্শন করতে যাচ্ছি।"

"কোথায়? কৈলাস? সেখানে মানুষ গেলে তো ফেরে না! হুনিয়ারা যাদু জানে। ভেড়-বকরী করে রেখে দেয়। নয় তো শিবজীর ভূত-প্রেতেরা মেরে ফেলে তাদের সঙ্গী করে রাখে। বাবাজী, বলছি—যেয়ো না। 'আম্মার' কাছে শুনেছি—আমাদের গ্রামের কয়েক জন নাকি গিয়েছিল, একজনও ফেরে নি।"

চুপ করে শুনে যাওয়া ছাড়া উপায় ছিল না। সহযাত্রী গম্ভীরভাবে বললেন—"দেখুন, আমাদের অবস্থাও কি হয়! শেষ পর্যন্ত হুনিয়াদের ভেড়-বকরী হয়েই থাকতে হবে নাকি?"

এবার একটানা খাড়া চড়াই। নীচে একটি সুন্দর গ্রাম। দুধারে আখরোটের জংগল। পথে একটি মন্দির দেখতে পেয়ে গেলাম দেবদর্শনে। ছোট শিবমন্দির। অতি প্রাচীন। মন্দিরের চারদিকে ও ভিতরে

পুঞ্জীকৃত দৈন্য। সেবা-পূজার কোন আয়োজন বা পারিপাট্য নেই। দেববিগ্রহের প্রতি অবহেলার নিদর্শনে মন্দিরাভ্যন্তর পরিপূর্ণ। মানুষের অন্তঃকরণের সকল মলিনতা এবং কলুষই যেন দেবপূজার উপচার। মন্দিরের ভিতরটি ঘন-অন্ধকারাচ্ছন্ন। খানিকক্ষণ বসে প্রার্থনাদি করে সামান্য দক্ষিণা দিয়ে ভারাক্রান্তপ্রাণে রাস্তায় বেরিয়ে পড়েছি। ভারতের বহু দেব-মন্দিরেই বুঝি এই অবস্থা!

বিহারে কোন গ্রামে তপস্যারত সন্ন্যাসীর নিকট শুনেছিলাম, শিব-চতুর্দশী উপলক্ষে একটু গুড় কেনবার জন্য তিনি নিকটস্থ একটি দোকানে গিয়ে গুড় চাইতে দোকানে থাকা সত্ত্বেও দোকানদার গুড় দিতে দ্বিধা বোধ করছিল। কারণ জিজ্ঞাসা করায় বলল—"গুড় নিজের খাবার জন্য কি?"

স্বামীজী, "না। শিব-পূজার জন্য দরকার।"

"তা হলে দিতে পারি। গুড়ের কলসিতে একটা ইঁদুর পড়ে মরে গিয়েছিল, সেজন্যই আপনার ব্যবহারের জন্য মনে করে দিতে সঙ্কোচ বোধ করছিলাম। শিব-পূজার জন্য নিতে কোন বাধা নেই।"

কী ভীষণ অধঃপতন! তাই বুঝি ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ মৃন্ময়ী কালী-প্রতিমায় চিন্ময়ীর পূজা করে ভারত তথা জগতকে দেখিয়ে গেলেন—জ্ঞান-কর্ম-অষ্টাঙ্গযোগ দ্বারা যে অবস্থা প্রাপ্ত হওয়া যায়, আন্তরিক দেববিগ্রহের সেবা দ্বারাও সে অবস্থা লাভ হতে পারে।

ক্রমে সূর্যদেব নামছেন অস্তাচলে। গৃহপালিত পশুগণ মন্থর গতিতে গৃহাভিমুখে চলেছে। কোথাও শোনা যাচ্ছিল গাছে গাছে পক্ষীর কাকলী। বামপার্শ্বে পাইনবনে মৃদু বাতাস একপ্রকার গুঞ্জনধ্বনি তুলে বয়ে যাচ্ছে। আমরাও গোধূলির ম্লান অন্ধকারে কানালীচীনায় এসে হাজির হলাম।

পাশেই গ্রাম। অনেক চেষ্টাতেও সহযাত্রীর জন্য একটু দুধ বা দই জোগাড় করা সম্ভব হল না। কাল আমাদের যেতে হবে আস্‌কোট এবং সম্ভব হলে আরও এগিয়ে। খুব লম্বা পড়াউ—মাঝে নাকি তিন মাইলের এক প্রাণান্তকারী চড়াই। খাওয়া-দাওয়া কোন প্রকারে সেরে নিয়ে তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়া গেল।

একটু ভোরভোরেই বেরিয়ে পড়েছি। আকাশ ঘোর মেঘাচ্ছন্ন। উষার রাগিণীর মতন পাখীদের কূজন শুনা যাচ্ছিল। নিস্তব্ধ বনানীর ভিতর দিয়ে চড়াই পথ। মৃদু মৃদু শীতল বাতাস—বেশ আরামেই উপরের দিকে উঠছি। প্রায় সাতটার সময় হঠাৎ ঘন মেঘজালের বুক চিরে খানিকটা সূর্যরশ্মি বেরিয়ে এল। যেন দেবদেবের ত্রিনয়নের জ্যোতিশ্ছটা। এবার খাড়া উৎরাই-পথে অনেকটা এসে একটি ক্ষুদ্র পার্বত্য নদীর ধারে সকলে বিশ্রাম নিচ্ছি, এমন সময় একদল ভুটিয়া পথিকের কাছে খবর পাওয়া গেল যে, 'লিপুলেক পাসে' যদিও প্রচুর বরফ রয়েছে, কিন্তু কিছু কিছু লোকচলাচল শুরু হয়েছে। এ খবরে সকলেই খুব আনন্দিত। লিপুলেক-গিরিবর্ত্ম তিব্বতের প্রবেশদ্বার।[১] প্রচুর বরফপাতের ফলে

[১] ভারতভূমি হতে পশ্চিম তিব্বতে প্রবেশ করার সর্বসমেত দশটি প্রশস্ত গিরিবর্ত্ম বা প্রবেশদ্বার আছে:

(১) টনকপুর বা আলমোড়া হতে রওনা হয়ে—আস্‌কোট ও গার্বিয়াং দিয়ে লিপুলেক পাস। উচ্চতা ১৭,১৬০ (মতান্তরে ১৬,৭৫০ ফুট)।

(২) আলমোড়া হতে রওনা—খেলা হয়ে দরমা পাস। উচ্চতা ১৮,৫১০ ফুট।

(৩) আলমোড়া হতে মিলাম হয়ে—উণ্টাধুরা পাস। উচ্চতা ১৭,৯৫০ ফুট ও জয়ন্তী পাস—উচ্চতা ১৮,৫০০ ফুট এবং কুঙ্গরিবিংগ্রী পাস—উচ্চতা ১৮,৩০০ ফুট। এই পথে পর পর তিনটি গিরিবর্ত্ম অতিক্রম করে তিব্বতে প্রবেশ করতে হয়।

বৎসরের ছয়-সাত মাসই ঐ গিরিবর্ত্মে লোকচলাচল বন্ধ থাকে। তখন তিব্বতে প্রবেশ বা তিব্বত হতে নিক্রমণ দুই-ই অসম্ভব। গাবিয়াং গিয়ে অনির্দিষ্ট কালের জন্য আমাদের গিরিবর্ত্ম-খোলার অপেক্ষায় আর বসে থাকতে হবে না। এখন যত দ্রুত এগিয়ে যেতে পারি ততই ভাল।

ক্ষুদ্র নদীটি পেরুতেই চড়াই আরম্ভ হল। পর পর তিনটি চড়াই। ডাঃ দে এবং আমি পাহাড়ী ভুটিয়াদের মতন আস্তে আস্তে চড়াই করছি। খানিকটা উঠি আর একটু দাঁড়াই। তৃষ্ণায় ছাতি ফেটে যাচ্ছে। এক ফোঁটা জল কোথাও নেই। ডাঃ দের ফ্লাস্কে যে সামান্য জল ছিল তা বহু পূর্বেই শেষ হয়ে গেছে। ধীরে ধীরে শামুকের মতন উঠছি। রোদ ক্রমে প্রখরতর হল। ডাঃ দে আর পারছেন না। লাঠির উপর মাথা রেখে ক্রমে বসে পড়লেন। আমার অবস্থাও তথৈবচ। জগতে সকল সুখ

---

(৪) হরিদ্বার হতে বদরীনাথের পথে—যোশীমঠ হয়ে নিতি পাস—১৬,৬০০ ফুট। নিতি পাসের উপর হতে আকাশ পরিষ্কার হলে কৈলাসদর্শন হয়।

(৫) যোশীমঠ হতে ভুটিয়াদের নিতিগ্রাম হয়ে—দাম্‌জাম্‌ নিতি পাস। উচ্চতা ১৬,৩৫০ ফুট।

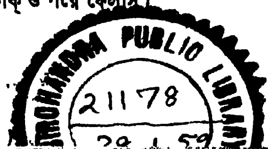
(৬) যোশীমঠ হতে অন্য পথ—হোটিনিতি পাস। উচ্চতা ১৬,৩৯০ ফুট।

(৭) হরিদ্বার হতে বদরীনারায়ণ দর্শন করে—মানা পাস। উচ্চতা ১৭,৮৯০ ফুট।

(৮) হরিদ্বার হতে উত্তরকাশী। পরে গঙ্গোত্রীর পথে মুখুবা হয়ে জেলুখাসা পাস (তিব্বতী নাম সংচোক্‌লা)। উচ্চতা ১৭,৪৯০ ফুট।

(৯) শিমলা হতে প্রথম সিপকি পাস (ভারতের শেষ সীমা) ১৫,৪০০ ফুট অতিক্রম করে শিপ্কিং-লা পাস—১৬,৪০০ ফুট। পরে গারটোক্‌ (পশ্চিম তিব্বতের রাজধানী) ১৫,১০০ ফুট পেরিয়ে তীর্থাপুরী হয়ে কৈলাস।

(১০) কাশ্মীর-শ্রীনগর হয়ে জুজিলা পাস ১১,৫৭৮ ফুট ও লাদাক ১১,৫৩০ ফুট, পরে টান্‌লাংলা পাস ১৭,৫০০ ফুট পার হয়ে গারটোক্‌ ও পরে কৈলাস।



দুঃখেরই শেষ অবশ্য আছে—সবই সান্ত। এক প্রকার মুমূর্ষু অবস্থায় চড়াইর শেষপ্রান্তে—পর্বতের সানুদেশে উঠতেই বিপরীত দিকে দেখা গেল ধব ধবে সাদা আস্‌কোটের রাজবাড়ীটি। কিন্তু দূরত্ব তখনও প্রায় পাঁচ মাইল। খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে কোন প্রকারে নিজেকে টেনে নিয়ে আস্‌কোট গ্রামে পৌঁছান গেল।

গ্রামের প্রান্তভাগেই বনবিভাগের একটি বাংলো। ক্রমে গ্রামবাসীদের পর্ণ-কুটিরগুলির পাশ দিয়ে চলেছি। এ যেন মূর্তিমান দারিদ্র্যের শোভাযাত্রা। এসব অতিক্রম করে ক্রমে দেখা গেল ত্রিতল রাজবাড়ী। আধুনিক ঢং-এ তৈরী। উপরে রেডিওর তার ঝুলছে। সম্মুখে ছোট ময়দানে ভারতীয় পতাকা সগৌরবে পত্‌পত্‌ করে উড়ছিল। সুদূর হিমালয়ের নিভৃত প্রান্তে জাতীয় পতাকা দেখে প্রাণ আনন্দে নেচে উঠল। পথ জেনে জেনে ধর্মশালার দিকে চলেছি। দুপাশেই দৈন্যগ্রস্ত পর্ণকুটির। ত্রিতল রাজবাড়ীর পাশেই এ দরিদ্র কুটিরগুলি বড়ই খাপছাড়া দেখাচ্ছিল—বিশেষ করে বর্তমান গণজাগরণের দিনে। ধনী ও নির্ধনের মধ্যে এত বড় ব্যবধান দেখে প্রাণ ভারাক্রান্ত হয়ে উঠে।

প্রস্তরনির্মিত ধর্মশালাটি বেশ বড়। নীচেই দোকান। প্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্যাদি চড়ামূল্যে পাওয়া যায়। পাশেই ডাকঘর। কয়েকদল কৈলাসযাত্রী আলমোড়ার পথে এসে ধর্মশালায় আশ্রয় নিয়েছে। পথিকও আছে। অনেক সাধ্য-সাধনা করে একটি কোণের ঘরে স্থান পাওয়া গেল।

আস্‌কোট গরম জায়গা। উচ্চতা তিন হাজার ফুট মাত্র। শাকসব্জী, ফলমূল প্রচুর জন্মায়। কয়েকদিন পরে একটু মুখ বদলান গেল। সহযাত্রীর আমাশয় ক্রমে রক্তামাশয়ে পরিণত হয়েছে, সকলেই শঙ্কিত ও চিন্তিত। বিশ্রাম ও সুচিকিৎসার দরকার, দু-এরই অভাব।

আমাদের ইচ্ছা ছিল যে, আস্‌কোটে জলযোগ ও বিশ্রাম করে আরও ছয় মাইল এগিয়ে গিয়ে জৌনজীবীতে রাত্রিবাস করব। কিন্তু সিঙ্গালীর চড়াই সকলকে আধমরা করেছে, তার উপর সহযাত্রীর এই অবস্থা। আসকোটে থাকাই ঠিক হল।

আহার ও বিশ্রামের পর স্থানটি ঘুরে দেখতে বেরিয়েছি। গ্রামবাসীদের জীর্ণ পোশাক, রুগ্ন দেহ, রুক্ষ চেহারা। অভাবের তাড়না এদের দেহমনকে জর্জরিত করে ফেলেছে।

ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়দের অবস্থা ওরই মধ্যে একটু ভাল, কিন্তু তথাকথিত নীচজাতিদের দুঃখের আর সীমা নেই। হিমালয়ে এক প্রকার নিম্নশ্রেণীর হিন্দু আছে, যাঁদের উচ্চবর্ণেরা 'ডোমরা' বলে থাকে। তারা কতকাংশে দক্ষিণভারতের 'পারিয়া' বা 'পঞ্চম'দের মতন ঘৃণ্য, ত্যাজ্য ও অস্পৃশ্য। (পঞ্চম অর্থ—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র-অতিরিক্ত পঞ্চমবর্ণ)। এই 'ডোমরা'দের সংখ্যা সমগ্র পার্বত্য অধিবাসীদের প্রায় এক চতুর্থাংশ। এদের দুর্দশার সীমা নেই। একই ঝরনা থেকে জল পর্যন্ত এদের নিতে দেওয়া হয় না। উচিত মূল্য দিলেও এদের এক ফোঁটা দুধ কেউ দেবে না। কুসংস্কারার্জিত ধারণা যে, ডোমরাদের দুধ দিলে গৃহস্থের মহা অকল্যাণ হয়—গরুবাছুর সব মরে যায়! সমাজে ডোমরাদের স্থান যে কত নিম্নে তা না দেখলে ধারণা হয় না।

আস্‌কোট গ্রাম ঘুরে দেখার সময় একজন পরিচিত গ্রামবাসীর সঙ্গে দেখা হল। এক বৎসর পূর্বে সে অসুস্থ হয়ে শ্যামলাতাল হাসপাতালে আশ্রয় নিয়েছিল। আমাদের পেয়ে তার আনন্দ আর ধরে না। নানা-ভাবে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাতে লাগল।

সন্ধ্যার পরে লক্ষ্ণৌর একদল কৈলাসযাত্রী ধর্মশালাপ্রাঙ্গণে অনেক

রাত পর্যন্ত ভজনকীর্তন করে সকলকে খুবই আনন্দ দিলেন। অনেকগুলি ভজনগানই তাঁরা গেয়েছিলেন, কিন্তু এই একটি মাত্র লাইনই মনে আছে—"ম্যাসী হি হরি করতু দাস পর প্রীতি।" অনেক চেষ্টা করে ভজনটির অন্য ছত্রগুলি স্মরণ হল না। মনে পড়ে বেলুড় মঠের শ্রীরাম মহারাজের কথা। তিনি তখন মঠের হাটবাজার করতেন। ঘুসুড়ীর বাজার থেকে শাকসব্জী কিনে নৌকায় ফিরছেন। মাঝি গান ধরল। গানটি তাঁর খুবই ভাল লেগেছিল। মঠে ফিরে স্বামী প্রেমানন্দ মহারাজকে বললেন—"মাঝি গান গাইছিল, বেশ গানটি। কিন্তু মনে পড়ছে না।"

"একটুও কি মনে নেই?" প্রেমানন্দজী জিজ্ঞাসা করলেন।

"শেষ লাইনটি মাত্র মনে পড়ছে।"

"আচ্ছা, শেষ লাইনটিই বল দিকিন্।"

"আমি আবোল-তাবোল বলতে পারি। শুধু বলতে নারি দুর্গাশিব।"

স্বামী প্রেমানন্দজী শুনে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলে উঠলেন—"হাঁ হাঁ, ঐ এক লাইন-ই তো যথেষ্ট! আর আবশ্যক কি? ঐতেই তো সব হবে।"

কর্মক্লান্ত সন্ধ্যায় শরীর-মন যখন অবসন্ন, গোধূলির স্নিগ্ধতায় হঠাৎ দূরাগত বংশীধ্বনির মতন ঐ একটি ছত্রই কানে ঝঙ্কার দিয়ে উঠে—"ম্যাসী হি হরি করতু দাস পর প্রীতি। হরি করতু দাস পর প্রীতি॥"

পরদিন অন্ধকার থাকতেই যাত্রা করেছি। তখনও তারাগুলি নিবে যায় নি। নবপ্রভাতে আমাদের যেন নবজন্ম হয়েছে। গত দিনের শ্রান্ত হতাশ লোকগুলি আবার নূতন আশার আলোকে সঞ্জীবিত হয়ে খরস্রোতা নদীর মতন চলেছে এগিয়ে। একদিনেই চব্বিশ মাইল পথ অতিক্রম করে ধারচুলায় যেতে হবে। প্রথম তিন মাইল উপলময় একটানা উৎরাই-পথ। সহযাত্রী বললেন—"উৎরাই দেখলেই বুক দুরদুর্ করে।

আবার হাঁটু ভেঙে উঠতে হবে তো ?" উৎরাইটি শেষ হল গৌরীগঙ্গার ধারে এসে। গৌরীগঙ্গা ছোট পার্বত্য নদী ; মিলাম হিমবাহ হতে বেরিয়ে অদূরে কালীগঙ্গায় মিশেছে। নদীব উপরকাব কাঠের পুল পেরিয়েই আরম্ভ হল চড়াই। হাঁটু কন্‌কন্‌ করে। এক জায়গায় এসে থামতে হল। এমন সংকীর্ণ ও পাকদণ্ডী পথ যে, পাহাড়ের গা ধরে অতি সন্তর্পণে উঠেছি। অনেকটা স্থান ধসে পড়েছে পাহাড়ের ধস্ নেমে। নীচেই নদীর অবিশ্রান্ত জলপ্রবাহ। তাকাতে ভয় হয়। চোখ বুঁজে এগুচ্ছি। অদূবে শোনা যাচ্ছিল কালীগঙ্গাব ভীম গর্জন। চডাইর শেষে সানুদেশ হতে দেখা যাচ্ছিল একটি সুন্দর মন্দির—গৌবী ও কালীর সঙ্গমস্থলে। স্থানটির নাম জৌনজীবী। আম্র ও অন্যান্য বৃক্ষের ঘন শ্যামল আবেষ্টনীর মধ্যে যেন একটি তপোবন। ভজনসাধনের উপযোগী স্থান।

সঙ্গমস্থলের ঐ মন্দিরটিকে কেন্দ্র করে পার্শ্ববর্তী বিস্তীর্ণ চড়ায় প্রতিবৎসব কার্তিক-সংক্রান্তি হতে সপ্তাহাধিক কাল-ব্যাপী প্রকাণ্ড মেলা বসে। জোহার, দরমা, ব্যাস ও চৌদাসপট্টির শত শত ভুটিয়া ও নেপালের অনেক ব্যবসায়ী ঐ মেলায় বহু টাকাব ব্যবসায় করে। পণ্য-দ্রব্যের মধ্যে ঘোড়া, খচ্চর, কম্বল, গরমপঙ্খী পশমিনা, ছাগল ও ভেড়ার চামড়া প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। দূর দূর স্থানের বহু পার্বত্য অধিবাসীও এ মেলায় প্রয়োজনীয় জিনিস কেনাবেচা করতে আসে।

এখন আমরা কালীগঙ্গার ধারে ধাবে চলেছি। অপর পারে নেপাল রাজ্য। কালীগঙ্গা নিজ উৎপত্তিস্থান লিপুলেক্ পাস হতেই বরাবর ভারতবর্ষ ও নেপালের সীমা নির্দেশ করে সমতল ভূমিতে গিয়ে পড়েছে। সাড়ে এগারটায় বালুয়াকোটে পৌঁছান গেল। পথের ধারে একটি মাত্র দোকান। কালীর হিমশীতল জলে স্নান করে স্নিগ্ধ হলাম। সামান্য

খিচুড়ি আহার করে আবার পথে বেরিয়েছি। প্রচণ্ড, প্রখর রৌদ্র—যেন অগ্নিবৃষ্টি। ছায়াহীন পথে ঘর্মাক্ত কলেবরে হাঁপাতে হাঁপাতে যেতে হচ্ছে। পাহাড়ে যে এতটা গরম হতে পারে তা ধারণা ছিল না। নিঃশ্বাস পর্যন্ত গরম হয়ে গেছে। পথে একটিও ঝরনা নেই। তৃষ্ণায় প্রাণ যায় যায়। দু'শ ফুট নীচে কালীনদী, কিন্তু নেমে জল খাওয়া অসম্ভব। রৌদ্রের প্রখর তেজে চারদিক ঝলমল করছে।

পথের শেষ নেই, কষ্টেরও অন্ত নেই। রাত্রি প্রায় আটটায়, অন্ধকারে ধারচুলা ডাকবাংলোয় আশ্রয় নিলাম। এখানে পুরো একটি দিন বিশ্রাম। রক্তামাশয়গ্রস্ত সহযাত্রীকে নিয়ে মহা ভাবনা। অসুখের বাড়াবাড়ি, খুবই দুর্বল হয়ে পড়েছে। এখনও ফিরে যাওয়ার সময় আছে। এখান থেকে ঘোড়াগুলি সব ফিরে যাবে লোহাঘাট পর্যন্ত। এদের সঙ্গেই সেই রুগ্ন পাহাড়ী সহযাত্রীকে তার বাড়ীতে পাঠিয়ে দেওয়া ঠিক হল।

পর দিন ভোরে সহযাত্রী অশ্রুপূর্ণলোচনে ফিরে যাচ্ছে ঘোড়াওয়ালাদের সঙ্গে। আবেগভরে বলল—"শিবজীর কৃপা হয় নি, তাই তো এতটা এগিয়েও শেষে ফিরে যেতে হল।" পাহাড়ী সহযাত্রীটি ফিরে গল। তারাপ্রসন্ন বাবু বিষণ্ণমুখে বললেন—"হাবাধনের ছেলেদের মতন একটি একটি করে শেষ পর্যন্ত সব কয়টিকেই খসে পড়তে না হয়! শরীরের গতিক যা দেখছি, আর পথেরও যা নমুনা, তাতে অষ্টবজ্রের সব বজ্রগুলির পতন না হলেই রক্ষা!"

গত কয়েক দিনে আমরা এ পার্বত্য পথে ১১৪ মাইল অতিক্রম করেছি। গার্বিয়াং এখনও ৫৫ মাইল দূরে। পথের এ অংশ খুবই সংকীর্ণ এবং কষ্টকর। ঘোড়া চলতে পারে না। মালপত্র সবই নিতে হবে কুলীর পিঠে। আর সকলকেই হেঁটে যেতে হবে। ঝম্পু কাণ্ডিতে বসে যাওয়া

চলে। কাণ্ডি লম্বা ঝুড়িবিশেষ। তাতে পা দুটি ঝুলিয়ে বসতে হয়, আর একজন লোক পিঠে করে নিয়ে যায়। কাণ্ডিতে গেলে পায়ে হাঁটার কষ্টের লাঘব হয় বটে, কিন্তু আরাম নেই। কাণ্ডিতে যেতে কেউ রাজী হলেন না। বোঝা নেবার মজুরদের পাঠাবার জন্য আমরা মায়াবতী হতেই খেলার পোষ্টমাষ্টারের নিকট অনুরোধপত্র ও অগ্রিম টাকা পাঠিয়েছিলাম। এই একদিনের বিশ্রামের অবকাশে সকলে কাপড়-চোপড় ও দেহের অনেক সংস্কার করে নিলাম।

ধারচুলা একটি গণ্ডগ্রাম। কালীনদীর ধারে ধারে লোকজনের বসতি। এখানে জিলাবোর্ডের হাসপাতাল, মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ডাকখানা, খ্রীষ্টধর্ম-প্রচারকদের একটি বড় কেন্দ্র, ডাকবাংলো এবং অনেক বর্ধিষ্ণু লোকের বাস। উচ্চতা মাত্র তিন হাজার ফুট। গরম জায়গা। প্রচুর আম, কলা, পেয়ারা ইত্যাদি ফল জন্মায়। ব্যাস্ ও চৌদাস্ পট্টির ভুটিয়াদের শীতাবাস। ধারচুলার ঠিক অপর পারেই কালীর ধারে নেপাল-সরকারের কাছারী, তহসিল, জেলখানা, খাজানাখানা, এবং একটি ছোট সৈন্য-নিবাস। নেপালরাজ্যে প্রবেশের একটি ঘাঁটি। একজন লেপ্‌টেনেণ্টের অধীনে পঞ্চাশ জন সুসজ্জিত সৈন্য বারমাস এই ঘাঁটি পাহারা দেয়। দু-তিন খানি মোটা কাছি ঝুলান আছে নদীর এপার থেকে ওপারে। তারই সাহায্যে লোকজন সামান্য মালপত্র পিঠে বেঁধে, ঝুলে ঝুলে এক অদ্ভুত উপায়ে পারাপার হয়। নেপালের দিকে কাছারীর ঘাটে, তিন-চারখানি ছোট নৌকাও বাঁধা রাছে।

বিশ্রামের দ্বিতীয় দিন—৩রা আষাঢ়, রবিবার। দশটা নাগাত বোঝারে মজুররা খেলা থেকে এসে গেছে। দীর্ঘ পথযাত্রায় সাধারণতঃ একজন মজুর ত্রিশ সের আন্দাজ বোঝা নিয়ে যায়। দুপুরের পরেই

খেলার দিকে রওনা হলাম। দশ মাইল পথ, কিন্তু শেষের দিকটা বিকট চড়াই। দু' মাইল যাওয়ার পরেই তপোবন—কালীনদীর ঠিক উপরেই। মনোরম স্থান। কয়েক বৎসর পূর্বে এখানে রামকৃষ্ণ মিশনের দাতব্য চিকিৎসালয় ও অবৈতনিক বিদ্যালয় ছিল। বর্তমানে মিশন-কর্তৃপক্ষ এখানকার কাজ বন্ধ করে আশ্রমটি জিলাবোর্ডের হাতে দিয়েছেন। স্থানটি বেশ উর্বর। নদীর তীর থেকে ঢালু পাহাড়ের গা পর্যন্ত চাষ-আবাদ চলেছে। একটি পর্বতগাত্র ঘেঁষে অতি সংকীর্ণ পথ। বেলে পাথর। কোথাও পথ ধসে গিয়ে আধহাত মাত্র সরু হয়ে গেছে। প্রাণটি যেন হাতে নিয়ে চলেছি। খুব বেশী কষ্ট হচ্ছিল অরুণ বাবুর। তিনি দশ পা এগিয়েই বসে পড়ছিলেন।

দূরে দেখা যাচ্ছিল ক্ষুদ্র একটি গ্রাম। কয়েকখানি ঘর—চিত্রপটে যেন আঁকা। আমরা ক্রমশঃ উপরের দিকে উঠছি। নদীর ওপারে মনোরম শোভা সূর্যালোকে সব ঝকঝক করছিল। পর্বতপ্রাচীর আমাদের পিপাসু দৃষ্টিকে আর প্রতিহত করতে পারছে না। মুগ্ধ চোখ প্রকৃতির স্নিগ্ধ অবকাশের মধ্যে নিজেকে হারিয়ে ফেলেছে। বরাবর নদীর ধারে ধারে চলেছি। কোথাও চার-পাঁচ শত ফুট নীচে গর্জনমুখরা খরস্রোতা নদী। পর্বতগাত্রের সঙ্গে নদীর শক্তি-পরীক্ষা রোমাঞ্চকর। পথ অতীব সংকীর্ণ। একটি পা ফস্‌কালেই কালীর অগাধ জলে তলিয়ে যেতে হবে। শেষ দু'মাইল কঠিন চড়াই। সন্ধ্যার কিছু পূর্বে খেলায় প্রতাপ সিং-এর দোকানের পাশে একটি চালাঘরে আশ্রয় নেওয়া গেল। বোঝারে মজুররা খেলা ও পার্শ্ববর্তী স্থানেরই লোক। পরদিন খুব ভোরে আসবে ভরসা দিয়ে সকলেই নিজ বাড়ীতে চলে গিয়েছে। সে রাত্রে রান্নার হাঙ্গামা না করে প্রতাপ সিং-এর দোকানেই রুটি-তরকারি করিয়ে নিয়েছি।

কৈলাস ও মানসতীর্থ

আমরা ক্রমেই এগিয়ে চলেছি বরফের রাজ্যের দিকে। শীঘ্রই বরফের ভিতর বাস করতে হবে। খেলায় রাত্রে বেশ কন্‌কনে ঠাণ্ডা। স্থানের উচ্চতা ৯,৫০০ ফুট। চারিপাশেই অত্যুচ্চ পর্বতমালা। খেলা গ্রামটি একটি পর্বতের চূড়ায় অবস্থিত। বর্ধিষ্ণু ও অনেকদূরব্যাপী। এখানকার গাওয়া ঘি বিখ্যাত। আমরা পূর্বেই পোষ্টমাষ্টারের নিকট প্রয়োজনীয় ঘি কিনে রাখার জন্য টাকা পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। গ্রামে ডাকঘর, অনেকগুলি দোকান, একটি ধর্মশালা, বিদ্যালয়, একজন বৈদ্যও আছেন। স্থানীয় লোকেরা চাষী, সকলেরই জমি আছে। প্রতি বৎসর বহু কৈলাসযাত্রি-সমাগমে খেলা গ্রামের বেশ দু'পয়সা আমদানী হয়। এখান হতে তিব্বতে যাবার দুটি পথ—একটি দরমা পাস অতিক্রম করে, অপরটি লিপুলেক পাস উল্লঙ্ঘন করে পশ্চিম তিব্বতে প্রবেশ করেছে। আমরা যাচ্ছি শেষোক্ত পথেই। খবর নিয়ে জানা গেল ইতঃপূর্বেই কয়েকটি যাত্রিদল এগিয়ে গিয়েছে।

পূর্বকথা মতো পরদিন সকালে মজুররা কিন্তু একজনও এল না। অথচ মালপত্র সঙ্গে না নিয়ে যাবারও উপায় নেই। ছুটে গেলাম পোষ্টমাষ্টারের বাড়ীতে। এদিকে-সেদিকে সন্ধানও নেওয়া গেল কিন্তু ফল কিছুই হল না। সহযাত্রীরা বাইরে কৃত্রিম ক্রোধ প্রকাশ করতে লাগলেন কিন্তু ভিতরে ভিতরে সকলেই খুশী। বিছানায় শুয়ে শুয়ে এপাশ আর ওপাশ! সেদিনটা খেলাতেই কাটাতে হল। বৈকালে চারিদিকে বেড়িয়ে দেখে এলাম। শীতের সময় খেলাতে এত অধিক বরফপাত হয় যে, গ্রামবাসীদের সকলেই ধারচুলা, আস্‌কোট, আলমোড়া প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত গরম জায়গায় নেমে যায়। তখন এ বরফের রাজ্যে জন-প্রাণী কেউ থাকে না। বরফ গলতে আরম্ভ হলে ফাল্গুন-চৈত্র মাসে সকলেই গ্রামে ফিরে আসে।

যাত্রা

সন্ধ্যার একটু পূর্বে মজুররা এল। পরদিন যখন বেরিয়েছি তখনও চারিদিক সুপ্তিমগ্ন। ঊষা নিঃশব্দচরণে সবেমাত্র এসে দাঁড়িয়েছে। মৃদু শীতল বায়ুস্পর্শে দেবদার-বনে উঠছে শিহরণ। খুবই ঠাণ্ডা। কাঁপতে কাঁপতে চলেছি কিন্তু ঠাণ্ডাতেই হাঁটা যায় বেশ। খানিকটা চলার পরেই গা গরম হয়ে উঠে; তখন চলতে তত শ্রান্তি বোধ হয় না। একটানা উৎরাই পথ। অদূরে ধৌলীগঙ্গা ও কালীর ভীম গর্জনধ্বনি পর্বতগাত্রে প্রতিধ্বনিত হয়ে গম্ভীর, মধুর সঙ্গীতের সৃষ্টি করেছে। প্রায় দেড় মাইল নেমে এসে যখন ধৌলীর তীরে উপস্থিত হলাম, তখনও প্রভাতের অরুণ-আভা ধরণীর বুকে এসে পৌঁছায় নি। এক অনির্বচনীয় স্তব্ধতায় দিগন্ত পরিব্যাপ্ত। শুধু কানে আসছে ধৌলীর ক্রুদ্ধ নিরবচ্ছিন্ন গর্জন। পর্বতের সঙ্গে নদীর খেলা দেখলে আর চোখ ফেরান যায় না। চোখভরে দেখে দেখে মনে ছবি এঁকে রাখি। আবার দেখি।

দরমা-পাস হতে বেরিয়ে ধৌলীগঙ্গা অদূরেই কালীর সঙ্গে মিশেছে। নদীর উপরকার কাঠের অস্থায়ী কম্পিত সেতু ভয়ার্ত প্রাণে কোনরকমে পেরিয়ে পরপারে এসেছি। সামনেই পঙ্গুর চড়াই। ঐ চড়াই নাকি সকলকেই একেবারে পঙ্গু করে দেয়। চড়াইর পাদদেশে একত্র হয়ে একবার ক্ষীণকণ্ঠে জয়ধ্বনি দিয়ে ধীরে ধীরে চড়াই আরম্ভ করা গেল। তিন মাইলের চড়াই কিন্তু উঠতে হয় প্রায় পাঁচ হাজার ফিট। ভাবতেই অন্তরাত্মা আর্তনাদ করে উঠে। সমূহ বিপদ দেখে পরস্পরে মুখের দিকে তাকাচ্ছি। সাহস দিবার ভাষা কারো নেই। পথ এঁকে-বেঁকে উপরে উঠেছে, আমরাও আস্তে আস্তে উঠছি—কেবলই উঠছি। নীচে ছুটে চলেছে তীব্র বেগে দুটি নদী। পর্বতের গা ধরে ধরে উঠতে হয়। প্রায় ঘণ্টাখানেক উঠার পর দেখা গেল চারিপার্শ্বের উচ্চ পর্বতশিখর নবারুণচ্ছটায়

ঝকঝক করছে। এদিকে চড়াইর উপরের দিকে তাকিয়ে তার শেষ যে কোথায় কিছুই বুঝতে পারা গেল না। হিমালয়ান ক্লাবের উপদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করে—অর্থাৎ ছোট ছোট পা ফেলা, প্রত্যেক পদক্ষেপে একবার শ্বাসগ্রহণ ও একবার ত্যাগ, সামনের দিকে ঝুঁকে চলা, মুখে লজেন্স গোঁজা—সব কিছু করে উঠছি। তবু ক্রমে হাঁটু ভেঙ্গে আসতে লাগল। সারা শরীর কাঁপছে। উঠছি তো উঠছি। একটি ঝরনা দেখে হুমড়ি খেয়ে ঝরনার ধারে বসে, আকণ্ঠ জল পান করে সকলেই শুয়ে পড়লাম। আর এক পা-ও চলবার যেন শক্তি নেই।

অনেকক্ষণ শুয়ে-বসে থেকে একটু জলযোগ করে পুনরায় পায়ের উপর দাঁড়াতে হল। চড়াই আর চড়াই। কারও মুখে রা-শব্দটি নেই। না আছে কথা বলার শক্তি, না প্রবৃত্তি। শরীর ও মনের সমস্ত শক্তি কেন্দ্রীভূত করে কেবলই উঠছি। ইতঃপূর্বে আমরা ডিউরীর, সরযূর ও সিঙ্গালীর চড়াই অতিক্রম করে এসেছি, কিন্তু এতো চড়াই নয়! এ যেন চার পায়ে হামাগুড়ি দিয়ে সিঁড়ি-বিহীন একটি পর্বতগাত্র বেয়ে বেয়ে উঠা! নির্বাক্ বিস্ময়ে এক একবার উপরকার দিকে তাকাই, আবার চলি। একবার বসি, আবার উঠি। কতদূর উঠেছি, আরও কত উঠতে হবে তা জানি না। চড়াইর একটা বাঁক ঘুরে এমন স্থানে এলাম, যেখানে ধৌলীগঙ্গার নীলবক্ষ হতে উচ্চশির পর্বতচূড়ার সমস্তটাই প্রায় দেখা যায়। উর্ধ্বে ও নিম্নে দৃষ্টিপাত করে যা দেখলাম তা জীবনে ভুলব না। নীল ধৌলীর কিঞ্চিৎ উপরে পর্বতগাত্রে মেঘের সংঘর্ষ, বিদ্যুৎ-স্ফুরণ, প্রচণ্ড বজ্রধ্বনি ও প্রবল বৃষ্টি। আর আমরা যেখানে দাঁড়িয়ে, সেখানে প্রখর রৌদ্র। আবার কিছু উপরে মেঘসম্ভার, বজ্রধ্বনি ও বিদ্যুতের খেলা। মেঘজাল ও রৌদ্রের এমন যুগপৎ সমাবেশ—কোমল-

কঠোরের মিলন, কোথাও কখনও দেখি নি। বিশ্বপ্রকৃতির খেলা দেখে নয়ন মুগ্ধ হয়ে গেল। নীরবে পরমপিতার চরণে মস্তক নত করলাম। তখন মনে হল, যেন কোন স্নেহময়ী দেবীর কোমল করস্পর্শে সকল শ্রান্তি মুছে গিয়েছে।

যখন এগারটা নাগাত চড়াই-এর শেষে পর্বতশিখরে এসে দাঁড়ালাম, প্রাণের নিভৃত কন্দরে জাগ্রত দেবতার সাড়া পাওয়া গেল—'মাভৈঃ মাভৈঃ'। পথের পাশেই নুড়ি-পাথরের একটা স্তূপ দেখা গেল। সঙ্গী মজুররা বললে—'দেবতাস্থান'। যাতায়াতের পথে ঐ দেবতাস্থানে প্রস্তর ছুড়ে মারবার প্রথা। আমরাও দেবতার প্রসন্নতার জন্য পাথর ছুড়ে মেরে এগিয়ে চললাম। পঙ্গুর চড়াই সকলকেই বিশেষ ক্লান্ত করে ফেলেছিল। দুপুর রোদে এমন কঠিন চড়াই করে এসেও বেশ শীত বোধ হচ্ছিল। স্থানের উচ্চতা প্রায় নয় হাজার ফুট। মাইল খানেক পরেই পঙ্গু গ্রাম। একটি ধর্মশালাও আছে। পাশের একটি বড় আখরোট গাছের নীচে ছায়াশীতল প্রকাণ্ড শিলাখণ্ডের উপর দেহ এলিয়ে দিয়ে শুয়ে পড়লাম। উজ্জ্বল রোদে চারিদিক ছেয়ে গেছে। শুয়ে থাকতেই বেশ লাগছিল—ক্ষুধা-তৃষ্ণা ভুলে গেছি।

হঠাৎ নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে কানে এল অদূরে ধর্মশালা হতে একদল যাত্রীর কলরব। কি আশ্চর্য! যাত্রীর মধ্যে একজন অন্ধ ধীরে ধীরে সহযাত্রীর হাত ধরে এগিয়ে আসছে। দেখে তো এ অঞ্চলের লোক বলে মনে হয় না! কৌতূহল হল। তাঁর কাছে গিয়ে বললাম—"নমস্তে বাবুজী। আপনার দেশ কোথায়?" অন্ধ ভদ্রলোক প্রত্যভিবাদন জানিয়ে উত্তর দিলেন—"প্রতাপগড় জেলায়, উত্তর প্রদেশে।" প্রশ্ন করতে যাচ্ছিলাম—কৈলাসদর্শনে যাচ্ছেন কি? কিন্তু অন্ধকে একথা জিজ্ঞাসা করা

শোভন হবে কি-না, তাই বললাম—"কোথায় যাবেন ?" হাতজোড় করে দৃষ্টিহীন চোখ দুটি আকাশের দিকে তুলে অঞ্জলিবদ্ধ হস্ত কপালে ঠেকিয়ে তিনি উত্তর করলেন—"কৈলাসদর্শনে।"

"দর্শনে ? কি দেখবেন ?"

কথাটা বলেই কিন্তু খুব লজ্জা হল। ছি, ছি ! কি বাচালতাই করে বসেছি ! অনবধানতাকৃত অপরাধের জন্য মার্জনাভিক্ষা করব কি-না ভাবছি, ভদ্রলোক স্মিতহাস্যে বললেন—"বাবাজী, কৈলাসপতির ইচ্ছা নয় যে এই চর্মচক্ষে আমি তাঁর স্থান দর্শন করি। তা না হলে তিনি আমায় জন্মান্ধ করে সৃষ্টি করতেন না। তবে কেন এই অসহনীয় দুঃখকে স্বেচ্ছায় বরণ করে চলেছি ?—তাঁর দরবারে হাজির হব বলে। আমি তাঁকে দর্শন করতে পাব না, কিন্তু তিনি তো আমায় দেখতে পাবেন ! তাতেই আমার জীবন সার্থক হয়ে যাবে।"

তাঁর দৃষ্টিহীন চক্ষু দুটি হতে দু-বিন্দু প্রেমাশ্রু গণ্ড বয়ে গড়িয়ে পড়ল। নির্বাক্ বিস্ময়ে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম। মনে হল চক্ষুহীন শিবভক্ত সেই দেবীসহায়ের কথা। শিবের কৃপায় তিনি দৃষ্টিশক্তি লাভ করে চর্মচক্ষেই শিবরূপ-দর্শনে ধন্য হয়েছিলেন।

উঠে আবার রওনা হয়েছি। প্রথমটা দেড় মাইল উৎরাই। ঐ কঠিন চড়াইর পর, উৎরাইটিতে বেশ আরাম হচ্ছিল। কিন্তু বেশীক্ষণ নয়; আবার আরম্ভ হল সোসার চড়াই। চড়াই আর উৎরাই। পাথরে পা ঠুকে ঠুকে সব বেদনাময় হয়ে গেছে। অবসন্নদেহে চার মাইল পথ অতিক্রম করে আড়াইটা নাগাত যখন আশ্রয় নিলাম সিখ্‌রা গ্রামের ধর্মশালায়, তখন আমাদের অবস্থা দেখলে অতি কঠোর প্রাণেও দয়ার উদ্রেক হ'ত।

গ্রামটি খুব বড়, কিন্তু ভীষণ আবর্জনাপূর্ণ ও পূতিগন্ধময়। গ্রামের

কৌতূহলী ছেলেমেয়েরা ঘিরে দাঁড়িয়েছে—যেন মূর্তিমান বীভৎসতা। চোখের চারিপাশে যেন মাছির চাক, অথচ মাছি তাড়াবার বিন্দুমাত্র প্রয়াস নেই। এ যেন তিতিক্ষার পরাকাষ্ঠা। এই আমাদের প্রথম ভুটিয়া গ্রামে প্রবেশ। বাড়ীর সামনে—এদিকে সেদিকে মলমূত্র ত্যাগ করে সব স্থানটিকে দ্বিতীয় নরকে পরিণত করে রেখেছে। ধর্মশালার ভিতরটিও অবহেলার নিদর্শনে পরিপূর্ণ। আর কী দারুণ মাছির উৎপাত! চাকবদ্ধ হয়ে মাছি ঝুলছে—চারিপাশে। তারাপ্রসন্ন বাবু বললেন—"মৌচাকই তো এতকাল দেখেছি—এ যে দেখছি মাছির চাক!" শুনে এত অবসাদেও সকলের মুখে হাসি ফুটল। গ্রামবাসীদের সশ্রদ্ধ ব্যবহার ও আন্তরিকতায় মুগ্ধ হতে হয়, বিশেষকরে আমাদের সন্ন্যাসী দেখে নানাভাবে স্বাচ্ছন্দ্য-বিধানের চেষ্টার কত তৎপরতা!

বোম্বাই অঞ্চলের একদল যাত্রী স্থানীয় স্কুলগৃহে আশ্রয় নিয়েছে। গ্রামের উপরেই খ্রীষ্টধর্ম-প্রচারকদের বড় রকমের একটি কেন্দ্র। প্রকাণ্ড বাড়ী, ফুল-ফলের বাগান। দু-তিন জন পাদ্রী থাকে। সিখ্‌রা ঠাণ্ডা জায়গা। রাত্রে খুবই শীত বোধ হচ্ছিল।

আমাদের স্মৃতিশক্তি ক্রমেই ক্ষীণ হয়ে আসছে। গতদিনের কষ্টের কথা ভুলে গেছি। সুখ-দুঃখ কেবল মাত্র ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাচ্ছে, মনের উপর কোন দাগ কাটতে পারে না। সেই দুর্লভের আকর্ষণ সারাটি মনপ্রাণ জুড়ে রয়েছে, কেমন একটা নেশায় যেন আমরা মেতে আছি। আজ যেতে হবে এগার মাইল, জিপ্তী পর্যন্ত। খুব ঠাণ্ডার মধ্যেই বেরিয়ে পড়েছি—ভোরে ভোরে। প্রথম দু মাইল উৎরাই-পথ সুমেরিয়া ঝরনার ধার পর্যন্ত। প্রকাণ্ড ঝরনা—একটি ক্ষুদ্র পার্বত্য নদীর মতন। পাহাড়ীরা বেশ কৌশল করে ঐ ঝরনার জলকে কাজে লাগাচ্ছে। নালী কেটে,

অনেক দূর পর্যন্ত নিয়ে গিয়ে চাষের কাজে লাগান ছাড়াও গম-পিষ্‌বার জাঁতা চালাচ্ছে ঐ জলে। মজুর-সর্দার বলেছিল, আজও একটি দু-মাইলের কঠিন চড়াই আছে। চড়াইর কথা শুনলেই বুকের ভিতর কেমন একটা আতঙ্কের সৃষ্টি হয়। ঘন বনানীর ভিতর দিয়ে পথ। দু পাশেই উত্তুঙ্গ পর্বতমালা। শীতকালে এ রাজ্য বরফে ঢাকা থাকে। প্রচুর তুষারপাতের চিহ্নস্বরূপ গাছে গাছে শৈবাল ঝুলছে। নিবিড় বনস্থলীর ফাঁকে ফাঁকে দেখা যাচ্ছিল পরিচ্ছন্ন আকাশ, আর প্রভাতের নির্মল রৌদ্র। পর্বতের গায়ে গায়ে ভুটিয়ারা শত শত 'ভেড়-বকরী' চরাচ্ছিল। নিশ্চল শ্যামল বনানীর মধ্যে সচল সাদা সাদা ভেড়া ও ছাগলগুলি দেখাচ্ছিল অতি চমৎকার। উঠতে উঠতে বুকের ভিতরে হাতুড়ি-পেটার মতন শব্দ শুনে নিজেরাই চমকে উঠি। হাঁপাতে হাঁপাতে ঘর্মাক্তকলেবরে সুমেরিয়া-ধারের সর্বোচ্চ শিখরে উঠে যখন চারিদিকে তাকালাম, তখন দেহমনের সব ক্লান্তি নিমেষে মুছে গেল। আহা! কি অপরূপ সৌন্দর্য-বৈভব! আকাশের দিগ্‌বলয় সুবিস্তৃত হয়ে মিশেছে অসীমে—খুলে গেছে সকল দিকে দৃষ্টির বাধা; হৃদয়ের প্রসারতা ও পরিব্যাপ্তি। কখনো বিদীর্ণ মেঘের ফাঁকে ফাঁকে হেসে উঠছে রৌদ্রোজ্জ্বল আকাশ। এ বিপুল পরিবেশের মধ্যে নিজের ক্ষুদ্রত্ব ডুবে গিয়ে বিরাটের সঙ্গে এক হয়ে যায়।

এখানেও পর্বতচূড়ায় একটি প্রস্তরস্তূপ। তারই পাশে উড়ছিল এক ঝাণ্ডা। স্থানের উচ্চতা দশ হাজার ফুট। পথে ভুটিয়া পুরুষ ও রমণীদের সঙ্গে দেখা হচ্ছে। দেহ গরম পোশাকে আবৃত, সকলেরই হাতে একটি তক্‌লি। পথ চলতে চলতে পশমের সুতো কাটছে। মাঝে মাঝে ভুটিয়া-পল্লীশ্রী দেখতে পাওয়া যায়। কুতূহলী বালক-বালিকারা পথে ভিড় করে দাঁড়ায়—কি যেন বলেও। তাদের ভাষা বুঝতে পারি নে। একটি করে

পয়সা পেলে খুবই খুশী হয়ে আনন্দে নাচতে থাকে। দেখতে যদিও খুব অপরিচ্ছন্ন, কিন্তু এদের স্বাস্থ্য দেখে ঈর্ষা হয়। মুখমণ্ডলে রক্তের আভা, বেশ মজবুত ও বলিষ্ঠ গড়ন।

জিপ্তী স্থানটি অতীব মনোরম। সিখ্রার তুলনায় ইন্দ্রভূমি। সে আবর্জনাস্তূপ নেই, মাছির অভিযান নেই—চারিদিক উন্মুক্ত। দূরে পর্বত-শ্রেণী। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলাম। কিন্তু নিরবচ্ছিন্ন সুখ কোথাও নেই—একান্ত স্থানাভাব। একটি মাত্র দোকান ও পাশে একটি চালা-ঘর মাত্র। ইতঃপূর্বেই দু দল যাত্রী এসে সব স্থান দখল করেছে। তাদের সঙ্গে লোকজনও অনেক। তিনটি যাত্রিদলে সর্বসমেত প্রায় ষাট জন লোক। কোন রকমে গাদাগাদি করে থাকা হল। এ পথে চটী নেই। মাঝে মাঝে দু-একটি করে দোকান বা ধর্মশালা, তাতেই যাত্রীদের থাকতে হয়।

খেলা ছেড়ে এতটা পথে কালীগঙ্গার সাক্ষাৎ কোথাও মেলে নি। এখানে দেখা গেল জিপ্তীর চার-পাঁচ শত ফুট নীচে এক গিরিখাতের ভিতর দিয়ে কালী বয়ে যাচ্ছে। জিপ্তীর পরেই মালপা। দূরত্ব আট মাইল। কিন্তু এই আট-মাইল পথ অতীব দুর্গম ও বিপৎসংকুল। উপর হতে পাথর গড়িয়ে পড়ে প্রতিবৎসরই এ পথে লোক মারা যায়, অথচ প্রতিকারের কোন উপায়ও নেই। প্রথম বর্ষাতেই পাথর গড়ায় বেশী।

১৯৩১ সালে মহীশূরের ভূতপূর্ব মহারাজার কৈলাসযাত্রা উপলক্ষে জিপ্তী হতে মালপার এ পথটি নির্মিত হয়েছিল। পূর্বে স্থানীয় লোকজন ও যাত্রীরা যাতায়াত করত 'নিরপানিয়া চড়াই' নামক পথ দিয়ে। ঐ পথে চড়াই বেশী, আর একবিন্দু জল কোথাও পাওয়া যেত না। সে জন্যই ঐ পথের নাম ছিল 'নিরপানিয়া'। কিন্তু ও-পথে পাথরচাপা পড়ে মারা

যাবার আশঙ্কা মোটেই ছিল না। বর্তমানে 'নিরপানিয়া' পথে লোক-চলাচল বন্ধ হয়ে গেছে।

বিকেলের দিকে একটু ঘুরে ঘুরে দেখছিলাম, এমন সময় জলভরা মেঘ আমাদের ঘিরে ফেলল। আবার দেখতে দেখতে ঘন মেঘের বুক চিরে এক ঝলক সূর্যরশ্মি এসে সব রাঙ্গিয়ে দিয়েছে। প্রকৃতির রঙ্গমঞ্চে চকিতে বিচিত্র পটপরিবর্তন, দেখে মুগ্ধ হয়ে যেতে হয়। সন্ধ্যার পূর্বেই আকাশ ঘোর ঘনঘটা করে এসেছে। আর চলিত কথায় যাকে বলে—'যেখানে বাঘের ভয় সেখানেই সন্ধ্যা হয়'—আমাদের ভাগ্যেও ঘটেছিল তা-ই। আরম্ভ হল জোর বৃষ্টি। মালপার পথে সমূহ দুর্ঘটনাব আশঙ্কায় সকলেরই মুখ শুকিয়ে গেল। সকল যাত্রিদলেই আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে। এদিকে যে ঘাসের চালাটিতে আমবা মাথা গুঁজেছিলাম, তার শত ছিদ্রপথে জল পড়ে বিছানাপত্র ভিজে একাকার। শীত-প্রধান স্থান, চাবিদিক খোলা, ভিজে বিছানা—মণিকাঞ্চন-যোগ। বৃষ্টি চলেছে সমভাবেই। ইতিকর্তব্য স্থির করার জন্য রাত্রে আমাদের মজুর-সর্দারের সঙ্গে পবামর্শ করে স্থির হল যে, পবদিন সকালে নেহাৎ জোর বর্ষা যদি না থাকে তা হলে এগিয়ে যাওয়াই উচিত; নচেৎ অনির্দিষ্ট কালের জন্য জিপ্তীতেই অপেক্ষা করা ছাড়া গত্যন্তর থাকবে না।

ভোরে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। অল্প অল্প বৃষ্টিও হচ্ছে। সকলকে বেশী ভাববার অবকাশ না দিয়ে আমি দুই জন পাহাড়ী সহযাত্রী নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। মজুরসর্দার আব সকলকে সঙ্গে করে পরে আসবে স্থির হল। সে সময় মনের অবস্থা যে কি হয়েছিল, তা ভাষায় ব্যক্ত করবার নয়। মনে হচ্ছিল—আর হয়তো সকলে একত্র মিলিত নাও হতে পারি। আধ মাইল পরেই আরম্ভ হল একটানা উৎরাই, কালী নদীর ধার পর্যন্ত।

প্রস্তরবহুল সংকীর্ণ অতি পিচ্ছিল পথ। পা টিপে টিপে পর্বতের গা ধরে ধরে মহা সন্তর্পণে এগুচ্ছি। পথটি দেড় ফুট মাত্র প্রশস্ত। পথের উপর দিয়ে বয়ে যাচ্ছে জলস্রোত। ডান দিকে অগাধ গিরিখাত—তাকাতে বুক কেঁপে উঠে। একটু পা ফস্‌কালেই একেবারে মৃত্যুগর্ভে। কোন প্রকারে হামাগুড়ি দিয়ে নামছি। নেমে তো এলাম কালীর গর্ভে। আবার উঠতে হচ্ছে। ঐ সংকীর্ণ পথের ঠিক নীচ দিয়েই ছুটে চলেছে খরস্রোতা নদী। দু বৎসর পূর্বে এখানেই এক মারাঠী বৃদ্ধা যাত্রী কাণ্ডি ও বাহক-সমেত তলিয়ে গিয়েছিল। কেবলই ভয় হচ্ছিল যে কৈলাসযাত্রা বুঝি বা এখানেই শেষ হয়!

বেলা-বাড়ার সঙ্গেই আকাশ পরিষ্কার হতে লাগল। অতি সন্তর্পণে পা ফেলে 'নিজাং' জলপ্রপাতের কাছে এলাম। কয়েক শত ফুট উপর হতে একটি গিরিগাত্র ভেদ করে ভীমবেগে নীচে নেমে আসছে নিজাং। প্রপাতটি এমন-ই বেগে পড়ছে যে, জলকণায় চারদিক আচ্ছন্ন হয়ে গেছে। দেখবার মতন প্রপাতই বটে, কিন্তু আমাদের এগিয়ে যেতে হবে। দেখতে দেখতে মেঘজাল ভেদ করে সূর্যকিরণ ঐ জলকণাতে প্রতিবিম্বিত হয়ে রামধনুর সপ্তরাগে স্থানটি অনুরঞ্জিত করে দিল। আহা! কি নয়নাভিরাম! নিজাং-এর জলস্রোত গিয়ে পড়ছে কালীর গর্ভে। প্রপাতের উপরকার কাঠের অস্থায়ী সাঁকোটি পেরিয়ে এলাম। সামনের দেড় মাইল পথ বিশেষ বিপজ্জনক। পাথর চাপা পড়ে এখানেই লোক মারা যায়। পাশের পাহাড়টি বৃক্ষলতাহীন, অনুর্বর, বেলেমাটি ও পাথরের তৈরী। বৃষ্টি হলেই পাথর স্থানচ্যুত হয়ে গড়িয়ে পড়ে। ভয়ার্তপ্রাণে পাহাড়ের গা ঘেঁষে ধীরে ধীরে এগুচ্ছি। সাধারণতঃ পাথর গড়িয়ে পড়বার সময় নিজ গতিবেগের দরুন একটু দূরে গিয়ে পড়ে। পাহাড়ের খুব গা ঘেঁষে চলাই

উচিত। পথের উপর গড়িয়েপড়া বড় বড় পাথর দেখা গেল। কোন প্রকারে চলেছি। একস্থানে আমাদের একটু সামনেই সশব্দে এক প্রকাণ্ড পাথর গড়িয়ে পড়তে দেখে পাহাড়ী সহযাত্রী 'মর্‌গয়া-মর্‌গয়া' শব্দে চেঁচিয়ে উঠল! দৈবকৃপায় ঐ মৃত্যুসঙ্কুল পথটি অতিক্রম করে এলাম। কালীগঙ্গার তীরে তীরে পথ। দশটা নাগাত নির্বিঘ্নে মালপাতে পৌঁছেছি। পাশাপাশি দু-খানি মাত্র চালাঘর। একখানি ডাক-হরকরাদের, অপর খানিতে যাত্রীরা আশ্রয় নেয়। অনেক খোশামোদ করে এ চালাতে একটু স্থান পাওয়া গেল। হিমকণামিশ্রিত জোর বরফানি হাওয়া বুকের ভিতরটা পর্যন্ত কাঁপিয়ে দেয়। সহযাত্রীদের নিরাপদে না পৌঁছান পর্যন্ত উদ্বেগের সীমা নেই। তাঁদের যত দেরি হচ্ছিল, ততই বেড়ে যাচ্ছিল দারুণ উৎকণ্ঠা। প্রায় বারটার সময় দূরে দেখা গেল, স্বামী দুর্গাত্মানন্দ তাঁর হিল্‌ষ্টিকের উপর বিজয়নিশানের মতন গৈরিকবস্ত্র উড়িয়ে আমাদের অভিনন্দন জানাচ্ছেন।

আমরা সকলে তো পৌঁছে গেছি। কিন্তু বেলা দুটা নাগাত খবর পাওয়া গেল যে, অন্য যাত্রিদলের মজুরসর্দার নিজাং প্রপাতের একটু দূরে পাথরচাপা পড়ে মারা গিয়েছে। ডাক-হরকরাদের কাছে ঐ খবর পেয়েই সকলের প্রাণে মহা আতঙ্কের সৃষ্টি হল। দশ-বার জন মজুর আসছিল পিঠে বোঝা নিয়ে সারিবদ্ধভাবে। এমন সময় এক প্রকাণ্ড পাথর চাপা পড়ে মজুরসর্দাব ওখানেই মারা যায়। নীচে কালীনদীর গর্জনে অত বড় পাথর গড়িয়ে পড়ার শব্দও কেউই শুনতে পায় নি। বাকী মজুররা বোঝা নামিয়ে সঙ্গীর মৃতদেহ পাহারা দিচ্ছে। এই হাঙ্গামা চলেছিল অনেক রাত পর্যন্ত। শেষটায় যাত্রিদলের গাইড মজুরদের বকশিস্ দেবার আশ্বাস দিয়ে অনেক রাত্রে মালপত্র নিয়ে মালপাতে এল।

শকুনি ও শেয়ালের হাত থেকে বাঁচাবার জন্য মৃতদেহটিকে বড় বড় পাথর চাপা দিয়ে রেখে আসা হয়েছে। পাটোয়ারী এসে হুকুম না দেওয়া পর্যন্ত ঐ লাশ সরাবার কারো অধিকাব নেই। পাটোয়াবী হেড্‌কোয়াটারস্ গার্বিয়াং-এ, হয়তো দু-তিন দিন পরে আসবে। সব ঘটনাটি তালগোল পাকিয়ে মনের ভিতব কেমন জানি একটা বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করেছিল। আহা! জীবনের এই কি পরিণাম। আমরা প্রকৃতির হাতের ক্রীড়নক মাত্র। জানি মৃত্যুর কাছে মানুষ বলে কোন পক্ষপাতিত্ব নেই। তবুও এইভাবে মত্য! বড়ই মর্মান্তিক! মৃত লোকটিরও কোথাও আছে একটি স্নেহের নীড়। তারও হয়-তো আছে আদরের দুলাল, স্নেহের দুলালী। তাদেরই মুখে দুটি অন্ন দেবে বলে নিজ প্রাণের মায়া পরিত্যাগ করে এ মৃত্যুময় দুর্গম পথে সে নিজেকে টেনে এনেছিল। হয় তো দু-এক মাস পরে এ মৃত্যুসংবাদ তাদের কানে পৌঁছবে।

সন্ধ্যার পূর্ব হতেই ঝড়বৃষ্টি। প্রকৃতির কি প্রলয়ঙ্করী মূর্তি রাত্রি একটার পর বৃষ্টি থামল। আকাশ পরিচ্ছন্ন। শুক্লা ত্রয়োদশীর স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নায় পর্বতচূড়া, গিরিকন্দর, কালী নদীর সুগভীর উপত্যকা যুগপৎ উদ্ভাসিত। কী সুন্দর অথচ কী ভীষণ! নিম্নে নদীর বক্ষে উজ্জ্বল গলিত রৌপ্যধারা ভীমগর্জনে প্রবাহিত। মধ্যে সুবর্ণমণ্ডিত স্নিগ্ধ পর্বতগাত্র, ঊর্ধ্বে কর্পূরগৌর শুভ্র আকাশ। কী অপরূপ রূপসমাবেশ! কতক্ষণ বাইরে দাঁড়িয়েছিলাম মনে নেই। দুর্জয় ঠাণ্ডায় চমক ভাঙল। ধীরে ধীরে কুটিরে প্রবেশ করলাম।

মালপা হতে বুধী পর্যন্ত আট মাইল পথও খুবই খারাপ, কিন্তু পাথর-চাপা পড়ে মরবার ভয় নেই। সকালে পূর্বরাত্রির অত বড় দুর্যোগের চিহ্নমাত্র কোথাও নেই। পরিষ্কার আকাশ। রোদে চারিদিক হাসছে।

৮ই আষাঢ় শুক্রবার শুভ প্রভাতে গার্বিয়াং-এর দিকে পা বাড়ালাম। প্রায় আট মাইল এগিয়ে বুধীতে আহারাদি। পরে আরও পাঁচ মাইল অতিক্রম করে সন্ধ্যার পূর্বে গার্বিয়াং-এ পৌঁছবার আশা। মালপার পরেই প্রথম দু মাইল খাড়া চড়াই। প্রায় হাজার ফুট উঠতে হল। পর্বতের চেহারা ক্রমে বদলে যাচ্ছে। আর সেই শ্যামল-বনানীশোভিত পর্বত দেখতে পাচ্ছি নে। পর্বতগাত্রে প্রস্তরের আস্তরণ। এখন চড়াই-উৎরাই-মিশান পথ। আরও এগুতেই একটি সওয়ারী-ঘোড়া-সমেত জনৈক তিব্বতীকে আসতে দেখে বুঝতে পারা গেল যে আমাদের কৈলাস-গাইড্ কীচথাম্পা। ক্রমে লোকটি এগিয়ে এসে অভিনন্দন করে হাসিমুখে আত্মপরিচয় দিতেই আমরা আনন্দে কৈলাসপতির জয়ধ্বনিতে পর্বত মুখরিত করে তুললাম। খেলা থেকে গাইড্‌কে খবর পাঠিয়েছিলাম। অরুণ বাবুর জন্য ঘোড়ার বিশেষ দরকার হয়ে পড়েছিল। কীচথাম্পার সঙ্গে দেখা হবার পর হতেই আমরা পথের সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হয়েছিলাম। বেশ তেজস্বী তিব্বতী ঘোড়া। অরুণ বাবু চেপে বসলেন। চড়াই শুরু হল। দু মাইলের চড়াই, বুধী পর্যন্ত।

মধ্যাহ্নে বুধী গ্রামে স্থানীয় স্কুলে খানিক ক্ষণের জন্য বিশ্রাম নিয়েছি। গ্রামটি বড় ও শ্রীসম্পন্ন। চারিদিকে প্রচুর চাষের জমি। একটি ধর্মশালাও আছে। সামনেই নেপাল-গিরিশ্রেণীর রৌদ্রোজ্জ্বল হিমবাহের রোমাঞ্চকর শোভা। বুধীর উচ্চতা ৮,৫০০ ফুট। এ অঞ্চলে ঠাণ্ডার দরুন গম ও ধান বিশেষ জন্মায় না; যবও সামান্য; ভুট্টা, মান্দরা, মুণ্ডুয়া, গাঁদ, ভট্ প্রভৃতি প্রচুর হয়। শীতের সময় সকলেই নেমে যায়, তখন চলে নেপালের সঙ্গে এদের হাজার হাজার টাকার ব্যবসায়।

আকাশ ক্রমে মেঘমলিন হয়ে এসেছে। বৃষ্টির আশঙ্কা করে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়েছি। আড়াই মাইল একটানা চড়াই—দু হাজার ফুটের বেশী

উঠেছে। দেয়ালের মতন খাড়া! প্রায় এগার হাজার ফুটে উঠেছি। আকাশ ঘনমেঘময়। গুরুগম্ভীর মেঘ-গর্জন। তীব্র ঝড়। উন্মত্ত দানব যেন ছুটে চলেছে! কী দারুণ ঠাণ্ডা! এখন সবেগে নেমে চলেছি উৎরাই-পথে। চারদিক অন্ধকার। খুব কাছের জিনিসও দেখা যায় না। প্রস্তরবহুল উৎরাই-পথে হোঁচট্ খেয়ে গড়াতে গড়াতে চলেছি। আকাশ ভেঙ্গে বৃষ্টি নামল—বৃষ্টির ফোঁটাগুলি বরফের মতন ঠাণ্ডা। হিমকণামিশ্রিত ঝড় খুবই বিব্রত করে তুলেছে। ক্রমে চংপুচুর ধাবে এসে ভয়ার্তপ্রাণে খানিক দাঁড়িয়ে রইলাম।

চংপুচু একটি ক্ষুদ্র পার্বত্য নদী অদূরে মিশেছে কালীগঙ্গায়। বরফাবৃত নদীটি পেরিয়ে পরপারে এসেই দেখা গেল সামনেই একখানা খাড়া চড়াই ভ্রূকুটি করে দাঁড়িয়ে আছে। বৃষ্টির জল স্রোতাকারে বয়ে চলেছে পথের উপর দিয়ে। ক্রমে মেঘ সরে গেল, বৃষ্টি থামল। আশে-পাশে ঘন দেওদারবন। নীচে কলনাদিনী কালী অবিরাম গতিতে ছুটে চলেছে। পথ জনমানবশূন্য। আমরা ঘোড়া সহ চারটি মাত্র প্রাণী প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে সংগ্রাম করতে করতে নিঃশব্দে চলেছি।

বেলা আন্দাজ চারটার সময় টিপ্ টিপ্ বৃষ্টির মধ্যে ঘর্মাক্ত-কলেবরে যখন গার্বিয়াং-এর উপকণ্ঠে এসে হাজির হলাম, তখন নিজের অজ্ঞাতসারেই প্রাণের ভেতর হতে একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস বেরিয়ে এল। মনে হল—এত দুর্গম পাহাড় পর্বত উল্লঙ্ঘন করে, এত বাধা-বিপত্তি, দুঃখকষ্ট ও নৈরাশ্যের ঘনান্ধকার কাটিয়ে যখন গার্বিয়াং-এ এসে পৌঁছেছি, তখন দীর্ঘকালের ধ্যানের বস্তু 'কৈলাস'-দর্শন বোধ হয় সম্ভব হবে। দেবতা প্রসন্ন। চকিতে মুছে গেল শরীর ও মনের সকল গ্লানি, অবসাদ। আর কোন পরমদেবতার দিব্য অঙ্গুলিস্পর্শে যেন প্রাণের সকল নীরব তন্ত্রীগুলি একসঙ্গে অব্যক্ত আনন্দে ঝঙ্কৃত হয়ে উঠল।

এতক্ষণে চড়াইর সর্বোচ্চ শিখরে উঠেছি। স্থানের উচ্চতা প্রায় এগার হাজার ফুট। চারিদিকের অসমান পর্বতগুলি যেন আমাদের নীচে দাঁড়িয়ে। বৃষ্টি থেমে গেছে। মাথার উপরে ও নীচে তখনও কিছু ঘন মেঘ খেলা করে বেড়াচ্ছিল। আমরা এখন মেঘমালার অনেক উপরে উঠেছি। নীচের পার্বত্য প্রদেশ ঘনমেঘাবৃত, কিন্তু আমাদের চারদিক হেসে উঠেছে মেঘনির্মুক্ত সূর্যকিরণে।

সামনেই ঘনবনশোভা-পরিবৃত এক বিস্তীর্ণ প্রান্তর। এত উঁচু পর্বতের উপর অত বড় ময়দানটি দেখে অবাক্ হয়ে গেলাম। চারদিকেই সবুজের মেলা। শ্যামল তৃণাচ্ছাদিত প্রান্তরে নানা বর্ণের রাশি রাশি মরসুমী ফুলের সমারোহ দেখে আনন্দে প্রাণ নেচে ওঠে। কী স্নিগ্ধ, কী কমনীয়! এ যে ফুলের রাজ্য! যতদুর দৃষ্টি যাচ্ছে কেবলই পুষ্পসম্ভার। প্রকৃতিদেবী পরমদেবতার পূজার জন্য যেন বিরাট এক ফুলের ডালি সযত্নে সাজিয়ে রেখেছেন। যাঁর ইঙ্গিতে এমন সৌন্দর্যের সৃষ্টি, সেই চিরসুন্দরের পায়ে মাথা লুটিয়ে পড়ল।

প্রান্তরের পাশে পাশে চরে বেড়াচ্ছিল ছাগল, ভেড়া, ঘোড়া, জব্বু প্রভৃতি গৃহপালিত পশুগণ। এক কোণে একটি ক্ষুদ্র মন্দির। মন্দিরটি পরিত্যক্ত, অথবা ভুটিয়ামুলুকে সব মন্দিরের অবস্থাই এই রকম। কোন দেববিগ্রহ নেই। চারপাশে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে আছে জানোয়ারের মাথার খুলি ও শিং। রাখালবালকরা পয়সার আশায় মন্দিরের সামনে ঝুলানো ঘণ্টাটি ঢং ঢং করে বাজাচ্ছিল। তাদের হাতে কিছু পয়সা দিতেই তারা মহা খুশী হয়ে চলে গেল।

প্রান্তরের শেষপ্রান্ত হতে গার্বিয়াং গ্রামটি দেখাচ্ছিল অতি সুন্দর। দুদিক বেষ্টন করে এক বিরাট পর্বত মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে।

তারই পাদমূলে প্রশস্ত মালভূমির উপর গার্বিয়াং। গ্রামের প্রবেশপথের দুপাশে ভুটিয়া পুরুষ ও রমণীগণ চাষ-আবাদের কাজে ব্যস্ত। কর্দম ও আবর্জনাপূর্ণ পথে গ্রামের ভিতব দিয়ে এগিয়ে চলেছি ডাকবাংলোর দিকে। পূর্বেই শুনেছিলাম যে গার্বিয়াংও অন্যান্য ভুটিয়া-গ্রামের মতনই অপরিচ্ছন্ন। কৈলাস-যাত্রিদল ইতঃপূর্বেই ডাকবাংলো দখল করেছে দেখে আমরা বাংলোর প্রাচীরঘেরা প্রশস্ত প্রাঙ্গণে তাঁবু খাটিয়ে থাকার আয়োজন করলাম।

খানিক পরেই এসে গেলেন সহযাত্রীরা। বিশ্রাম করে চা খাবার সময় শোনা গেল যে, বুধীর চড়াইর মাঝামাঝি উঠেই তারা প্রসন্ন বাবু মাথাঘুরে অবসন্ন হয়ে বসে পড়েছিলেন। ডাঃ দে এবং স্বামী দুর্গাত্মানন্দ বার কতক ভীষণ পতনের হাত থেকে অল্পের জন্য বেঁচে গেছেন। বায়ুর চাপের স্বল্পতার দরুন সকলেরই বিশেষ শ্বাসকষ্ট হয়েছিল। ডাঃ দের সঙ্গেই ঔষধ ছিল, তাতে খুব কাজ দিয়েছে।

গত পনর-ষোল দিনে আমরা ১৭৬ মাইল অতিক্রম করে প্রায় এগার হাজার ফুট উচ্চে হিমালয়ের শেষপ্রান্তে হাজির হয়েছি। বুধীর চড়াই করতে বিশেষ করে স্থানের উচ্চতার দরুন সকলেই বিশেষ ক ; হয়ে পড়েছিল। এ দুস্তর দুর্গম পথে মানুষ নিজেকে এতই অসহায় ও দুর্বল মনে করে যে, নিজের অজ্ঞাতসারেও শ্রীভগবানের চরণে আত্মনিবেদন করতে বাধ্য হয়।

গার্বিয়াং পর্যন্ত তো দেবতার আশীর্বাদে আসা সম্ভব হয়েছে। মহাসংকটাপন্ন দুঃখকষ্টভোগ হয়েছেও অনেক। এ কষ্টকে বরণ করে নিয়েই বেরিয়েছি দীর্ঘ পথযাত্রায়। একমাত্র আশা, দারুণ দুঃখের দীপশিখায় দেবদেবের চরণদর্শন করে নিজ ক্ষুদ্রত্বকে মহৎ করে নিব চিরতরে।

তাইতো চলেছি বেদনাভরা ক্ষুদ্র প্রাণটিতে আশার ক্ষীণ প্রদীপ জ্বেলে কোটি কোটি নরনারীর যুগ-যুগান্তরের ধ্যানের বস্তু, সেই বিরাট পুরুষের চরণতলে। তাঁর একটু কৃপাকণা পেলেই যে নিজ অপূর্ণতা চিরতরে পূর্ণ হয়ে যায়! প্রাণের সব আশাই কি মেটে? প্রাণমন ভরে উঠল একটি প্রার্থনাসঙ্গীতে—

"হৃদয় চাতক মোর চায় তোমারি পানে শান্তিদাতা,
শান্তি-পীযূষ-বারি হে বরিষ বরিষ।
নয়নের তুমি তারা, প্রেমচন্দ্র-হৃদাকাশে শোকতাপসন্তাপহা
তুমি মাত্র আশা সদা সুখে দুঃখে।...

দারুণ শীতে খুবই জড়সড় করে ফেলেছে। তাঁবুর বাইরে যাবার আর সামর্থ্য নেই। কৈলাসপথে এই প্রথম তাঁবুতে বাস। যাত্রা শেষ করে গার্বিয়াং-এ ফিরে আসা পর্যন্ত এই পটাবাসেই রাত কাটাতে হবে।

গার্বিয়াং-এর পোষ্টমাষ্টার চিঠিপত্রাদি নিয়ে হাজির হলেন। স্বজন ও বন্ধুদের কুশলবার্তা পাবার জন্য সহযাত্রীরা খুবই উদ্‌গ্রীব। পোষ্টমাষ্টার আসাতে তাঁর কাছে আমাদের টাকাকড়ি সব রেখে যাওয়ার ব্যবস্থা করা হল। তিব্বতে টাকা সঙ্গে নিয়ে যাওয়া বড়ই বিপজ্জনক। তা ছাড়া ভারতীয় মুদ্রার, বিশেষ করে নোটের প্রচলন ওখানে আদৌ নেই। তিব্বত ভারতবহির্ভূত স্বাধীন দেশ। মুদ্রাদি সব স্বতন্ত্র। উহাকে টঙ্কা বলে। দেখতে কতকটা আমাদের আধুলির মতন গোল কিন্তু অনেক পাতলা। ঐ টঙ্কার দু-পিঠেই তিব্বতী ভাষায় কি সব লেখা আছে। সাধারণতঃ আমাদের এক টাকার বিনিময়ে আটটি টঙ্কা পাওয়া যায়। টঙ্কা, অর্ধটঙ্কা, সিকি-টঙ্কারও প্রচলন আছে। তাকলাকোট বা তিব্বতের অন্যান্য 'মণ্ডি'তে ভুটিয়া-ব্যবসায়ীর নিকট টাকার বিনিময়ে টঙ্কা পাওয়া

যায়। আমরা দেবসেবা, মন্দিরে প্রণামী, সাধু ও দরিদ্রনারায়ণ-সেবার জন্য তাকলাকোট হতে পঁচিশ টাকার তিব্বতী মুদ্রা সঙ্গে নিয়েছিলাম।

আমাদের তাঁবু পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই ডাক্তার-স্বামীরা এসেছেন, এ সংবাদ গ্রামে ছড়িয়ে পড়ল। অনেকেই রোগী নিয়ে এসে তাঁবু ঘিরে ফেলেছে। এ পার্বত্য অঞ্চলে কোন ডাক্তার বা চিকিৎসালয় নেই। কত লোক যে চিকিৎসার অভাবে ভুগে ভুগে অকালে প্রাণ হারায়, তার ইয়ত্তা হয় না। রোগী দেখতে পেয়ে ডাঃ দে নিজ-ক্লান্তি ভুলে যত্নে সকলকে ঔষধ দিতে লাগলেন। তিব্বতে যাতায়াতের সারাটি পথে শত শত রোগীর মধ্যে ঔষধবিতরণ দ্বারা আমাদের ক্যাম্পটি ভ্রাম্যমান চিকিৎসালয়ের কাজ করেছিল। ডাঃ দের নিঃস্বার্থ সেবাপরায়ণতা বাস্তবিকই প্রশংসনীয়। তাঁর মতন সেবাপরায়ণ চিকিৎসক বিরল।

রাত্রেই ঠিক করতে হবে আমাদের যাত্রার প্রোগ্রাম। রান্নার কোন বাহুল্য ছিল না—রুটি আর চাউলিয়া শাক-ভাজা। অনেক দিন পরে একটু শাকভাজা পেয়ে সকলেই খুব তৃপ্তির সঙ্গে রুটি খেলেন। সব চাইতে বেশী স্বস্তি যে, কাল আর হাটতে হবে না। তাড়াতাড়ি আহারাদি সেরে গাইডকে নিয়ে পরামর্শ শুরু হল। পূর্ব হ'তেই আমাদের ইচ্ছা ছিল যে, কৈলাস ও মানস-সরোবর ছাড়াও পশ্চিম তিব্বতে খচরনাথ প্রভৃতি তীর্থস্থান এবং পথে যত বেশী সম্ভব বৌদ্ধ লামাদের মঠ ও মন্দিরাদি দেখব। কীচথাম্পা একজন পাকা গাইড। গত ত্রিশ বৎসর যাবৎ যাত্রী নিয়ে সে প্রায় পঞ্চাশ বার পশ্চিম তিব্বতের তীর্থস্থানাদি ঘুরে এসেছে। অল্প আলোচনায় ঠিক হল যে, তাকলাকোট হ'তে প্রথম খচরনাথ দর্শন করে বরাবর তীর্থাপুরী, পরে কৈলাস-পরিক্রমা এবং দর্শনানন্তর সম্ভব হলে মানসসরোবর-পরিক্রমা—নইলে মানসে স্নান সেরে গার্বিয়াং-এ ফিরে

আসতে লেগে যাবে বাইশ থেকে ছাব্বিশ দিন। সকলের জন্ম তিব্বত-ভ্রমণের প্রয়োজনীয় আহার্য, তাঁবু, কম্বল প্রভৃতি দ্রব্যসম্ভার এবং সওয়ারী ও বোঝাবাহী ঘোড়া, সব কিছুই ব্যবস্থা করে বেরুতে হবে গার্বিয়াং হতে।

কাঁচথাম্পার উপর সব বন্দোবস্ত তাড়াতাড়ি করার ভার দিয়ে সে রাত্রির মতন সভা ভঙ্গ করে সকলেই তাঁবুতে আশ্রয় নিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় শ্বাস-কষ্টের দরুন অনেককেই সে রাত্রি বিনিদ্র অবস্থায় কাটাতে হল। সে এক বিচিত্র অনুভূতি। সু-উচ্চ ভূমিতে বায়ুর চাপ হ্রাস পায়—একথা পুঁথিতেই পড়া ছিল, সম্যক উপলব্ধি হল গার্বিয়াং-এ এসে। সকলেই বিছানায় বসে নানাপ্রকার আসনমুদ্রায় ব্যাপৃত। দীর্ঘশ্বাসের ছড়াছড়ি—কে কতটা পূরক, কুম্ভক ও রেচকের কসরৎ দেখাতে পারেন, তার-ই প্রতিযোগিতা চলেছে। এক অদ্ভুত বেদনাদায়ক আনন্দ। অগত্যা ডাক্তার দে ঔষধ দিয়ে সকলের কষ্টের লাঘব করেন। স্বামী দুর্গাত্মানন্দের তো মহা দুশ্চিন্তা—গার্বিয়াং-এ যখন এই অবস্থা, তখন খাস তিব্বতে বিশেষ করে কৈলাস-পরিক্রমার সময় ১৮,৬০০ ফুটে—দোল-মালাতে না জানি কি হবে! ডাঃ দে অবশ্য আশ্বাস দিয়ে বলেছিলেন যে, চব্বিশ ঘণ্টা নেহাৎ আট-চল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে আবহাওয়ার সঙ্গে অনেকটা খাপ খেয়ে যাবে। শরীরের রক্তকণিকা ও ফুস্‌ফুস্‌ ক্রমে এর ব্যবস্থা করে নেয়।

পরদিন বিশ্রাম। বিশ্রাম! ভাবতেই মনটা যেন জুড়িয়ে গেল। সকাল বেলা আমাকে উঠতে দেখে তারাপ্রসন্ন বাবু বলছেন—"উঠলেন যে? এখনই বেরুতে হবে নাকি? তা বলেন তো চট্‌করে বিছানাটা বেঁধে ফেলি।" গত কয় দিন যাবৎ শেষরাত্রে কাউকে ঘুমুতে দেই নি, তাড়া-হুড়ো করে সকলকে অতিষ্ঠ করে তুলেছি। আজকার দিনটা সকলেই

মৌজ করে উপভোগ করতে লাগলেন। বিছানা ছেড়ে কেউ আর উঠতে চান না—কেবল এপাশ আর ওপাশ। আমরা বিশ্রামের কাঙ্গাল হয়ে পড়েছি। জীবনে এমনটি-ই হয়। যা পাইনে তার-ই জন্য সারাটা সত্তা যেন বুভুক্ষু হয়ে উঠে। একই জিনিস, যখন পাই নে তখনি বোধ করি সব চাইতে তার বেশী প্রয়োজন। সুখ-দুঃখের অনুভূতিটাও ঐ পাওয়া-না-পাওয়ার উপরেই করে নির্ভর। প্রাণের ক্ষুধা একই জিনিসকে কখনও করে তুলে মিষ্ট, আবার তৃষ্ণা মিটে গেল তো ঐ জিনিসেই আসে বিতৃষ্ণা।

একটু বেলা হলে ডাকবাংলোর যাত্রিদলের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করে জানা গেল যে, তাঁদের রওনা হবার তেমন তাড়া নেই। পাঁজি দেখে ঠিক করেছেন, সাত দিন পরে এক শুভদিনে রওনা হবেন। আমাদের সংকল্প কিন্তু 'শুভস্য শীঘ্রম্'। এ যাত্রিদলটিও বেশ বড়। আটজন লোক—উত্তর-প্রদেশের অবসরপ্রাপ্ত ইঞ্জিনিয়ার, তাঁর বন্ধু জনৈক বাঙ্গালী, অবসরপ্রাপ্ত রাজকর্মচারী, তিনজন সাধু ও দুজন চাকর। ইঞ্জিনিয়ারই দলের প্রধান। তিনি পাঁজি না দেখে একপাও নড়েন না অথচ এমনই বিধির বিড়ম্বনা, আলমোড়া হতে বেরিয়ে গার্বিয়াং পর্যন্ত প্রায় প্রতিপদেই অনেক বিপদের মুখে তাঁদের পড়তে হয়েছে। সেজন্য তিনি আরও বেশী নির্ভরশীল হয়ে পড়েছেন পঞ্জিকার উপর। আমরা কিন্তু পাঁজি ছেড়ে শ্রীভগবানের উপরই নির্ভর করে চলেছি। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলতেন—'দুর্গা দুর্গা বলে যে পথে চলে যায়। শূলহস্তে শূলপাণি রক্ষা করেন তায়॥' 'দুর্গা দুর্গা' বলে আমরা বেরিয়েছিলাম। এযাবৎ শূলপাণি আমাদের রক্ষা করেছেন। বিশ্বাস—শেষরক্ষাও তিনি করবেন। অবশ্য দুরতিক্রম্য এ পার্বত্য পথের অসুবিধা ও দুঃখকষ্টের হাত থেকে সম্পূর্ণ নিষ্কৃতি পাওয়া অসম্ভব।

কীচথাম্পার কাছে খবর পাওয়া গেল—আমাদের জন্য ঘোড়া ও খচ্চর আনবার জন্য লোক পাঠান হয়েছে। হিমালয়ে সাধারণতঃ আট-নয়-দশ হাজার ফুটের উপরে বড় বাঘ বিশেষ একটা থাকে না। বাঘেডা নামক এক রকম ছোট বাঘ তের-চৌদ্দ হাজার ফুট উপরেও দেখতে পাওয়া যায়। বাঘেড়া ছাগল ভেড়া বা ছোট হরিণ ছাড়া বড় জানোয়ার মারতে পারে না। কিন্তু বন্য কুকুরের দল যা আছে, তাদের হাত থেকে বড় জানোয়ারেরও বাঁচা অসম্ভব। গার্বিয়াং-এর নিকটে কস্তুরী-মৃগ পাওয়া যায়। দেখতে ছোট হরিণের মতন। হরিণগুলির নাভিতে কস্তুরী জন্মায়। ভুটিয়ারা দলবদ্ধ হয়ে বন্দুক নিয়ে কস্তুরী-মৃগ শিকার করতে যায়। কোন কোন মৃগের নাভিতে তিন তোলা পর্যন্ত কস্তুরী নাকি পাওয়া যায়।

বিকালবেলা আমরা তিন জন এদিক সেদিক একটু বেড়িয়ে বেড়াচ্ছি। তখন অপরাহ্ণ চলেছে সন্ধ্যার দিকে। হাস্যোজ্জ্বল নীল আকাশতলে তুষার-কিরীট ও শ্যাম-অরণ্যময় পর্বতমালা। তারই নিম্নে গ্রামের পার্শ্বেই খরস্রোতা নদী। পতনোন্মুখ সূর্যের রক্তরশ্মি চারিপার্শ্বের উচ্চ পর্বতশিখরে প্রতিফলিত হয়ে মনোরম শোভা রচনা করেছিল—যেন দিনমণির শেষ আশিসরূপ রক্ততিলক ললাটে ধারণ করে পর্বতমালা সগর্বে দাঁড়িয়ে আছে। অনতিদূরে এক পর্বতের শ্যামশোভার ভিতর হতে গলিত বরফের ন্যায় নেমে আসছিল সারিবদ্ধ শত শত শ্বেত ভেড়াবক্রীর দল। এত খাড়া পর্বত যে, মাথা পেছনের দিকে হেলিয়ে উপরের দিকে তাকাতে হয়। কিন্তু আশ্চর্য! একটি পশুও পা পিছলে পড়ে যাচ্ছিল না। পিঠের উপর প্রকাণ্ড কাঠের বোঝা নিয়ে বন-প্রত্যাগত ভুটিয়া রমণীগণের মিছিলটিও দেখাচ্ছিল চমৎকার! স্ত্রীলোকদের পোশাকের বৈশিষ্ট্য আছে—নিজেদের

হাতের তৈরী নানা রং-এর পশমের ঘাগরা পরা, গায়ে পশমের জামা, মাথায়ও পশমের রঙ্গিন বড় চাদর, হাতে কানে নাকে গলায় সোনারূপার নানা রকমের গহনা।

ক্রমে মৌনসন্ধ্যা উত্তীর্ণ হল। তার সঙ্গে নেমে এল অপরূপ জ্যোৎস্না। গার্বিয়াং-এ বসে আজ বিশেষকরে আমাদের যাত্রা-প্রারম্ভ হতে গত কয়েক দিনের স্মৃতিগুলি মানসপটে পর পর ভেসে আসছে ছায়াচিত্রের মতন। তাতে আছে কত বন-উপবন, গিরিশৃঙ্গ, পর্বতগহ্বর; কত বাদল ও রৌদ্রময় দিন; কত নদীর কলধ্বনি; আর ভাষাহীন পাখীর কাকলি; মেঠো সুরে রাখাল-বালকদের অবোধ্য গান; কত স্নিগ্ধ উষার কিরণধারা; সান্ধ্য আকাশের স্বর্ণ আলোক; কত শুব্ধ নির্জন বনানী, কর্ম্ম-কোলাহলময় জনপদ, বনফুলের সুমিষ্টগন্ধ-ভারাক্রান্ত মৃদু বাতাসের স্পর্শ; কত হিমজর্জর তীব্র ঝড়ের কশাঘাত; কত স্নেহময় দয়া-দাক্ষিণ্য ও কর্কশ অবহেলা! সবই এখন অতীতের মধুর স্মৃতি।

আজও আমাদের বিশ্রামের দিন। অন্য সব আয়োজন যদিও সম্পূর্ণ কিন্তু ঘোড়া খচ্চর এসে পৌঁছে নি। অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় নেই। আমাদের সকলেরই বিশ্রাম কিন্তু সেই নীরব সেবক ডাঃ দের সেবাকার্য পুরোপুরি চলেছে। ডাকবাংলোর যাত্রিদলের প্রায় সকলেই অসুস্থ। কাল আরও তিনদল যাত্রী গ্রামের ভিতর ধর্ম্মশালায় আশ্রয় নিয়েছে। তার মধ্যে একজনের নিমোনিয়া, আর একজন ভুগছে রক্ত-আমাশায়! সর্দি, জ্বর, গা-ব্যথা—এসব ছোটখাট অসুখ এপথে গ্রাহ্যের মধ্যেই নয়। গার্বিয়াং গ্রামের অনেকেও রোগী নিয়ে আমাদের তাঁবুর চারিদিকে ভিড় জমিয়েছে।

বিকালবেলা গ্রামের প্রধান কল্যাণ সিং-এর বাড়ীতে নিমন্ত্রণ।

বাড়ীগুলির আশপাশ ও বাইরের চেহারা যতই কুৎসিত হোক না কেন— ভিতরটি কিন্তু বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। দোতলার উপর সুন্দর গালিচা-পাতা ঘরে আমাদের বসিয়েছে। আসবাবপত্রের পারিপাট্যে চমৎকৃত হতে হয়। প্রধান প্রায় একশত ঘোড়া-জব্বু ও পাঁচশত ভেড়া-ছাগলের মালিক। প্রতি বৎসর তিব্বত ও নেপালের সঙ্গে অনেক হাজার টাকার কারবার চালাচ্ছে। ঘোড়া-জব্বু ও ভেড়া-বকরীই ভুটিয়াদের সব চাইতে বড় সম্পদ এবং পণ্যের একমাত্র বাহন। এহ ভারবাহী পশুগুলির সাহায্যে তারা বরফ-আচ্ছাদিত, পথহীন, দুর্গম, গিরিপর্বত উল্লঙ্ঘন করে চালায় তাদের ব্যবসায়। একটি ঘোড়া দেড়-দু মণ, আর প্রতি ভেড়া ও বক্‌রী পনর-বিশ সের বোঝা নিয়ে সতর-আঠার হাজার ফুট উচ্চ পর্বতমালা উল্লঙ্ঘন করে চলে যায়।

খানিক কথাবার্তার পরেই আমাদের জন্য এল জাফরান-দেওয়া ঘন দুধ, আর বাদাম পেস্তা কিস্‌মিস প্রভৃতি মেওয়া। এ পর্ব শেষ হবার পরে কল্যাণ সিং তার পীড়িতা স্ত্রীসহ এল আশীর্বাদ নিয়ে রোগ সারাবার জন্য। সাধু-সন্ন্যাসীর প্রতি তাদের ভক্তি অগাধ। ডাঃ দে পরীক্ষাদি করে ঔষধের ব্যবস্থা ও পথ্যাদির প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিলেন। ফেরবার পথে খোঁজ নিয়ে জানা গেল যে, ঐ ঔষধ ও পথ্যাদিতে কল্যাণ সিং-এর স্ত্রীর বহুদিনের শূলবেদনা আরাম হয়ে গিয়েছে।

এ গ্রামে দু'শতের অধিক ভুটিয়া পরিবারের বাস। ভুটিয়ারা হিন্দু কিন্তু তারা বেশীরভাগ ভূতপ্রেতেরই উপাসক। অন্য পূজা-অর্চনা বিশেষ কিছু জানে না। এরা সকলেই শিবজীর ভক্ত। কাশীতে গিয়ে ৺বাবা বিশ্বনাথকে দর্শন করা জীবনের এক মহা সৌভাগ্য ও পুণ্যক্ষণ মনে করে। এদের মধ্যে বর্ণবিভাগ বা আহারাদির কোন বাঁধাবাধি নিয়ম-কানুনের

বালাই নেই। স্ত্রী-স্বাধীনতা খুব বেশী। ভুটিয়ারা খুবই মাংসপ্রিয়। অবশ্য হিমালয়ের সকল পার্বত্য অধিবাসীরাই মাংস খেতে খুবই ভালবাসে—ক্ষত্রিয় প্রভৃতি সকলেই। শীতপ্রধান দেশে মাংস তাদের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয়। ভুটিয়া পুরুষদের পোশাক—গরম পা-জামা, গরম জামা-কোট, মাথায় টোপের মতন গরম টুপী। জুতাও সকলকেই ব্যবহার করতে হয়। বলিষ্ঠ সুগঠিত দেহ, চেপটা নাক, ছোট কোটরগত চোখ—মঙ্গোলিয়ানদের মতন। এদের ভাষা, আচার-পদ্ধতি, সামাজিক রীতিনীতি কুমায়ুনী (আলমোড়া, নৈনিতাল ও গাড়োয়াল—এই তিন জিলাকে কুমায়ুন বলা হয়) বা অন্য পর্বতবাসী হতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। ভুটিয়াদের ইতিবৃত্ত সম্বন্ধে সঠিক কিছুই জানা যায় না। কয়েক শতাব্দী পূর্বে কুমায়ুনের উত্তরাংশ ও পশ্চিম তিব্বতের কতক স্থান ভুটান রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল, পরে কুমায়ুনের উত্তরাংশ ভারত-সরকারের অধিকারে আসে। পশ্চিম তিব্বতে কৈলাসশ্রেণীর দক্ষিণাংশে টারচান এবং তাকলাকোটের নিকটবর্তী খোচরনাথ এখনও ভুটান-অধিকৃত। ভোটের রাজকর্মচারী (যাকে লাব্রাং বলা হয়) অল্পসংখ্যক রক্ষিসৈন্য সহ ঐ সকল স্থানের শাসন-কার্য পরিচালনা করেন। হতে পারে বর্তমান ভুটিয়াগণ ভুটানের আ .াসী, পরে এ অঞ্চলে উপনিবেশস্থাপন করেছে। অথবা ভোট-অধিকৃত স্থান ছিল বলে অন্যান্য পর্বতবাসী ঐ স্থানের অধিবাসীদের বলে থাকে ভুটিয়া। আলমোড়া জিলার অত্যুচ্চ উত্তরাংশে ব্যাস, চৌদাস, দরমা, জোহার, মানা প্রভৃতি ছয়-সাতটি পট্টিতে ভুটিয়াদের বাস। মোটসংখ্যা প্রায় ত্রিশ হাজার। ব্যবসায় সম্পর্কে সমতলদেশ-বাসী সংস্পর্শে আসার ফলে এদের মধ্যে সকল বিষয়েই দ্রুত পরিবর্তন এসে গিয়েছে। উচ্চশিক্ষিত ও মার্জিতরুচিসম্পন্ন ভুটিয়ার সংখ্যাও নিতান্ত কম নয়। স্ত্রী-স্বাধীনতা

খুব অথচ বাল্যবিবাহের প্রচলন না থাকায় মেয়েদের ভিতর অনেকেই উচ্চশিক্ষা পাবার জন্য সচেষ্ট।

আজও ঘোড়া এসে পৌঁছায় নি। সকলেই একটু চঞ্চল হয়ে উঠেছেন। দেখতে দেখতে তিনটি দিন গার্বিয়াং এ কেটে গেল। এ কয়দিনে আমাদের বিশ্রাম হয়েছিল খুবই এবং স্বামী দুর্গাত্মানন্দের সুনিপুণ তত্ত্বাবধানে আহারাদির এমন রুচিকর ব্যবস্থাদি হয়েছিল যে, সকলেই বেশ তাজা হয়ে উঠেছিলাম। নূতন উৎসাহ, অনুপ্রেরণা ও সহজ প্রাণধারা সকলকে উদ্বুদ্ধ করে তুলেছিল—আগামী যাত্রার জন্য।

১২ই আষাঢ়, মঙ্গলবার। ভোর-বেলাই কীচথাম্পা সুখবর নিয়ে হাজির। পূর্ব রাত্রে ঘোড়া এসে গেছে। সেদিনই রওনা হবার সম্বন্ধে সকলে একমত হলেন। 'সাজ সাজ' রব পড়ে গেল। আমাদের সমস্ত খাদ্যদ্রব্য, তাঁবু, রান্নার সরঞ্জাম, বিছানাপত্র, গাইড ও ছয়জন ঘোড়া-ওয়ালার আসবাবপত্র, ঘোড়াগুলির ছাব্বিশ দিনের উপযোগী দানা ইত্যাদি সব বয়ে নেবার ও আমাকে ছাড়া অন্য সহযাত্রীদের সওয়ারীর জন্য—সর্বসমেত সতেরটি ঘোড়ার ব্যবস্থা হল।

আজ যেতে হবে এগার মাইল পথ—কালাপানী। আহারাদি সেরে মালপত্র বোঝাই দিয়ে রওনা হয়েছি সাড়ে দশটায়। বিভিন্ন সাজে সজ্জিত সতেরটি ঘোড়া, সাতজন যাত্রী, গাইড, ঘোড়াওয়ালা, তাদের আত্মীয়বর্গ—সর্বসমেত প্রায় পঞ্চাশজন লোক একসঙ্গে শ্রেণীবদ্ধভাবে যাত্রা করেছি। মনে হচ্ছিল যেন একটি বিরাট শোভাযাত্রা দেবদেবের দর্শনোদ্দেশে বেরিয়েছে। যাত্রাপথের বিঘ্ন-অপসারণের জন্য গ্রামের উপকণ্ঠে প্রধান আমাদের মাথার উপর মন্ত্রপূত চাল ও গম অস্পষ্ট ধ্বনিতে ছড়াতে লাগল; একটু এগিয়েই আধ মাইল খাড়া উৎরাই কালী ও টিঙ্কর নদীর

সঙ্গম পর্যন্ত। সকলেই তখন হেঁটে চলেছি। ঐ খাড়া-উৎরাই পথে ঘোড়ায় চড়ে যাওয়া অসম্ভব। ঘোড়াগুলির সম্মিলিত গলঘণ্টাধ্বনি, আর কালী-টিঙ্করের মিলনোচ্ছ্বাস মধুর ঐক্যতানের সঙ্গীত সৃষ্টি করেছিল। কালীগঙ্গার উপরকার কাষ্ঠনির্মিত কম্পিত সেতু পার হবার পরেই প্রস্তর-সমাকীর্ণ বেলাভূমির উপর দিয়ে পথ কোথাও মিশে গেছে নদী-গর্ভে। দক্ষিণে ঘন দেবদারুবন। অপর তীরে অভ্রভেদী পর্বতমালা। সকলেই ঘোড়ায় চেপে বসলেন, কিন্তু ডাঃ দে কিছুতেই ঘোড়ায় যেতে রাজী হলেন না। তিনি চলেছেন আমার সঙ্গে হেঁটে। ডাঃ দে প্রথম হতেই ঘোড়ায় চড়ে যেতে অনিচ্ছুক। কারণ ইতঃপূর্বেই তিনি পদব্রজে পর্বত-আরোহণে অভ্যস্ত হয়েছিলেন। 'নন্দাদেবী-অভিযানে যেতে মনস্থ করে সুইডিস পর্বতারোহিদলের সঙ্গে তিনি কিছুদিন বিজ্ঞানসম্মত ভাবে পাহাড়চলা অভ্যাস করেছিলেন। শেষ পর্যন্ত অবশ্য তাঁর যাওয়া হয় নি। আমি তাঁকে বলেছিলাম—"তবু আপনার জন্য একটি ঘোড়া সঙ্গে সঙ্গে থাক্।" আমার বিশেষ অনুরোধে তিনি তাতে আপত্তি করেন নি।

ক্রমেই উপরের দিকে উঠছি। পথ সংকীর্ণতর হয়ে আসছে। পাশেই প্রখরসূর্যকিরণ-প্রতিফলিত নির্মল নীলপ্রবাহ ছুটে চলেছে অবিরাম গতিতে। নির্জন পথ। জলের একটানা কল্লোলে সে নীরবতা হয়েছে আরও গভীর। পথ ক্রমেই বেশী দুর্গম। ঘোড়সওয়ারিরা অতি সন্তর্পণে ঘোড়া চালিয়ে অগ্রসর হচ্ছেন। সকলেরই প্রাণে বিপুল আনন্দ—বুকে অদম্য উৎসাহ। নদীর স্রোতের মতন আমরা অপ্রতিহত গতিতে এগিয়ে চলেছি। অনির্বাণ আশা—কয়েক দিনের মধ্যেই বহুদিনের বাঞ্ছিত বস্তুর দর্শনলাভ করব।

আকাশ মেঘমলিন হয়ে এল। কুয়াসার মতন পাতলা মেঘে ছেয়ে গেছে চারিদিক। দূরের সব কিছুই অবলুপ্ত আমরা চলেছি কালীর

উৎপত্তিস্থান লিপুপাশের দিকে। দু'পার্শ্বেই অর্ধমৃত দেবদার বৃক্ষগুলি জটলা করে যেন বরফের অত্যাচারের প্রতিবাদ জানাচ্ছে—নীরবে। পথে জনপ্রাণী দেখতে পাচ্ছি নে। পাখীর কাকলীও নেই। আমাদের প্রকাণ্ড দলটি শান্ত-সুন্দর পার্বত্য প্রদেশের নিবিড় স্তব্ধতাকে মথিত করে এগিয়ে চলেছে। ক্রমে আকাশ প্রলয়ঙ্কর রূপ ধারণ করল। মেঘ গর্জে উঠল—আরম্ভ হল প্রবল বৃষ্টি। অপ্রশস্ত বন্ধুর পথে, নদীর ধারে ধারে শীতার্ত দেহের উপর বরফানি হাওয়ার তীব্র কশাঘাত মুখ বুঁজে সহ্য করে চলেছি।

ক্রমে বৃষ্টি থামল। কিন্তু বিপদের উপর বিপদ। আমাদের দলটি গিয়েছিল একটু এগিয়ে। আমি আর ডাঃ দে ক্রমেই পিছিয়ে পড়ছিলাম। একটি চড়াই শেষ করে সবেমাত্র অপেক্ষাকৃত সমতল স্থানে পৌঁছেছি। ডাঃ দে ক্ষীণস্বরে বললেন, "আর তো চলতে পাচ্ছি না। মাথাটা বড্ড ঘুরছে। আর কেমন জানি গা বমি বমি করছে।" বলতে বলতেই তিনি বসে পড়লেন। সঙ্গে থার্মসে চা ছিল। বললাম—"একটু গরম চা খান। বিশ্রাম নিলেই এ ভাবটা কেটে যাবে।" "না, চা-ও খেতে পারব না" বলেই তিনি মাথার টুপিটা খুলে একেবারে মরার মতন লম্বা হয়ে শুয়ে পড়লেন। ততক্ষণে তাঁর সর্বাঙ্গ ঘেমে গিয়ে টস্‌টস্‌ করে ঘাম পড়ছে, দেখতে দেখতে মুখচোখ একেবারে ফ্যাকাশে হয়ে হয়ে গেল। নাম ধরে ডাকছি—কোন সাড়া নেই। নাড়ি অত্যন্ত ক্ষীণ। প্রমাদ গণলাম। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে শ্রীভগবানকে স্মরণ করছি। ডাক্তারকে ফেলে দৌড়ে গিয়ে সঙ্গীদের খবর দেবারও উপায় নেই। এমন সময় যেন দৈব-দূতের ন্যায় দুজন ভুটিয়া এল বিপরীত দিক থেকে। তারা যাবে গার্বিয়াং ছাড়িয়ে—বুধী গ্রামে। তাদের কাছে জানা গেল যে, কীচখাম্পারা প্রায় আধ মাইলের বেশী এগিয়ে গিয়েছে। বেশী পুরস্কার দিতে স্বীকৃত হওয়ায়,

একজন ভুটিয়া দৌড়ে চলে গেল কীচথাম্পাকে ঘোড়া ও ঔষধ সমেত আনবার জন্য। প্রায় চল্লিশ মিনিট পরে ঔষধের বাক্স নিয়ে ঘোড়া হাঁকিয়ে কীচথাম্পা এসে হাজির। তার পেছনে পেছনে এলেন স্বামী দুর্গাত্মানন্দ। ডাঃ দেকে কিছু প্রতিষেধক ও উত্তেজক ঔষধ সেবন করাবার পরে ধীরে ধীরে তিনি সুস্থ বোধ করলেন। তাঁকে ঘোড়াতে চাপিয়ে কীচথাম্পা ধরে ধরে নিয়ে গেল। সন্ধ্যার কিছু পূর্বে 'কালাপানী'তে যখন এসেছি, ততক্ষণে ঘোড়াওয়ালারা কালীর ধারে একটু সমতল স্থানে তাঁবু খাটিয়ে ফেলেছে। ওখানে যদিও একটি ছোট ধর্মশালা আছে, কিন্তু তা ইতঃপূর্বেই ভুটিয়া ব্যবসায়ীরা দখল করেছিল। কালাপানীতে গাছপালা খুবই কম। জ্বালানি কাঠের একান্ত অভাব। সেজন্য ঐ দুর্জয় শীতেও একটু আগুন জ্বালিয়ে হাত-পা গরম করবার উপায় ছিল না। রান্নাদিও করতে হল ষ্টোভে।

ডাঃ দে ক্রমে সুস্থ হয়ে উঠলেন। সমস্ত কৈলাস-যাত্রাপথে এবং তিব্বত হতে ফিরে আলমোড়ায় পৌছান পর্যন্ত তিনি আর ঘোড়ায় চাপতে আপত্তি করেন নি। রাতটা বড়ই কষ্টে কাটল। একটু বেশী রাত্রে এমন মুষলধারে বৃষ্টি আরম্ভ হল যে, বাঁধ আর মানে না, তাঁবুর ভিতর জল ঢুকছে। কী দারুণ ঠাণ্ডা! তাঁবুর চারদিকে জল ঢুকে বিছানাপত্রও কতক ভিজে গিয়েছে।

ঘুম ভেঙ্গেছে। কিন্তু জড়তা ও অনিদ্রাজনিত ক্লান্তিতে আচ্ছন্ন শরীর। তবু এতটুকুই তৃপ্তি যে, সকালেই বেরুতে হবে না। এপাশ ওপাশ করে উঠে বসেছি। দেখা গেল গত রাত্রে এত বরফ পড়েছে যে, চারিপাশের উচ্চ পর্বতচূড়া নূতন বরফে ঢেকে গিয়েছে। অথচ আমাদের ঘোড়া ও খচ্চরগুলি ঐ তুষারাবৃত পর্বতে বেশ চরে বেড়াচ্ছিল। ক্রমে চারিদিক

হেসে উঠল রাঙা রোদে। আকাশ নীল পরিচ্ছন্ন। গত রাত্রির দারুণ দুর্যোগের চিহ্নমাত্র কোথাও নেই। তুষারময় পর্বতগাত্র ভেদ করে নেমে আসছে কালীনদীর ফেনিল ধারা; চারিদিকে স্তূপাকার বরফ নবারুণচ্ছটায় ঝিলমিল করছে। সকালে বেরুবার সামর্থ্য ছিল না।

আজকের পড়াউ আট মাইল। লিপুলেক পাসের ঠিক পাদমূলে—সিয়াংচুং পর্যন্ত। কালাপানীর উচ্চতা বার হাজার ফুট। আর সিয়াংচুং পনর হাজার। আট মাইল-এ তিন হাজার ফুট উঠতে হবে। আহারাদির পর তাজা রোদের মধ্যে দশটায় বেরিয়েছি। চলেছি কালীর তীরে তীরে। চারিদিকেই নয়নাভিরাম দৃশ্য। এ যেন স্বপ্নরাজ্য। দুর্জয় ঠাণ্ডাটি বাদ দিয়ে সব কিছুই উপভোগ করবার মতন। মাইল খানেক পরে একটি ক্ষুদ্র পার্বত্য নদী আমাদের গতিরোধ করে দিল। নদীর উপরে সেতুটি এমনই জীর্ণ ও পড়োপড়ো যে, তার উপর দিয়ে জানোয়ারগুলিকে পার করা অসম্ভব। নদীটি ছোট, কিন্তু গভীর ও খরস্রোতা। কীচথাম্পা তাড়াতাড়ি লোকজন নিয়ে সেতু-মেরামতে লেগে গেল। দুটি গাছের গুঁড়ি কেটে পারাপারে ফেলে দিল এবং পাথরের দেয়াল মেরামত করে সকলকে নিয়ে এল পরপারে। গত রাত্রির বৃষ্টিতে পথের অবস্থা বড়ই শোচনীয় হয়েছে। খানিক পরেই এল আর এক প্রতিবন্ধক। একটি ছোট পার্বত্য নদী—হেঁটেই পার হবার মতন কিন্তু গত রাত্রির বৃষ্টিতে নদীর ধার ধসে গিয়েছে—আর উপর থেকে স্রোতের সঙ্গে সজোরে গড়িয়ে আসছে পাথর। সেদিনের মতন ওখানেই অপেক্ষা করা ছাড়া গত্যন্তর ছিল না, কিন্তু ইঞ্জিনিয়ার তারাপ্রসন্ন বাবুর প্রত্যুৎপন্নবুদ্ধির তারিফ করতে হয়। তিনি গাইডের লোকজনকে অনেক উপর দিয়ে ঘুরে কুড়ুলসহ অন্য পারে পাঠিয়ে দিলেন। তারা দুদিক

থেকে ছোট ছোট গাছ কেটে স্রোতে ফেলতে লাগল। ঐ গাছের প্রতিবন্ধকে পাথরগুলি আর নীচে গড়িয়ে আসতে পারছিল না। আমরা ধীরে ধীরে হাঁটুজলে পার হয়ে এলাম।

যতই উপরে উঠছি, ততই হিমালয়ের দৃশ্য বদলে যাচ্ছে। পর্বতগুলি অনুর্বর, বৃক্ষলতাহীন ও ককশ। যদিও ইতঃপূর্বে যমুনোত্রী, উত্তরকাশী, গঙ্গোত্রী, গোমুখী, কেদারনাথ, বদরীনারায়ণ, শতপন্থ, স্বর্গারোহণ প্রভৃতি হিমালয়ের দুর্গম তীর্থস্থানগুলি পায়ে হেঁটেই দর্শন করে এসেছিলাম এবং কোথাও প্রায় ১৬,০০০ হাজার ফুট পর্যন্ত উঠতে হয়েছিল, কিন্তু সে-সকল স্থানের দৃশ্যের সঙ্গে হিমালয়ের এ অংশের সমোন্নতিরেখার দৃশ্য সম্পূর্ণ পৃথক। শতপন্থের পথে—চৌদ্দ-পনর হাজার ফুট উচ্চ স্থানেও প্রচুর ভূর্জপত্রের গাছ দেখতে পাওয়া যায়। আবার গোমুখীর দু মাইল দূরে ভূর্জপত্রের গাছ ছাড়াও বিপরীত দিকে প্রায় সতের হাজার ফুট উচ্চ পর্বতচূড়ায় খর্বাকৃতি দেবদার গাছ দেখেছি। অথচ এখানে চৌদ্দ হাজার ফুট বৃক্ষাদির চিহ্নও কোথাও নেই। অত্যধিক তুষারপাত এবং প্রস্তর-বহুলত্বই বোধ হয় তার কারণ।

একটি চড়াইর শেষে ভুটিয়াদের দেবোদ্দেশে নির্মিত এক প্রস্তর-স্তূপের কাছে দাঁড়িয়ে অবাক্ মুগ্ধনেত্রে পর্বতের নগ্ন সুমনোরম শোভা দেখছি। এমন সময় একখণ্ড সাদা হালকা মেঘ বায়ু চালিত হয়ে ক্রমে ঐ পর্বত-শিখরটি আচ্ছন্ন করে ফেলল। আর সঙ্গে সঙ্গে সূর্যকিরণে রাঙ্গা হয়ে উঠল সমগ্র পর্বতগাত্র—যেন তাপস গিরিবর গৈরিকে সর্বাঙ্গ আচ্ছাদিত করে স্মিতমুখে আমাদের শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করছেন।

কালাপানী হতে প্রায় ছয় মাইল এসেছি। কালীর ধারে এক বিস্তীর্ণ প্রান্তরে দেখা গেল—অনেকগুলি নূতন-ধরনের তাবু পড়েছে। গাইড

বললে—তিব্বতী খাম্পাদের (ব্যবসায়ীদের) ছাউনী। তারই পাশ দিয়ে আমাদের পথ। তাঁবুগুলির কাছে আসতেই শুনা গেল ভিতর হতে অস্ফুট গুঞ্জনধ্বনি মধুর সঙ্গীতের মতন ভেসে আসছে। প্রকাণ্ড তাঁবুর ভিতরে ও বাইরের বারান্দায় তিব্বতী স্ত্রী-পুরুষগণ সমবেত প্রার্থনায় রত। তাদের বেশভূষার বৈচিত্র্য এবং তাঁবুর ভিতরকার সাজসজ্জার পারিপাট্য লক্ষ্য করার মতন। ভিতরে গিয়ে তাদের পূজা ও প্রার্থনাদির পদ্ধতি দেখবার খুবই ইচ্ছা হচ্ছিল, কিন্তু গাইড নিষেধ করলে। সামনের প্রান্তরে চরে বেড়াচ্ছিল শত শত তিব্বতী ছাগল ও ভেড়া জব্বু। বাঘের মতন প্রকাণ্ড কুকুর নিয়ে রাখালরা পশুগুলিকে পাহারা দিচ্ছে। কুকুরগুলির হিংস্র চাহনির ভঙ্গীতে বুকের ভিতরটা কেঁপে উঠে। ছাগলগুলির চোখ হরিণের মতন বেশ টানা ও বড় বড়, গায়ে লম্বা লম্বা প্রচুর লোম—দেখতে ভারতের ছাগলের তুলনায় ছোট।

হাঁটুভাঙ্গা একটি চড়াইর শেষে মোড় ফিরে দেখা গেল, অনতিদূরে এক বিস্তীর্ণ উপত্যকা—ঐ 'সিয়াংচুং'। ইতঃপূর্বে অনেক তাঁবু পড়েছে, অসংখ্য ভেড়া ছাগল চরে বেড়াচ্ছে, অনেক লোকজন—যেন একটি ক্ষুদ্র জনপদ।

আমাদের তাঁবু পড়ল। তখনও অনেকটা বেলা আছে। উজ্জ্বল রোদে চারিদিক হাসছে। পাশেই একটি ক্ষুদ্র নদীর বরফগলা জলের কল্লোল। একটু দূরে, নীল আকাশের ঠিক যেন নীচেই বরফের পর্বত পতনোন্মুখ সূর্যকিরণে রঙ্গে উঠেছে। সামনে আমাদের দৃষ্টি অবরুদ্ধ করে, দূরে আকাশের সঙ্গে এক হয়ে, দুর্লঙ্ঘ্য আর একটি বরফের পর্বত দাঁড়িয়েছিল। সিয়াংচুংএ এসে বেশ বোঝা গেল যে—একটি বরফের রাজ্যে এসেছি। অদূরেই সেই ভীতিপ্রদ 'লিপুলেক' গিরিদ্বার—অগ্রগতি রুদ্ধ

করে সগর্বে দাঁড়িয়ে। দূরবীনের সাহায্যে গিরি-সংকটটি অনেকক্ষণ দেখলাম। দূর থেকে দুর্গমত্ব যে কোথায় তা কিছুই বোঝা গেল না। বরং ঐ পর্বতশিখরের শান্ত গাম্ভীর্য প্রাণে আনন্দের স্পন্দনই সৃষ্টি করছিল। এমন নিরাপদ স্থানটিতে যেতেই এত ভয়। অরুণ বাবু তো বলেই বসলেন— "চলুন, আজই লিপুপাস পেরিয়ে যাওয়া যাক। আড়াই মাইল বইতো নয়! বেলাও যথেষ্ট আছে। এত কাছে এসে নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকাটা কেমন অস্বস্তিকরই মনে হচ্ছে।" কিন্তু তা না করেও উপায় নেই। ঐ পাসটি অতিক্রম করা এমনই বিপজ্জনক ব্যাপার যে, অনেক সময় আধ ঘণ্টার মধ্যেই ওখানকার আবহাওয়া বদলে যায়—অতর্কিতভাবে বরফাক্রান্ত হয়ে ঐ গিরিদ্বারে অত্যন্ত বিপদগ্রস্ত হতে হয়। দ্বিপ্রহরের পরেই গিরিদ্বারে বিপদের আশঙ্কা বেশী। সেজন্য লিপু-উল্লঙ্ঘনকারীরা—এমন কি ভুটিয়া এবং তিব্বতীরাও—সিয়াংচুংএ আড্ডা গেড়ে লিপু-অতিক্রমের অনুকূল আবহাওয়া ও সময়ের জন্য অপেক্ষা করে বসে থাকে। সাধারণতঃ ভোরের দিকে বরফপড়ার ভয় কম। সেজন্য সকলেই সিয়াংচুং থেকে ভোরে রওনা হয় এবং লিপু অতিক্রম করে যথাসময় তিব্ব. : প্রবেশ করে। আমাদেরও কবতে হবে তা-ই।

সিয়াংচুং উপত্যকাটি বেশ প্রশস্ত। লোকালয় বা ধর্মশালা কিছুই নেই। অত্যুচ্চ বরফাচ্ছাদিত পর্বতমালা তিন দিক থেকে স্থানটিকে বেষ্টন করে রয়েছে। জ্যৈষ্ঠের শেষ হতে চার-পাঁচ মাস যাবৎ প্রতিদিন বিকেলে শত শত গৃহপালিত পশু নিয়ে বহু লোক এখানে সমবেত হয়; অস্থায়ী তাঁবু খাটিয়ে একটি রাত্রির মতন বাস করে, তখন দূর হতে মনে হয় যেন একটি প্রকাণ্ড জনবহুল স্থান।

ভীষণ ঠাণ্ডা রাত্রি। যেন হিম-গর্ভের মধ্যে বাস করছি। শ্বাসকষ্টও

সকলকে বিশেষ পীড়া দিচ্ছিল। রাত সাড়ে-তিনটার পরেই ভোরের অভিযানের জন্ম সকলেই তৈরী হতে লাগল। খুব তাড়াতাড়ি করেও সাড়ে-চারটার পূর্বে বের হওয়া সম্ভব হল না। তখনও খুব অন্ধকার, আকাশের অবস্থাও ভীতিপ্রদ। কিন্তু তারই মধ্যে ঐ প্রকাণ্ড উপত্যকাটি শূন্য করে সকলেই বেরিয়ে পড়েছে। প্রথমেই প্রস্তরবহুল চড়াই পথ। শরীর ঠাণ্ডায় আড়ষ্ট। ইচ্ছামত হাত-পা চালাবার উপায় নেই—সবই অবশ হয়ে গেছে। পা চলেছে নিজের খেয়ালমত। পাথরে ঠুকছি, হুমড়ি খাচ্ছি, গর্তে পড়ছি, পাথরের ফাঁকে পা আটকে যাচ্ছে—আবার চলছি। যেতেই হবে। আমাদের অশ্বারোহীরা আপাদমস্তক গরম পোশাকে আবৃত হয়ে গরম-দস্তানা-পরা হাতে কোনরকমে লাগাম ধরে বসে আছেন ঘোড়ার পিঠে।

এবার চলেছি বরফের রাজ্যের ভিতর দিয়ে। নীচে বরফ—চারিপাশেও বরফাচ্ছাদিত পর্বত। কোথাও ঐ বরফ এত নরম যে, পায়ের অনেকটা ঢুকে যাচ্ছে বরফের মধ্যে। প্রতিপদে পা টেনে তুলে আবার পা ফেলা! প্রাণান্তকর ব্যাপার। বায়ুচাপের স্বল্পতার দরুণ ভীষণ শ্বাসকষ্ট। হীনবল হয়ে পড়েছি। ক্রমে প্রভাত হয়ে এল, কিন্তু সূর্যালোকহীন প্রভাত। আলো ও অন্ধকারের কোমল মিশ্রণ। চারিদিক উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। কিন্তু এ ঔজ্জ্বল্য সূর্যের আলোকের নয়—এ শুভ্র বরফের আলো। আকাশের অবস্থা ক্রমেই ভীতিপ্রদ হয়ে এল। একটা বিকট নিস্তব্ধতা সমস্ত পার্বত্য প্রদেশকে ঘিরে রয়েছে। এ মৃত্যুতুল্য নীরবতার মধ্যে শোনা যাচ্ছিল কেবলমাত্র জানোয়ারগুলির গলঘণ্টার ক্ষীণ শব্দ, আর তিব্বতী ও ভুটিয়াদের তীব্র স্বরে শিস্-এর আওয়াজ। এবার চলেছি আমরা যোগীশ্বরের জটাজাল স্পর্শ করবার জন্ম—তাঁর শুভ্র বিরাট দেহের

উপর দুর্বল শিশুর মতন কোন রকমে হামাগুড়ি দিয়ে। হামাগুড়িও যে আর দিতে পাচ্ছি নে—কী ভীষণ ঠাণ্ডা! হতাশার পীড়নে অন্তরাত্মা এক একবার মর্মভেদী আর্তনাদ করে উঠেছে।

সিয়াংচুং হতে অনেকটা এসেছি। হঠাৎ জোর বরফানি হাওয়া! অবস্থা উপলব্ধি করতে বিলম্ব হল না। হিমঝঞ্ঝা—ঝিড়্ ঝিড়্ ঝিড়্। চতুর্দিক নিঝুম। এ যেন আকাশ থেকে পুষ্পবৃষ্টি হচ্ছে। মল্লিকা ফুলের মতন সাদা অজস্র হিমবিন্দু ধীরে ধীরে নৃত্যগতিতে নেমে সংকীর্ণ গিরিবর্ত্ম আচ্ছাদিত করে ফেলল। ক্রমে সর্বাঙ্গ ঢেকে গেল তুষারে। মাথার উপর তুষারের চন্দ্রাতপ, লিপুর উপরে তুষারপাত! আতঙ্কে প্রাণ কেঁপে উঠল। লিপু অতিক্রম করা বুঝি আর হল না! ক্রমে ইন্দ্রিয় মন ইচ্ছাশক্তি—সব অবলুপ্ত। এমন সময় কাঁচথাম্পা সকলকে সাহস দিয়ে জানিয়ে দিল যে, গিরিদ্বারের শেষ সীমায় পৌঁছবার আর সামান্যই বাকী। ভয়ের কোন কারণ নেই।

ক্রমে তুষারপাত থেমে গেল। আ! বাঁচা গেল। তুষার-পড়ার সময় কেমন যেন একটা নেশার মতন হয়—সর্বাঙ্গ আড়ষ্ট হয়ে যায়, তন্দ্রা আসে। দেহ-মনের সমস্ত শক্তিকে কেন্দ্রীভূত করে চলেছি গিয়ে। এমন সময় আমাদের বামপার্শ্বের একটি পর্বতশিখরে পেছন থেকে সূর্যনারায়ণ জ্যোতির কিরীট মস্তকে ধারণ করে সহাস্যবদনে দেখা দিলেন। চারিদিক এক দিব্য আলোকচ্ছটায় উদ্ভাসিত হয়ে গেল। প্রাণে জেগে উঠল আশার নবচেতনা। সে যে কী মহামহিম সুপ্রভাত! জীবনে প্রায় প্রতিদিনই সূর্যোদয় দেখি। কিন্তু এমন সূর্যোদয় কখনও তো দেখি নি! এতকাল পরেও মনে হচ্ছে যেন সে দিন তপনদেবের বিরাট রূপদর্শনে ধন্য হয়েছিলাম।

তিব্বতে প্রবেশ

বেলা প্রায় সাড়ে আটটায় সকলে লিপুর সর্বোচ্চ শিখরে হাজির হলাম। ইতঃপূর্বেই কয়েকজন ভুটিয়া ও তিব্বতী গিরিদ্বারে পৌঁছে উচ্চ প্রার্থনা ও মনের আনন্দে ছাং (নিজেদের তৈরী মদ) পানে রত হয়েছিল। গিরিদ্বারটি পঁচিশ-ত্রিশ হাত মাত্র চওড়া। দুপাশেই বরফাচ্ছাদিত অলঙ্ঘনীয় উচ্চ পর্বত—দুর্ভেদ্য প্রাচীরের ন্যায় দাঁড়িয়ে আছে। চারিদিক ঘিরে রয়েছে শুভ্র বরফে। গিরিদ্বারের দুপাশে শুকনো গাছ পুঁতে ভুটিয়ারা তাতে উড়িয়েছে নানা রং-এর নিশান। ক্রমে অনেক লোকের সমাগম, স্তব ও প্রার্থনাধ্বনিতে এবং পরস্পরের আলিঙ্গনপাশে বদ্ধ হয়ে 'ছাং'-পানে স্থানটি মুখরিত হয়ে উঠল।

গিরিসঙ্কটের উপর দাঁড়িয়ে প্রথম যখন তিব্বতের দিকে তাকালাম, তখন সমগ্র মনপ্রাণ এক অব্যক্ত আনন্দ-হিল্লোলে উদ্বেলিত হয়ে গেল। কী অনুপম! দৃষ্টির সকল বাধা খুলে গেছে—সকল সংকীর্ণতা বিলীন হয়েছে সীমাহীন পরিব্যাপ্তিতে। আহা! কী রূপ-গৌরব! প্রভাতের নবারুণচ্ছটায় উদ্ভাসিত তিব্বত, যেন নিজ সৌন্দর্যমণিকোঠার দ্বার সগর্বে উন্মোচন করে বরণ-ডালাহস্তে স্মিতমুখে দণ্ডায়মান! স্তরে স্তরে বিন্যস্ত নানা বর্ণের পর্বতমালা—তার পশ্চাতে ঢেউখেলান বরফঢাকা গুরলামান্ধাতা।[১] এ রূপের বর্ণনা হয় না। শত শত নিপুণ ভাস্কর যুগযুগান্তর কঠোর সাধনা করেও এ মাধুর্যের এককণা-বিকাশে সমর্থ নয়। ভারতের শেষপ্রান্তে

১ গুরলামান্ধাতা পর্বত লিপুলেক পাশ হতে বহুদূরে তিব্বতের মধ্যে অবস্থিত—মান্ধাতার তপস্যাস্থান। উচ্চতা ২৫,৩৫৫ ফুট।

লিপুর উপর দাঁড়িয়ে, মুগ্ধপ্রাণে ঐ লোকাতীত সৌন্দর্য-সুধা আকণ্ঠ পান করে, ভারতের দিকে একবার শেষ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে নামতে শুরু করলাম। তখন মনের ভিতর আন্দোলিত হচ্ছিল আনন্দ ও শোকের বিপরীত ভাবতরঙ্গ। কৈলাসপতির দর্শনে মনপ্রাণ তৃপ্ত করতে চলেছি নূতন দেশে কিন্তু দুঃখও হচ্ছিল যে পুণ্যভূমি ভারতকে হয়তো ছেড়ে চলেছি চিরতবে।

আমরা নামছি বরফের উপর দিয়ে। এত খাড়া ও পিচ্ছিল উৎরাই যে প্রতিক্ষণেই ভয় হচ্ছিল—বুঝি বা দু'হাজার ফুট নীচে গিরিখাতে গড়িয়ে পড়ি। সকলকেই নামতে হচ্ছে হেঁটে—এ পথে সওয়ার চলে না। বরফ কেটে সিড়ির মতন পথ তৈরী করে ভুটিয়ারা দু-তিন জনে এক-একটি ঘোড়ার লেজ ধরে পিছন থেকে টেনে রেখে কোনপ্রকারে নামাচ্ছে জানোয়ারগুলিকে।

প্রায় এক মাইল পথ কোনপ্রকারে গড়াতে গড়াতে নেমে এসে তিব্বতের মালভূমি স্পর্শ করলাম। পাশেই একটি খরস্রোতা ছোট নদী লিপুর বরফগলা জল বয়ে নিয়ে চলেছে। বেশ খট্ খট্ রোদ। এতক্ষণে শীতের কনকনানি কেটে গিয়েছে। নদীর ধারে হাত-পা ছড়িয়ে বসে শুয়ে খানিকক্ষণ আরাম করা গেল। সামান্য জলযোগ শেষ করে আবার চলেছি। নদীর ধারে ধারে এক গিরিখাতের ভিতর দিয়ে প্রস্তরময় অতি সংকীর্ণ পথ। হেঁটে যেতেই ভয় হচ্ছিল : একটি পা কোনরকমে ফস্‌কালেই নদীর বরফজলে মিশে যেতে হবে। কিন্তু তিব্বতী ও ভুটিয়া ঘোড়াগুলি বেশ সচ্ছন্দ গতিতে ঐ সঙ্কটপূর্ণ পথে অবহেলায় যাচ্ছিল। ঐ প্রাণিগুলি এমন সাবধান ও দৃঢ় পদবিক্ষেপে চলে যে, কোনরকম পা-ফেলবার মতন পাঁচ-ছয় ইঞ্চি চওড়া পথেও তাদের কখনই পদস্খলন হয় না।

দুপাশে ও সামনে বৃক্ষলতা এমন কি তৃণহীন ধূসর নগ্ন পর্বত ছাড়া আর কিছুই নেই। উপরে সুনীল পরিচ্ছন্ন অনন্ত আকাশে রৌদ্রের খেলা। উৎরাই পথে প্রায় দু মাইল আসার পরে পথটি গিয়েছে নদী অতিক্রম করে পর পারে। একমাস পূর্বেও এ-পথ, এ-স্থান সব কিছুই বরফের নীচে সমাধিস্থ হয়ে স্থাণুর মতন পড়ে ছিল। প্রতিদিন শত শত প্রাণীর স্পর্শে স্থানটির প্রাণে যেন এসেছে নব জাগরণ।

নদীতে হাঁটুজল, অপ্রশস্ত—স্রোতও বেশী ছিল না। সকলেই তো ঘোড়ার পিঠে বেশ পেরিয়ে গেল। জুতো-মোজা-পরা—আমি পার হই কি করে! সব খুলতে আরম্ভ করেছি এমন সময় কীচখাম্পা পেছন থেকে এসে পিঠে করে পার করে দিল।

একমাইল পরেই—'পালা'। দুটি ছোট ছোট ধর্মশালা আছে। অনেকেই লিপু অতিক্রম করে পালাতে থেকে যায়, আর এগুতে পারে না। অনেককে পালাতে আশ্রয় নিতে দেখলামও। আমরা ঠিক করেছিলাম—আরও পাঁচ মাইল অতিক্রম করে বরাবর চলে যাব তাকলাকোটে। পাশের ছোট নদীটির কলধ্বনি স্নেহময়ী জননীর ঘুমপাড়ান গানের মতন অতি মৃদু-মধুর হয়ে কানে ভেসে আসছিল।

তিব্বতের মালভূমির উপর দিয়ে চলেছি। চড়াই-উৎরাই তেমন নেই—যেন সমুদ্রের ঢেউ-এর উপর দিয়ে সাঁতার কাটছিলাম। অধিকাংশ স্থানই কূর্মপৃষ্ঠের মতন। কিন্তু চারিদিকের পর্বতমালার আকৃতি, বিন্যাস ও বর্ণ খুবই চিত্তাকর্ষক। লিপু-নির্গত টিস্কুমচু এবং জুংজিন্‌চু দুটি ছোট পার্বত্য নদীর সঙ্গমের পাশ দিয়ে কাঠের সেতু পার হয়ে বাঁদিকের একটি মোড় ঘুরতেই এক পর্বতের সানুদেশে চিত্রপটের মতন দেখা যাচ্ছিল রৌদ্রোজ্জ্বল তাকলাকোট। তারই ঠিক উপরে পর্বতশীর্ষে দুর্গের মতন

প্রকাণ্ড সিমলিং গুম্ফা (মতান্তরে শিব-লিং গুম্ফা)। দূরত্ব এখনও সাড়ে-তিন মাইল। প্রখর সূর্যকিরণে মরুভূমির মতন ধু ধু করছিল সামনের বিস্তীর্ণ প্রান্তরটি। আমাদের অগ্রগতির প্রচুর বাধা সৃষ্টি করে বিপরীত দিক হতে হু হু শব্দে প্রবল ঝড় বয়ে যাচ্ছিল। প্রায় চৌদ্দ হাজার ফুট উপর দিয়ে চলেছি। কিন্তু উচ্চতার তুলনায় ঠাণ্ডা খুবই কম। আঁকা-বাঁকা পথ। সকলেই শ্রান্ত। আগু-পিছু যে যেমন করে পারছে প্রাণপণে এগুবার চেষ্টা করছে। এক মোড় ঘুরতেই দেখা গেল দূরে একটি তিব্বতী গ্রাম। তিন-চারটি মাত্র ঘর। যব, মটর, সরষে ইত্যাদি শ্যামল শস্য-ক্ষেত্র-পরিবেষ্টিত গ্রামটি মরূদ্যানের মতন দেখাচ্ছিল। ঢোলা আলখাল্লার মতন কালো জীর্ণ পোশাকে দেহ আবৃত করে কয়েকটি তিব্বতী রমণী শস্যক্ষেত্রে সেচ-এর জল চালাচ্ছিল। গ্রামের উপকণ্ঠে পথের ধারে নানা-বর্ণের পতাকা-শোভিত দুটি ক্ষুদ্র স্তূপ। গ্রামবাসীদের সমাধি। সমাধিস্তূপের আশেপাশে বহুদূর পর্যন্ত শত শত প্রস্তরখণ্ড প্রাচীরের মত সজ্জিত। প্রত্যেক প্রস্তরেই 'ওঁ মণিপদ্মে হুঁং' মন্ত্র তিব্বতী ভাষায় বড় বড় অক্ষরে ক্ষোদিত। কোন পাথরে এই মন্ত্র ছাড়াও অন্যান্য অনুশাসনমন্ত্র ক্ষোদিত আছে। যে যত বেশী সঙ্গতিসম্পন্ন তার সমাধিস্তূপ তত বড় এবং তার আত্মার সদ্গতির জন্য মন্ত্রক্ষোদিত প্রস্তর তত বেশীসংখ্যক স্থাপিত হয়।

আরও এগিয়ে গিয়ে পথিপার্শ্বে একটি বড় গ্রাম পাওয়া গেল। নাম 'মগরুম'। পঞ্চাশ-ষাট ঘর লোকের বাস। বাড়ীগুলি সবই নুড়িপাথর ও কাদামাটির তৈরী এবং সংস্কার-অভাবে খুবই জীর্ণ। তিন দিকে শ্যামল শস্যক্ষেত্র। যব-মটর-সরষে বেশ ফলেছে। পশ্চিম তিব্বতে প্রধান খাদ্যই যব ও মটরের ছাতু, মাংস, মাখন আর চা। পথের দুপাশেই

গ্রাম। যাত্রিদল দেখে অর্ধনগ্ন আবালবৃদ্ধবনিতা প্রতি ভগ্নগৃহদ্বারেই উৎসুক হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ছেলেমেয়েদের হাতে একটি করে তিব্বতী পয়সা দিতেই তাদের আনন্দ আর ধরে না। জিভ বের করে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে লাগল। গ্রামের পাশেই আটা-পিষবার পানচাক্কী। গ্রামের প্রান্তভাগেই শুষ্কপ্রায় একটি নদী অদূরে মিশে গেছে কর্ণালীতে। উপলময় নদীগর্ভ অতিক্রম করে কাঠের সেতুটির পরেই তাকলাকোট।

নদীগর্ভ হতে প্রায় দুইশত ফুট খাড়া চড়াই। তিব্বতী মেয়েরা পিঠে প্রকাণ্ড জলের ঘড়া নিয়ে স্বচ্ছন্দে উঠে যাচ্ছে। তাকলাকোট গ্রাম, মণ্ডি, এমন কি শিবলিং গুম্ফার (যদিও প্রায় চারশত ফুট উঁচুতে) জলও এই নদী হতেই নিয়ে যাওয়া হয়। গ্রামবাসীদের অনেকগুলি বাড়ী ও আচ্ছাদনহীন কতকগুলি ঘর অতিক্রম করে গাইডের নির্দেশ মতন একটা ফাঁকা জায়গায় এসেছি। বেলা প্রায় দু'টা। প্রখর রৌদ্রে চারিদিক ঝলসে যাচ্ছে। বালি-কাঁকর উড়িয়ে বয়ে যাচ্ছিল প্রচণ্ড ঝড়, চোখ চাইবার জো ছিল না। তিব্বতের মধ্যে তের হাজার ফুট উচ্চস্থানে এত গরম—কল্পনার অতীত! তাঁবু-খাটান এক মহাবিভ্রাট। নুড়িপাথরপূর্ণ মাটিতে কিছুতেই লোহার খোঁটা পোঁতা যাচ্ছিল না। তাঁবুর কোণে কোণে থলে-ভরতি পাথর বেঁধে কোনরকমে তাঁবু খাড়া করা হল। কিন্তু গরমের তীব্রতায় তাঁবুর ভিতর টেকা যায় না। নব্বই ডিগ্রি তাপ! শেষটায় আশ্রয় নিতে হল—গার্বিয়াং গ্রামের প্রধান কল্যাণ সিং-এর একটি খালি দোকানঘরে। ছাদহীন বাড়ী—চারদিকের মাটির দেয়ালগুলি মাত্র খাড়া আছে। কালো কম্বল দিয়ে কোনরকমে ছাদটি ঢেকে নেওয়া হল। তাকলাকোটে ভুটিয়া ব্যবসায়ীদের প্রায় দু-তিন শত দোকানঘর আছে। সবগুলিই ঐ একই রকমে তৈরী—আচ্ছাদনহীন। আষাঢ় হতে কার্তিক

এই কয়মাস—ঐ বাড়ীতে ব্যবসায়ীরা থাকে। তখন কাল কম্বলের চাঁদোয়া দিয়ে উপরটি ঢেকে নেয়। আবার চলে যাবার সময় ঐ চাঁদোয়া খুলে নিয়ে যায়। ব্যবসায় মন্দ নয়! পশ্চিম তিব্বতে বৃষ্টির অপেক্ষা শিলাবৃষ্টি ও তুষারপাতই হয় বেশী—বিশেষকরে শীতকালে। সেজন্য অনাবৃত দেয়ালগুলিও নষ্ট হয় না।

সারা বিকেলটি শুয়ে বসে কাটান গেল। বেরুবার মতন উৎসাহ কারো ছিল না। কল্যাণ সিং-এর ছেলে কিষণ সিং তাকলাকোটের দোকান চালাচ্ছিল। ছেলেটির ভদ্র, অমায়িক ও আন্তরিক ব্যবহারে মুগ্ধ হতে হয়।

সন্ধ্যার পূর্বে কয়েকজন ভুটিয়া বণিকের সঙ্গে তিব্বতের ব্যবসায়-বাণিজ্য সম্বন্ধে অনেক আলাপ হল। প্রধানতঃ ভুটিয়ারাই এ অঞ্চলের ব্যবসায়ী। পশ্চিম তিব্বতে তাকলাকোট, গারটোক, নারভা, থোকর, গানিমা ও টারচান মণ্ডিই প্রধান। এ সকল ব্যবসাকেন্দ্র-স্থানে ভুটিয়া ও তিব্বতীদের মধ্যে প্রতিবৎসর সহস্র সহস্র টাকার কারবার হয়। বেশীর ভাগ ক্রয়-বিক্রয়ই হয় পণ্যের বিনিময়ে। ভারত হতে চাল গম যব গুড় চিনি কাপড় কেরাসিন তৈল তৈজসপত্র এবং বর্তমান সভ্যতার নানাবিধ উপকরণ ভুটিয়ারা নিয়ে যায় তিব্বতের মণ্ডিতে। বিনিময়ে তিব্বত থেকে নিয়ে আসে—পশম, কম্বল, গরম কাপড়, ছাগল-ভেড়া-ঘোড়া-খচ্চরের চামড়া, সোহাগা, সোডা প্রভৃতি নানাবিধ জিনিস। ইদানীং নাকি ভারতীয় বণিকগণ তাদের বড় বেশী ঠকাতে আরম্ভ করেছে, সেজন্য তিব্বতীরা ভারতীয় বণিকদের উপর খুব বেশী খুশী নয়। তিব্বতে বাণিজ্য করা এক মহা ভয়াবহ ব্যাপার। মালপত্র নিয়ে এক মণ্ডি হতে অন্যত্র যাবার সময় ভুটিয়ারা আগ্নেয়াস্ত্রাদিতে সুসজ্জিত হয়ে দলবদ্ধভাবে গমন করে।

সুবিধা পেলেই তিব্বতী ডাকাতরা এদের মালপত্র ঘোড়া খচ্চর সব লুটে নিয়ে যায়। তখন হয় খণ্ড যুদ্ধ। দুপক্ষের লোকই হতাহত হয়। ডাকাতের অত্যাচার ক্রমে কমে আসছে।

ভারতের সঙ্গে তিব্বতের সম্বন্ধ বহু প্রাচীন; কিন্তু ভৌগোলিক সংস্থান ও রাজনৈতিক পরিস্থিতির জন্য সাধারণ ভারতীয়ের কাছে তিব্বত এখনও অজানা দেশ। সমুদ্রপৃষ্ঠ হতে প্রায় পনর হাজার ফুট উচ্চে অবস্থিত তিব্বতের মালভূমির অধিকাংশ স্থানই প্রচুর বরফে আবৃত থাকলেও খনিজ সম্পদে তিব্বত সুসমৃদ্ধ। পুরাকালে ভারতের লোকেরা তিব্বতকে 'কুবেরের দেশ' বলতো।

ভারতীয় ভূতত্ত্ব-বিভাগের ভূতপূর্ব পরিচালক সার হেনরী হেভেন্ তিব্বত সরকার কর্তৃক নিমন্ত্রিত হয়ে ১৯১২ সালে তিব্বত পরিদর্শন করেন। তাঁর মতে তিব্বতের ভূগর্ভপ্রোথিত স্বর্ণসম্ভার পৃথিবীর যে-কোন দেশের খনিজ স্বর্ণসম্পদ হতে শ্রেষ্ঠ। তিব্বতের প্রধান সেনাপতির সহকারী তাঁর বিবৃতিতে বলেছিলেন যে, তিনি নিজে বিশ তোলা পরিমাণ এক-একটি স্বর্ণের ডেলা তিব্বতের খনিতে দেখেছিলেন।

তিব্বত কিন্তু এযাবৎ তার খনিজ সম্পদের প্রসারকল্পে কিছুই করে উঠতে পারে নি। কেবলমাত্র পাশ্চাত্ত্য শক্তিপুঞ্জের হস্তক্ষেপ ও শোষণ হতে সে তার খনিজ সম্পদকে এতকাল সর্বতোভাবে বাঁচিয়ে রাখবার চেষ্টা করেছে। ১৯০৪ সালে ইয়ং হাজবেণ্ডের তিব্বত-অভিযানের পর হতে পাশ্চাত্ত্য-শোষণের ভয়ে তিব্বত সরকার স্বর্ণখননকার্য একেবারে বন্ধ করে দিয়েছে। বিগত মহাযুদ্ধের সময় রাশিয়া চীনতিব্বত-সংলগ্ন সিন্‌কিয়ান্ প্রদেশের উপকণ্ঠে খনন ও পরীক্ষা দ্বারা প্রচুর খনিজ তৈল ও কয়লার সম্ভাবনা সম্বন্ধে নিশ্চিতসিদ্ধান্ত হয়েছে। পূর্ব-তিব্বতে লৌহ, তাম্র, সীসক

ও রৌপ্যের সম্ভাবনাও যথেষ্ট। পশ্চিম-তিব্বতে এন্টিমণি ও পারদের খনিও বিদ্যমান। গত তিনশত বৎসর যাবৎ তিব্বতের অধুনালুপ্ত হ্রদ হতে প্রচুর পরিমাণ সোহাগা ক্ষার লবণ ও সোডা প্রভৃতি সংগৃহীত হয়ে ভারতে আমদানী হচ্ছে।

কিন্তু বর্তমানে পাশ্চাত্ত্য শক্তিপুঞ্জের শোষণ হতে নিজেকে বিমুক্ত রাখা তিব্বতের পক্ষে আর সম্ভব হবে বলে মনে হয় না। চীনকে পুরোবর্তী করে চীনের অন্তরালে অন্য শক্তি তিব্বতের খনিজসম্ভার শোষণ করতে বদ্ধপরিকর! তিব্বত তথা প্রাচ্য জাতিপুঞ্জের সম্মুখে এক মহাসঙ্কট যেন ভ্রূকুটি করে দাঁড়িয়েছে।

* * *

ধীরে ধীরে সন্ধ্যা নেমে এল। পর্বতচূড়ার পাশে চন্দ্ররেখা। তারায় তারায় ছেয়ে গেছে সুনীল আকাশ। দিনের তীব্রতা ও রুক্ষতার চিহ্নমাত্র কোথাও নেই। আনমনা হয়ে সামনের সমতল স্থানে ঘুরে বেড়াচ্ছি। আবছায়া অন্ধকারে চারিদিক অবলুপ্ত।

দিনের অসহ্য গরমে মনে হয়েছিল রাত্রে ঠাণ্ডা তেমন হবে না। কিন্তু রাত্রি-বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে দারুণ শীতের টের পাওয়া গেল। তিব্বতে গরম ও শীতের প্রভেদ এক দিনেই সত্তর ডিগ্রি পর্যন্ত দেখেছি। কোথাও দু ঘণ্টার মধ্যেই ষাট ডিগ্রির তফাৎ হয়েছে। শেষ রাত্রে শীতে কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে আছি—এমন সময় একটা বড় রকমের গোলমালে চমকে উঠেছি। কারণ নির্ণয় করতে বাইরে এসে আরও অবাক হয়ে গেলাম। আবাস প্রাঙ্গণে আমাদের ঘোড়ার নাদ্-কুড়ানো নিয়ে আট-দশ জন তিব্বতী রমণীর মধ্যে বেধে গেছে ভীষণ কলহ। পরে জানা গেল— পশ্চিম তিব্বতে বৃক্ষলতাদি নেই, জ্বালানি কাঠের একান্তই অভাব।

বিশেষ করে শীতের ছয় মাস প্রাণধারণের জন্য তাদের একটু করে আগুন চাই-ই। সেজন্য দেড়-হাত লম্বা 'ডামা' নামক এক রকম কাঁটা-ঝোপ ও গৃহপালিত পশুর গোবর তাদের জড় করে রাখতে হয়। তিব্বতী রমণীরা সব সময়ই পিঠে একটি ঝুড়ি বয়ে বেড়ায় এবং গোবর পেলেই কুড়িয়ে ঐ ঝুড়িতে তুলে নেয়।

খোচরনাথ

খোচরনাথ গুম্ফা (মঠ) দেখতে যেতে হবে। যাতায়াতে চব্বিশ মাইল পথ। সকালে তাড়াতাড়ি প্রাতরাশ সেরেই দুপুরের জন্য কিছু খাবার সঙ্গে নিয়ে যাত্রা করা গেল। যাত্রি-দলের খোচরনাথ যাওয়া আসার জন্য গাইড নূতন সওয়ারীঘোড়ার ব্যবস্থা করেছিল। তার পরদিনই তীর্থপুরী-যাত্রা, সেজন্য আমাদের ঘোড়াগুলির একটু বিশ্রাম দরকার। কীচথাম্পার সঙ্গে হেঁটে চলেছি। সামনেই প্রভাতসূর্যালোক-আলোকিত শিবলিং-গুম্ফা। গুম্ফার ধার ঘেঁসেই পথ। প্রায় পাঁচ শত ফুট উঠতে হল। চড়াইর শেষপ্রান্ত হতে দেখা যায় কর্ণালী নীচ দিয়ে বয়ে যাচ্ছে। পথের বামপার্শ্বে পাহাড় কেটে গুহার মতন তৈরী শ্রেণীবদ্ধ বসতবাড়ী—প্রত্যেক বাটীর সম্মুখ দিকে একটি মাত্র ছোট দরজা। বাড়ীর সবটাই পাহাড়ের ভিতর। দারুণ তুষারপাত হতে আত্মরক্ষার জন্য তিব্বতীরা ঐ রকম বাসস্থান তৈরী করে থাকে। প্রতি গৃহদ্বারেই অর্ধনগ্ন বালক-বালিকাগণ বৃদ্ধাদের আঁচল আঁকড়ে ধরে ভীত উৎসুক দৃষ্টিতে আমাদের দেখছিল।

ক্রমে কর্ণালীর কাঠের সেতু পেরিয়ে নদীর তীরে তীরে চলেছি। পথের বাঁদিকেই বৃক্ষলতাশূন্য প্রস্তরময় একটি উচ্চ পর্বত শতেক যুগের স্মৃতি বক্ষে ধারণ করে দণ্ডায়মান। একটু দূরে দেখা গেল—কালকম্বলের কয়েকটি তাঁবু। নিকটে স্তূপাকারে পড়ে আছে শত শত চামড়ার থলে-বোঝাই মালপত্র। তিন-চার বৎসরের একটি তিব্বতী শিশু দার্শনিক-সুলভ গাম্ভীর্য ও ঔদাসীন্য নিয়ে নির্বিকারচিত্তে বসে আছে। পাশেই শৃঙ্খলাবদ্ধ

ভীষণাকৃতি কুকুর। বোধ হয় ঐ শিশুটি ও কুকুরের উপর মালপত্রবক্ষার ভার দিয়ে তিব্বতীরা গিয়েছে অন্যত্র। কর্ণালীর ধারে ধাবে শ্যামল শস্যক্ষেত্র দেখে চোখ জুড়িয়ে যায়। একটি পার্বত্য নদী পেরুতে হল। জনশূন্য পথ। স্থানটি লোকবসতির চিহ্নহীন। প্রায় তিন মাইল পবেই দেখা গেল একটি গ্রাম। উপকণ্ঠেই সারিবদ্ধ ছোট ছোট স্তূপ, আর মণিমন্ত্র-খোদিত প্রস্তরশ্রেণী দেখেই বুঝতে পারা যায় যে গ্রাম নিকটবর্তী। গ্রামে সাত-আট ঘর লোকের বাস। দারিদ্র্যপূর্ণ ঘরদোর লোকজন সব কিছুই। এ গ্রামে একজন জীর্ণবসন তিব্বতী পরম পরিচিতেব ন্যায় আমাদের সঙ্গে কথা বলবার চেষ্টা করলে। দু চারটি ভাঙ্গা হিন্দি শব্দ জানে। সে কয়েক বৎসর পূর্বে নাকি ভারতে এসেছিল—অর্থাৎ পাহাড়-তলীর টনকপুব মণ্ডি দেখতে। অন্যান্য গ্রামবাসীদের অবাক করে সে বিস্ময়কর হিন্দিতে আলাপ জুড়ে দিল। অনেক কষ্টে হাসি চাপতে হয়। চমৎকার তার আন্তরিকতা ও সরল ব্যবহার।

কর্ণালীর ধার ছেড়ে এবার চলেছি মালভূমির উপর দিয়ে। পথ ঢেউ-খেলান উঁচুনীচু অতীব বন্ধুর ও উপলময়। বিপরীত দিক থেকে ধুলো-কাঁকর উড়িয়ে এমন ঝড় বইছিল যে এগুনো মুস্কিল। রোদের তেজও খুব বেড়েছে। অরুণ বাবুর মাথা থেকে হ্যাট্‌টি এমন উড়িয়ে নিয়ে গেল যে, কীচখাম্পা হ্যাট্‌টির পেছনে পেছনে এক ফার্লং দৌড়ে গিয়ে কোন প্রকারে সেটি উদ্ধার করল। শুষ্ক-প্রায় দুটি পার্বত্য নদী পর পর অতিক্রম করে বেলা এগারটার পরে এক মোড় ফিরতেই সামনে খানিক দূবে পার্বত্য পটভূমির মধ্যে দেখা গেল খোচরনাথ গুম্ফা। প্রশস্ত কর্ণালী খুব নিকটেই বয়ে যাচ্ছে। গুম্ফার আবেষ্টনীটি অতীব মনোরম। ক্রমে এগিয়ে এলাম গুম্ফার সামনে। আমাদের আগমন লক্ষ্য করে কয়েকজন

মঠবাসী সমবেত হয়েছিল। সকলের পরিধানেই খয়ের রংএর ঢিলা আলখাল্লা, মস্তক মুণ্ডিত। আমরা 'জুঃ লাঃ' শব্দে তিব্বতী ভাষায় অভিবাদন জানাতেই শ্রমণগণ খুবই খুশী হলেন। জুঃ লাঃ—কথার অর্থ দেবতুল্যগণকে প্রণাম। কীচখাম্পাও তিব্বতী। খোচরনাথ গ্রামেই তার জন্ম। প্রতি বৎসরই সে একাধিকবার যাত্রী নিয়ে গুম্ফাদর্শনে আসে। সকলের কাছেই সে সুপরিচিত। কীচখাম্পা 'দরজুদেন্‌লামা' অর্থাৎ কাশীর সন্ন্যাসী ব'লে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিল। তিব্বতী লামারা ভারতবর্ষের, বিশেষ করে, কাশীর সন্ন্যাসীদের খুবই সম্মানের চোখে দেখে। ভারতভূমিতেই ভগবান তথাগতের জন্ম, বুদ্ধগয়ায় তাঁর বুদ্ধত্বলাভ, সারনাথে তিনি প্রথম প্রচার করেছিলেন 'নির্বাণের বাণী' আর ভারতেই তিনি পরিনির্বাণ লাভ করেছিলেন—সেজন্য সমগ্র ভারতই বৌদ্ধ মাত্রের নিকটই মহা পবিত্র। দোভাষীর সাহায্যে সামান্য আলাপের পর মঠবাসি-পরিবৃত হয়ে এগিয়ে চলেছি মন্দিরের দিকে। পথের দুপাশেই সারি সারি ঘর। কোথাও তিব্বতী রমণীগণ ছোট ছোট তাঁতে পশমী কাপড় বুনছিল, কেউ বা উদূখলে কুটছিল শস্য। পরে জানা গেল, গুম্ফার তিব্বতীয় কাজকর্ম করার জন্য যে-সকল লোক নিযুক্ত আছে তারা পরিজনবর্গ নিয়ে বাস করে গুম্ফাসংলগ্ন স্থানে। গুম্ফার প্রবেশদ্বারেও কয়েক জন লামাবেশধারীর সঙ্গে দেখা হল। ফটকের পরেই প্রশস্ত প্রাঙ্গণ—দুপার্শ্বে দুটি মন্দির। প্রধান মন্দির তখন বন্ধ ছিল। গাইড পূজারীর সঙ্গে মৃদুস্বরে দু-চার কথা বলার পরেই পূজারী মন্ত্র উচ্চারণ করতে করতে খুলে দিল মন্দিরের দরজা। প্রথমেই নাটমন্দির বা উপাসনাগার। উভয় পার্শ্বেই বসবার গদিপাতা সারিসারি আসন। আসনের সামনে প্রায় একহাত উঁচু কাঠের সরু মেজ। উপাসনাগারে এক সঙ্গে বিশ-পঁচিশ

জন বসতে পারে। (পরে জানা গেল—উপাসনাগারই ভোজনাগার-রূপেও ব্যবহৃত হয়।) উপাসনাগার অতিক্রম করে মন্দিরে প্রবেশ করলাম—মন যুগপৎ আনন্দ ও বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে গেল। তিব্বতের মন্দিরে এই আমাদের প্রথম প্রবেশ আর এই প্রথম দেখলাম তিব্বতী লামাদেরও। নাটমন্দির ও গর্ভমন্দিরে আলোর অত্যন্ত অভাব—যদিও উপরে একটি ক্ষুদ্র রোগন্দান ছিল। প্রকাণ্ড বেদী—কাঠের তৈয়ারী মনে হল। বেদীমূলে একটি ঘৃতপ্রদীপ ক্ষীণালোক দিচ্ছে। শুদ্ধ ও ভক্তিনম্র-প্রাণে সব দেখেছি। বেদীতে স্তরে স্তবে সজ্জিত রয়েছে অনেকগুলি ঘৃতপ্রদীপ ও পিতলের বাটি। সবই পরিচ্ছন্ন। একটি প্রকাণ্ড থালায় যব গম ধান্য ও পিষ্টকের ন্যায় খাদ্যদ্রব্য ভোগেব জন্য রক্ষিত। বেদীর উপর সুবর্ণময় সহস্রদল পদ্মেব উপর বিরাজ কবছিলেন তিনটি কমনীয় বিগ্রহ। প্রত্যেকটি বিগ্রহ উচ্চতায় প্রায় সাত-আট ফুট। মাঝের বিগ্রহ অপেক্ষাকৃত বড়—চতুর্ভুজ; দ্বিভুজ স্বর্ণময় এবং দুবাহু রৌপ্যময়। মূর্তি-গুলি সব শান্তদর্শন, বহুমূল্য বস্ত্রালঙ্কারে শোভিত এবং নিপুণ ভাস্কর্যের নিদর্শন। মাঝের চতুর্ভুজ মূর্তি—যামব্যাগ্নাং। ডানপাশের মূর্তি—চান্‌রাজে (অবলোকিতেশ্বর) এবং বাম পাশে—ছন্‌দোরাজ (বজ্রপাণি)। কিন্তু ভারতীয় যাত্রীদের নিকট লামারা এই বিগ্রহগুলিকে রাম, লক্ষ্মণ ও সীতাব মূর্তিরূপে পরিচয় দিয়ে থাকে। বিগ্রহগুলি অষ্টধাতুনির্মিত। তিনটি প্রধান বিগ্রহ ছাড়া বেদীর উপর ধাতুনির্মিত দ্বিভুজা চতুর্ভুজা অষ্টভুজা দশভুজা দেবীমূর্তি এবং আচার্য শঙ্কব ও অন্যান্য হিন্দু দেবদেবীর মূর্তিও পূজিত হচ্ছে। বুদ্ধদেবের কোন বিগ্রহ দেখা গেল না। পূজাদির আড়ম্বর কিছুই নেই। আমরা সুগন্ধি ধূপকাটি জ্বালিয়ে অগুরু ছড়িয়ে প্রত্যেকেই এক এক টঙ্কা প্রণামী দিলাম এবং লামাদের সেবার জন্যও কিছু টঙ্কা

পূজারীর হাতে দেবার পরে আমাদের মঙ্গলার্থে বেদীর উপর কয়েকটি ঘৃতপ্রদীপ জ্বালিয়ে দেওয়া হল। প্রদীপের উজ্জ্বল আলোকে বিগ্রহগুলি যেন জীবন্ত দেখাচ্ছিল।

প্রধান মন্দির-দর্শনের পর বিপরীত দিকে একটি অপেক্ষাকৃত ছোট মন্দিরে আমাদের নিয়ে যাওয়া হল। এ মন্দিরাভ্যন্তর গভীর-অন্ধকারময়। ভিতরে প্রবেশ করে প্রথম কিছুই দেখা যাচ্ছিল না। দু-তিন জন লামা মৃদুস্বরে সুরসংযোগে শাস্ত্র-আবৃত্তিতে রত। আর কয়েক জন জপচক্রের সাহায্যে জপ করছেন 'ওঁ মণি পাদ্ম হুং' মন্ত্র।

আমরা পূর্বে শুনেছিলাম যে এই গুম্ফাতে ৺মহাকালীর বিগ্রহ নিত্য পূজিত হয়। পূজারীকে সে সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করায় খানিকটা ইতস্ততঃ করে আরও দু-এক জন লামার সঙ্গে কি যেন পরামর্শ করল। পরে আমাদের নিয়ে চললো ঐ গুম্ফার ভূগর্ভস্থিত এক স্থানে। নীচে নামবার সিঁড়ি বেয়ে পূজারীর সঙ্গে আমরাও একে একে নেমে গেলাম একটি ঘরে। ঘরটি অমানিশার মতন অন্ধকার। একটি ছোট প্রদীপ জ্বালিয়ে এক নিভৃত কোণে সিন্দুরলিপ্ত প্রস্তরমূর্তির সামনে আমাদের নিয়ে গেল। ঐ মূর্তিই মহাকালী। সূচীভেদ্য ভীতিপ্রদ অন্ধকার। গা ছম্ ছম্ করে। পূজারী ভীষণ গালবাদ্য করে গম্ভীর স্বরে মন্ত্র উচ্চারণ করতে লাগল। বিগ্রহ—দ্বিভুজা চতুর্ভুজা কিম্বা অষ্টভুজা আর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদি কি প্রকার তা কিছু বোঝবার জো ছিল না। দেবীমূর্তি বলেই মনে হল। পাশের দেয়ালে একখানি লম্বা খাঁড়া ঝুলছে। প্রণামী দিয়ে প্রণত হয়ে পুনরায় সেই সিঁড়িপথে উপরে এলাম। পূজাদির অনুষ্ঠান এবং গুহ্যসাধন সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করায় পূজারী ভীষণ উত্তেজিত হয়ে উঠল। অবস্থা বুঝে গাইড আমাদের চুপ করে থাকতে ইঙ্গিত করল। পরে শুনেছিলাম যে বিশেষ

তিথিতে মহানিশায় গুপ্ত পূজা, ভূতপ্রেতের নৃত্য এবং বিগ্রহের সম্মুখে পশুবলি হয়।

নির্বাণের মার্গ-অনুশীলনকারী বৌদ্ধ শ্রমণদের মঠে মহাকালীব গুহ্য উপাসনা। এই কথাটিই মনে তোলপাড় করছিল। তিব্বতে অধিকাংশ গুম্ফাতেই হিন্দু দেব-দেবীর পূজা প্রচলিত। অনেক লামাই তান্ত্রিক সাধনা, এমন কি রহস্যপূজাদি করে থাকে। অলৌকিক শক্তি ও সিদ্ধাই-লাভের দিকেই তাঁদের ঝোঁক বেশী। বিশেষসিদ্ধাইসম্পন্ন লামার সংখ্যাও নেহাৎ কম নয়।

সপ্তম এবং অষ্টম শতাব্দীতে তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম বিশেষ প্রসাব লাভ করে। বৌদ্ধ প্রভাব-বিস্তারের পূর্বে তিব্বতে যে শক্তিপূজা ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল এবং সমগ্র তিব্বতে যে হিন্দুধর্ম প্রচারিত হয়েছিল—ইহা তাবই স্পষ্ট নিদর্শন। বৌদ্ধ প্রভাবের ফলে প্রকাশ্যে পশুবলি বন্ধ হলেও, গোপনে যে তা চলত এবিষয় অস্বীকার করা যায় না। ভগবান শঙ্করের আবির্ভাবের পূর্ব পর্যন্ত ভারতে বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে হিন্দুধর্মের বিশেষ বিরোধ ছিল না। হিন্দুমন্দিরের পার্শ্বে বৌদ্ধ মঠ ও বিহার বর্তমান ছিল। হিন্দুবা তো বুদ্ধদেবকে দশাবতারের এক অবতাররূপেই গ্রহণ কবেছিল। আর বৌদ্ধ মঠেও হিন্দুর দেবদেবী-উপাসনার প্রচলনের যথেষ্ট প্রমাণ বিদ্যমান, বিশেষ করে তিব্বতে প্রায় সকল বৌদ্ধ মঠেই বর্তমান হিন্দু দেব-দেবী আনুষ্ঠানিকভাবে পূজিত হচ্ছেন। কিন্তু বৌদ্ধ ধর্মের কোন কোন শাখার মধ্যে নানাপ্রকার সংকীর্ণতা ও কদাচার প্রবেশ লাভ করে। শঙ্করের অভিযান—বুদ্ধদেব বা বৌদ্ধধর্মের বিরুদ্ধে নয়, পরন্তু সংকীর্ণভাবাপন্ন বৌদ্ধধর্মাবলম্বীদের বিরুদ্ধে অথবা সংকীর্ণতার বিরুদ্ধে।

এর পরে 'গুরুলামা'-দর্শনে যাওয়া গেল। (প্রধান লামাকে গুরুলামা

বলা হয়)। ঐ মন্দিরের একটি কোণে বিশেষ আসনে তিনি নিজ সাধনায় রত ছিলেন। সৌম্যদর্শন বালক—বয়স তের-চৌদ্দ বৎসর মনে হল। চোখ দুটি খুবই শান্ত ও স্নিগ্ধ। প্রণামী দিয়ে দাঁড়িয়েছি। আমরা 'কাশীর লামা' শুনে খুবই আনন্দিত হয়ে বললেন যে, তিনিও এক বৎসর পূর্বে বোধগয়া ও সারনাথ দর্শন করতে গিয়েছিলেন। কাশীর মন্দিরাদি সব দেখে এসেছেন। গুরুলামার সঙ্গে ধর্ম-প্রসঙ্গ ও তাঁদের সাধনপদ্ধতি সম্বন্ধে আলাপ করার ইচ্ছা ছিল কিন্তু উপযুক্ত দোভাষীর অভাবে তা সম্ভব হয় নি।

তিব্বতে 'তুলকুলামা' ও 'পঞ্চনলামা', এমন কি দলাইলামা—যিনি একাধারে সমগ্র তিব্বতের শাসনকর্তা ও ধর্মগুরু—তাঁহার নির্বাচনও এক অভিনব ব্যাপার। প্রবাদ যে প্রধান লামাবা নির্বাণমুক্তি লাভ করেন না। মৃত্যুর পূর্বে তাঁরা নাকি পুনরায় কোথায় বা কোন্ সময়ে জন্মাবেন সে সম্বন্ধে পরিষ্কার ইঙ্গিত দিয়ে যান। সেই নির্দেশ অনুসারে অন্যান্য লামারা মৃত গুরুলামার ভাবী উত্তরাধিকারীকে খুঁজে বের করে। শারীরিক বিশেষ লক্ষণ, চেহারার সাদৃশ্য প্রভৃতি পরীক্ষা করে খুব অল্প বয়সেই তাঁকে নিয়ে এসে যথাসময়ে অভিষেকাদি করে গদিতে বসান হয়। খোচরনাথের বর্তমান বালক-গুরুলামাকেও ঐভাবে নির্বাচিত করে আচার্যের গদিতে বসান হয়েছে। কোন কোন সময় গুরুলামার আসন দীর্ঘ বৎসর খালিও থাকে। ১৯৩৩ সালে ভূতপূর্ব দলাইলামার দেহত্যাগের পর তিব্বতের প্রধান ধর্মগুরু ও শাসনকর্তার পদ কয়েক বৎসর শূন্য ছিল। পাঁচ বৎসর যাবৎ ক্রমাগত অনুসন্ধানের পর চীনসীমান্তের এক বালককে দলাইলামার অবতাররূপে গ্রহণ করে যথাসময়ে গদীতে বসান হয়।

দলাইলামা-পদের অভ্যুদয় ও দলাইলামা নির্বাচন খুবই চমকপ্রদ

ব্যাপার। ইতিহাস-পাঠে জানা যায় যে, তিব্বত বহু পুরাকাল হতেই স্বাধীন রাজ্য। চীনের বিশেষ আধিপত্য তিব্বতের উপর দীর্ঘদিন যে ছিল তার বিশেষ উল্লেখ পাওয়া যায় না। বরং দেখতে পাওয়া যায় যে, তিব্বতের প্রথম রাজা হ্যাট্‌শ্রীছেন-পো মধ্য-ভারতের অন্তর্গত কোন প্রদেশের রাজপুত্র ছিলেন। রাজ্যবিস্তার করে তিনি পঞ্চম শতাব্দীর প্রথম ভাগে লাসায় উপনীত হন এবং কোন তিব্বতী সুন্দরীর পাণিগ্রহণ করেন। তাঁর রাজত্বকালে তিব্বত রাজ্য মগধ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। হ্যাট্‌শ্রীছেন-পো-র বংশ নবম শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত তিব্বতে রাজত্ব করে। ৮৩৬ খ্রীঃ অব্দে এই বংশের রাজত্ব শেষ হয় এবং তিব্বতের শাসনভার ক্রমশঃ সন্ন্যাসিসম্প্রদায় এবং খণ্ড ভূম্যধিকারিগণের হস্তে এসে পড়ে। এই সময় হতে প্রায় পাঁচ শত বৎসব তিব্বতে কোন একচ্ছত্র রাজা ছিলেন না। চতুর্দশ শতাব্দীর শেষ ভাগে তিব্বতে পুনরায় সম্মিলিত রাষ্ট্র গঠিত এবং প্রথম দলাইলামার আবির্ভাব হয়। রাষ্ট্রের অধিপতি দলাইলামা ভগবান বুদ্ধের অবতার বলে গৃহীত হলেন। প্রথম দলাইলামা সুদীর্ঘ ৮৪ বৎসর কাল তিব্বতের ধর্মগুরু ও রাষ্ট্রপতিরূপে রাজত্ব করেছিলেন। বর্তমান দলাইলামা সেই অবতারশ্রেণীর চতুর্দশ অবতার। তিনি ১৯৩৪ সালে জন্মগ্রহণ করেন, পঞ্চমবর্ষবয়ঃক্রমকালে ঐ সম্মানিত পদে বৃত হন এবং পরিণত বয়সে তাঁর উপর আনুষ্ঠানিকভাবে তিব্বতের শাসন এবং ধর্মগুরুর কার্যভার অর্পিত হয়েছে। সমগ্র তিব্বতে দলাইলামার প্রভাব অতুলনীয়।

মন্দিরাদি-দর্শন শেষ হতে দুটা বেজে গেল। ক্ষুধাতৃষ্ণায় সকলেই অভিভূত। কীচখাম্পার চেষ্টায় গুম্ফার দ্বিতলে সামান্য স্থানের ব্যবস্থা হয়েছে। ঐ ঘরে বসে যা খাবার নিয়ে গিয়েছিলাম তা-ই কয়েকজন লামা ও ডাবার (প্রবর্তক) সঙ্গে ভাগাভাগি করে খাওয়া গেল। আমাদের

প্রদত্ত উত্তম খাবার তারা খুবই তৃপ্তির সহিত খেলে। তিব্বতে জাতিভেদ এবং খাদ্যাখাদ্যের বাদবিচার আদৌ নেই। অবশ্য লামারা অন্যান্য দেশের পুরোহিতকুলের মতন তিব্বতেও তাদের প্রাধান্য ও স্বাতন্ত্র্য বিশেষভাবে রক্ষা ক'রে চলে। তারা গৃহীদের সঙ্গে সমপর্যায়ে বা একসঙ্গে ব'সে আহারাদি করে না—এই পর্যন্ত। তিব্বতীদেব মধ্যে জাতিভেদ অর্থগত ও পদমর্যাদাগত, যেমন পাশ্চাত্ত্য দেশে বা মুসলমানদের মধ্যে রয়েছে। ধর্মগত ও জন্মগত জাতিভেদ নেই। ছুঁৎমার্গের বালাই থেকেও তিব্বত সম্পূর্ণরূপে মুক্ত।

ততক্ষণে আমাদিগকে নৃত্য দেখাবার জন্য একদল নর্তক সাজসজ্জা করে গুম্ফার প্রাঙ্গণে অপেক্ষা করছিল। আমরা আসতেই তারা ডমরু, মানুষের হাড়ের বাঁশী, ছোট ঘণ্টাবাঁধা চামড়ার খঞ্জনির মতন অন্যান্য বাদ্যযন্ত্র বাজিয়ে না।ভঙ্গিতে 'নামডং' নৃত্য (প্রেতনৃত্য) দেখাতে আরম্ভ করল। সকলেই নৃত্য করছিল ভূতপ্রেতের মুখোশ পরে। তাদের নৃত্যকলাতে বিশেষ কোন মাধুর্য বা কমনীয়তা ছিল না—বেশীর ভাগই ছুটাছুটি ও লাফালাফি; তবু নূতনত্বের জন্য দেখতে বেশ লেগেছিল। নর্তকদের বকশিস্ দিয়ে বিদায় নেওয়া গেল।

গুম্ফাব অনতিদূরে মেয়ে-লামাদের একটি মঠও আছে। সাত আট জন সন্ন্যাসিনী ওখানে বাস করে। সময়াভাবে সে মঠ দেখতে যাওয়া হয় নি। শুনা গেল, সন্ন্যাসিনীদের মঠের যাবতীয় কাজকর্ম তারা নিজেরাই ব্যবস্থা করে। এ মঠের সঙ্গে তাঁদের কোন সংশ্রব নেই।

খোচরনাথ ভুটানরাজ্যের অধীন। এখানে ভুটান-রাজকর্মচারী লাব্রাং-এর বাসভবন আছে। তিনি রক্ষিসৈন্য নিয়ে ছয় মাস এখানে এবং ছয় মাস টারচানে থাকেন। নেপাল হতে খোচরনাথের পথেই তিব্বতে প্রবেশ করতে হয়।

খোচরনাথ মঠে গুম্ফাবাসীদের সংখ্যা প্রায় পঞ্চাশ জন। তার মধ্যে পাঁচজন মাত্র লামা (বৌদ্ধ সন্ন্যাসী), বাকী সকলেই ডাবা (প্রবর্তক ও বি'ার্থী)। শীতকালে পশ্চিম তিব্বতের অন্যান্য গুম্ফা হতে অনেকে এই মঠে এসে বাস করে। তখন মঠবাসীদের সংখ্যা দুই শতেরও অধিক হয়।

ভারতে পুরাকালে গুরুগৃহে বাসের ন্যায় তিব্বত এবং বৌদ্ধধর্মাবলম্বী অন্যান্য দেশে অনেকেই বালককাল থেকে শ্রমণদের মঠে বাস করে। কয়েক বৎসর শাস্ত্রপাঠ বা অন্যান্য শিক্ষালাভের পর নিজ অভিরুচি ও প্রবৃত্তি-অনুসারে কেহ বা নিজ নিজ গৃহে ফিরে যায়, কেহ বা গুম্ফার অন্তভুক্ত হয়ে বাস করে মঠেই। শিক্ষানবিস-অবস্থায় আত্মীয়-পরিজনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ তাদের থাকে। পশ্চিম তিব্বতের গুম্ফাদিতে লামাবেশধারীর মধ্যে অনেকেই ঐ ডাবা-শ্রেণীভুক্ত। লামার (শ্রমণ) সংখ্যা খুবই কম। অনেক গুম্ফাতে একজনও লামা নেই—সকলেই ডাবা; লামা ও ডাবার বেশভূষার যে সামান্য পার্থক্য তা বিদেশীয়দের পক্ষে জানা বা বোঝা বিশেষ কঠিন। সেজন্য বৈদেশিক পর্যটকমাত্রেই তিব্বতের লামাদের সম্বন্ধে একটা ভ্রান্ত ও কাল্পনিক ধারণা পোষণ করে থাকে। তিব্বতের একতৃতীয়াংশ লোকই লামা, তাদের আচার ব্যবহার চরিত্র নিতান্ত গর্হিত ও ধর্মপন্থার বিরোধী—ইত্যাদি প্রকার প্রচার তিব্বতের লামাদের সম্বন্ধে বিশেষভাবে না জানার ফলস্বরূপ বলে মনে হয়।

লামাদের জীবন নানা সাধনা ও কঠোরতার মধ্যে গড়ে উঠে। প্রত্যেককেই ব্রহ্মচারিরূপে কোন গুম্ফাতে দশ-বার বৎসর বা ততোধিক কাল নিয়মানুবর্তী জীবনযাপন করতে হয়। পরে যেতে হয় লাসার কোনও প্রধান মঠে। কয়েক বৎসর ঐ মঠে তীব্র সাধনা ও শাস্ত্রপাঠাদিতে

অতিবাহিত করার পরে প্রধান ধর্মাচার্য উপযুক্ত প্রার্থীদের যথারীতি সংস্কৃত ক'রে সঙ্ঘের অঙ্গভুক্ত করে নেন এবং তখনই তারা উন্নীত হয় লামা-পদবীতে; তার পূর্ব পর্যন্ত সকলেই ডাবা বা প্রবর্তক। লাসাতে গিয়ে সেই কঠোরতাময় সংযত জীবনযাপন করে লামা হবার চরিত্রবল বা মনোবৃত্তি অনেকেরই থাকে না। সেজন্য দেখা যায় যে, অধিকাংশ ডাবাই কোন গুম্ফাবাসিরূপে কয়েক বৎসব কাটাবার পর বাড়ীতে ফিরে যেতে বাধ্য হয়।

তিব্বত ভারত অপেক্ষাও অনেকাংশে গরীব দেশ। দৈনন্দিন জীবন-যাত্রানির্বাহই সেখানে এক মহা দুরূহ ব্যাপার। সেজন্য ভারতের মতন অনেক ভিক্ষাজীবী তিব্বতী সন্ন্যাসীব বেশ ধারণ করে নিজেদের জীবিকার্জন করে থাকে এবং তাদের সংখ্যাও প্রচুর। লাসার প্রধান গুম্ফা হতে সদ্য-আগত শিবলিং গুম্ফার প্রধান আচার্য লামার সঙ্গে আলাপ করে জানা গেল যে, তিব্বতে ত্রিশ হাজারের বেশী আনুষ্ঠানিকভাবে দীক্ষিত লামা নেই।[১] অবশ্য লামা-বেশধারীর সংখ্যা তার অনেক বেশী নিঃসন্দেহ।

ভিক্ষুদের মতন ভিক্ষুণীদের জীবনও সংযত ও কঠোর। অনেক পর্যটক-লেখক তিব্বতী ভিক্ষুণীদের নৈতিক জীবনের উপরও কটাক্ষপাত করতে কুণ্ঠা বোধ করেন নি। অবশ্য সব দেশে সকল সম্প্রদায়ে এবং সকল স্তরের লোকের মধ্যেই ভাল-মন্দের মিশ্রণ আছে। ব্যক্তিবিশেষের ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্য সমগ্র প্রতিষ্ঠান বা সেই প্রতিষ্ঠানের আদর্শের উপর

---

১ তিব্বতের প্রধান প্রধান গুম্ফাগুলির নাম ও লামার সংখ্যা : ড্রেবং গুম্ফা—প্রায় সাত হাজার, সেরাই গুম্ফা—প্রায় পাঁচ হাজার; গাণ্ডা গুম্ফা—ন্যূনাধিক তিন হাজার; কুম্বম গুম্ফা—প্রায় ছ' হাজার ফেডেলিং গুম্ফা—প্রায় আড়াই হাজার। এতদ্ব্যতীত পশ্চিম-তিব্বত ও অন্যান্য স্থানের ছোট ছোট গুম্ফাবাসী ও পরিব্রাজক-লামার সংখ্যা প্রায় পাঁচ হাজার।

কালিমালেপন ঠিক বলে মনে হয় না। তিব্বতে বৌদ্ধধর্মের প্লাবনের পূর্বে হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতির প্রাধান্য ছিল। নির্ভরযোগ্য এমন প্রমাণ পাওয়া যায়, যাতে নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে যে তিব্বতীরা সকলেই ছিল হিন্দুধর্মাবলম্বী। হিন্দুশাস্ত্রের ব্যবস্থার ন্যায় এখনও তিব্বতে বানপ্রস্থগ্রহণের প্রথা প্রচলিত। আমাদের সঙ্গে একাধিক লামাবেশধারী বানপ্রস্থীর সাক্ষাৎ ও আলাপ হয়েছে। তাদের সঙ্গে ভিক্ষুণীবেশধারিণী স্ত্রী এবং পুত্র-সন্তানাদি। ভিক্ষুণীবেশধারিণীর কোলে সন্তান দেখেই অনেকে একটা অমূলক সিদ্ধান্তে উপনীত হয় এবং সেই ভাবেই প্রচারও করে থাকে।

এবার আমাদের প্রত্যাবর্তনের পালা। সাড়ে তিনটা নাগাত রওনা হলাম। খোচরনাথ গুম্ফার সব দেখে শুনে মনের ভিতর কেমন যেন একটা অসম্বদ্ধ সুর বেজে উঠেছিল। গুম্ফার আবহাওয়া ও আবেষ্টনী উচ্চ আধ্যাত্মিক জীবনগঠনের পথে বিশেষ অনুকূল বলে মনে হল না। কয়েকজন গুম্ফাবাসীর সঙ্গে আলাপ করে দেখেছি যে তারা শাক্যথোবা (ভগবান বুদ্ধদেব)-প্রচারিত নির্বাণের বাণী সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানে না, আর বুদ্ধদেবের অলৌকিক জীবনবেদ সম্বন্ধেও সামান্যই অবহিত।

তীর্থাপুরী

১৬ই আষাঢ়, শনিবার। সকালে আহারাদির পর কৈলাসপতির জয়ধ্বনি করে তাকলাকোট হতে চলেছি তীর্থাপুরীর দিকে। গার্বিয়াং-এর কয়েকটি ঘোড়া বদলে এখানে কয়েকটি বলিষ্ঠ তিব্বতী ঘোড়া নেওয়া হল। ঐ ঘোড়াগুলির রক্ষিরূপে দুজন তিব্বতীও চলেছে সঙ্গে। তিব্বতীরা সঙ্গে যাবে শুনে সঙ্গীরা প্রথমটা আপত্তি জানিয়েছিলেন। কারণ তাদের মেজাজ খুবই রুক্ষ—সামান্য কারণেই রক্তারক্তি করে বসে। তারা নাকি ডাকাতের দলের সঙ্গে যোগসাজশ করে যাত্রীদের সর্বস্ব লুণ্ঠন করে। কীচখাম্পা ও ঘোড়ারক্ষিদলে˜ সর্দার দরবুও তিব্বতী। তারা বললে—ভয়ের কোন কারণ নেই।

প্রথমটা চড়াই—শিবলিং গুম্ফার ধার পর্যন্ত। খোচরনাথের পথটি ডানদিকে পড়ে রইল। এগিয়ে চলেছি। কর্ণালীর অপর পারের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রামগুলি রাঙা রোদে হেসে উঠেছে। মাপ-চুর (কর্ণালীর) কা˙˙র সেতু অতিক্রম করে নদীর ধারে ধারে পথ টয়ো গ্রাম পর্যন্ত। গ্রামের ˎ কণ্ঠে রাস্তার উপরেই কয়েকজন তিব্বতী স্ত্রী-পুরুষ মদ্যপাত্রহস্তে দলের সকল তিব্বতী ও ভুটিয়াদের নিজেদের তৈরী 'ছাং' পান করিয়ে বিদায় দিল। আমাদের সঙ্গে যে দুজন তিব্বতী ঘোড়াওয়ালা যাচ্ছে তারা টয়োগ্রামের লোক। তাদের স্ত্রী ও ছেলেমেয়েদের হাতে একটি করে টঙ্কা দিতে খুবই খুশী হল। মেয়েরা˙ও সলজ্জহাসিমুখে হাত বাড়িয়ে টঙ্কা নিয়েছে। মানব-প্রকৃতি সর্বত্রই একপ্রকার। গ্রামটি ছোট ও দরিদ্র। দশ-বার ঘর লোকের বাস। গ্রামের মাঝে একটি ভগ্নস্তূপ। গাইড বললে—"ওটি

কাশ্মীর-সর্দার জোরাভার সিং-এর ছোরটেন্ (সমাধি)।" ঐ বীর সর্দার (খুব সম্ভব সপ্তদশ বা অষ্টাদশ শতাব্দীতে) পশ্চিম তিব্বতের অনেকাংশ জয় ক'রে লাডাক্ পর্যন্ত কাশ্মীর-রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। অনেক যুদ্ধের পর সর্দার গুপ্তঘাতকের গুলিতে টয়ো গ্রামে নিহত হন। জোরাভার সিং-এর অপরিসীম বীরত্বকাহিনী এখনও তিব্বতে কিম্বদন্তীরূপে প্রচলিত। অথচ তাঁর জীবনেরও এই পরিণতি !

বিষণ্ণচিত্তে ধীরে ধীরে চলেছি। মনে পড়ল বহুদিনের এক করুণ কাহিনী। মানসচিত্রপটে ভেসে উঠল এক বেদনা-মধুর ছবি। লাহোর নগরীর উপকণ্ঠে সাহাদারা নামক স্থানে মোগলবাদশা ও বেগমদেব সমাধিস্থান দেখে ফিরছিলাম—পথিপার্শ্বে দৃষ্টি পড়ল একটি ছোট দরগার উপর। স্থানটি জঙ্গলাকীর্ণ—ইমারতের চুন-বালি স্থানে স্থানে খসে পড়েছে। গম্বুজের উপর ফাটলে ফাটলে বন্য গাছপালা গজিয়ে দরগাটির প্রতি অবহেলার পরিচয় দিচ্ছে। কৌতূহল হল। চতুর্দিকে অগণিত অর্থব্যয়ে মর্মরপ্রস্তরনির্মিত অনেক সমাধিস্থান—অদূরে সম্রাট জাহাঙ্গীরের বিরাট সমাধি ! জনমানবশূন্য স্থান। কিয়ৎকাল অপেক্ষা করার পরে একজন মুসলমান ফকীরের দেখা পেলাম।

ঐ পরিত্যক্ত কবরস্থানটি ভারতসম্রাজ্ঞী নূরজাহানের। পাশাপাশি ছুটি কবর—মর্মরশিলাচ্ছাদিত। একটি নূরজাহানের, অপরটি তাঁহার প্রিয়তমা কন্যা লয়লী বেগমের। প্রথমটির উপর নূরজাহানের স্বরচিত ফারসী বয়েত খোদিত। ফকীর সাহেব পড়ে শোনালেন—

"বর্ মজ্ হারে মা গরীবাঁ নে চেরাগে নে গুলে,
নে পরে পরত্তানা সুজদ্ নে সদা এ বুলবুলে।"

বয়েতটির ভাবার্থ—আমি অতি দীনহীনা; মৃত্যুর পর আমার কবরের

উপর কোন দীপ যেন জ্বালান না হয়, আর ফুল দিয়েও আমার কবর যেন সাজান না হয়, এমন কি একটি জোনাকীও যেন সেখানে দীপ্তি না দেয়, কোন পাখীও যেন সেখানে গান না করে।

সারাটি প্রাণ মর্মান্তিক বেদনায় আর্তনাদ করে উঠল। একি দৈবী মায়া! কেনই বা এ অনুপমরূপসৃষ্টি, আর কেনই বা তার এ শোচনীয় পরিণাম! নূরজাহানের অলোকসামান্য দৈহিক সৌন্দর্যের কথাই জগৎ জানে, কিন্তু তার মনের সন্ধান কেউ পায় নি। এ দুটি কথার মধ্যে তার মনের এমন একটি স্বর্গীয় রূপের ব্যঞ্জনা রয়েছে, যা ম্লান করে দিয়েছে তার দেহের অতুলনীয় রূপমাধুরীকে।

খানিকটা এগুবার পরেই মানস-সরোবর হয়ে কৈলাস যাবার পথ-রেখা অন্যদিকে চলে গল। সাধারণতঃ যাত্রীরা ঐ পথেই যায়। আমরা আগে যাচ্ছি তীর্থাপুরী। সামনে একটি ক্ষুদ্র পার্বত্য নদী—গারু-চু (চু শব্দের অর্থ নদী)। উপরে কাঠের সেতু। উপলময় বেলাভূমি। আজ আট-নয় মাইল মাত্র যেতে হবে।

পরিচ্ছন্ন আকাশে প্রখর রৌদ্রের মেলা। সামনে যতদূর দেখা যায় —নীল আকাশতলে কেবল দিগন্তচুম্বী বৃক্ষলতাহীন ধূসর পর্বতমালা। নূতন দেশের সবই কেমন নূতন অথচ সুন্দর! বৃক্ষলতাহীন পর্বত-পাহাড়, খরস্রোতা ছোট ছোট নদী, তৃণবিহীন প্রস্তরসমাকীর্ণ নদীর উপকূল, শ্যামলশোভাশূন্য কণ্টকগুল্ম-আচ্ছাদিত সীমাহীন মালভূমি, জনপ্রাণি-বিরল পথ—নিবিড়নিস্তব্ধতাময় দেশটি। কোথাও দু-একটি অজানা পাখী ডেকে ডেকে যাচ্ছি আকাশপথে। সবই মনের উপর গভীর দাগ কেটে যায়। খানিক দূরে 'রিঙ্গুং' গ্রাম। পাশ দিয়ে চলে গেছে মানস-সরোবরের পথ।

সাড়ে তিনটা নাগাত কর্ণালীর এক বিস্তীর্ণ চড়াতে সে রাত্রির মতন আমাদের তাঁবু পড়ল। ঘোড়া-খচ্চরগুলি ছুটাছুটি করছে। গাইডের তাঁবু হ'তে কেউ গেল ঘুঁটে কুড়াতে, জল আনতে, জানোয়ারগুলিকে চরাতে। বেশ খট্‌খটে রোদ। তাঁবুর ঠিক বিপরীত দিকে দূরে চির-তুষারাবৃত গুরলামান্ধাতা-শ্রেণী পড়ন্ত রোদে রঙ্গীন হয়ে উঠেছে।

তিব্বতে সাড়ে আটটার আগে ঠিক সন্ধ্যা হয় না। আকাশ বেশ পরিচ্ছন্ন থাকলে রাত নয়টাতেও কেমন একটা উজ্জ্বল চোখঝলসান আভা দেখতে পাওয়া যায়। আজ পূর্ণিমা। দিনের শেষ-আলোর সঙ্গে পূর্ণ-চন্দ্রালোকের স্নিগ্ধ-মধুর মিলন!—অগণিত নক্ষত্র-খচিত সুনীল আকাশতলে চিরহিমানী-মণ্ডিত গুরলামান্ধাতা চাঁদের আলোকে মধুময় হয়ে উঠেছে। আকাশে এমন দীপ্তি যে তারাগুলি ম্লান। নিস্তব্ধ নিশীথে চারিদিকে প্রকৃতির রোমাঞ্চকর সৌন্দর্যমেলা। এমন মাধুর্য, এমন কমনীয়তা, এমন পরিপূর্ণ প্রশান্ত পরিবেশ ইতঃপূর্বে কখনও দেখি নি! অনেক রাত পর্যন্ত তাঁবুর খোলা দরজা দিয়ে মুগ্ধনেত্রে চেয়ে রইলাম মান্ধাতা পর্বতের দিকে। এ যেন দেবলোক!

রাত্রি বাড়ার সঙ্গে কন্‌কনে শীতে আড়ষ্ট করে ফেলছিল। সমস্ত গরম কাপড়কম্বল চাপা দিয়েও স্বস্তিবোধ হচ্ছিল না। সকালে উঠবার তাড়াতাড়ি ছিল না। কিন্তু একটু রোদ উঠার সঙ্গেই কোথা থেকে অসংখ্য মশায় তাঁবু ছেয়ে গেল। চৌদ্দ হাজার ফুটে তিব্বতে—যেখানে শীতকালে পনর-বিশ ফুট বরফ স্তূপীকৃত হয় সেখানে মশা—এ যে কল্পনার অতীত! বেশ বড় বড় মশা। সহজাত সংস্কারবশে তারা যখন নরশোণিত-পানে মত্ত হয়ে গেল, তখন তাদের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দেহের আর অবকাশ রইল না।

· বেশ আরামদায়ক রোদ। নির্মল আকাশে প্রাণবন্ত রৌদ্রের খেলা—স্নিগ্ধ ও দীপ্ত। ন'টার পরে আহারাদি শেষ করে তাঁবু গুটিয়ে যখন যাত্রার পালা তখন দেখা গেল যে, তাকলাকোটের দুটি ঘোড়া নেই। পালিয়েছে, কিম্বা ডাকাতে নিয়ে গেছে। ডাকাতরা সুবিধে পেলেই সহায়হীন যাত্রীদের ঘোড়া নিয়ে সরে পড়ে। তিব্বতে আইনকানুন রাজা-উজির আছে বলে কিছু বুঝা যায় না। লুটতরাজের দেশ। সেজন্য ঘোড়াখচ্চর চরবার সময় রাত্রেও সশস্ত্র পাহারা রাখতে হয়। আর কখন যে তাঁবু আক্রমণ করে মেরে কেটে সব লুটে নিয়ে যাবে তারও কোন স্থিরতা নেই। আমরা তার জন্য যথেষ্ট তৈরী হয়েই এসেছিলাম। প্রতি রাত্রেই তাঁবুর সামনে বন্দুকের ফাঁকা আওয়াজ করা হত আর সশস্ত্র পাহারার ব্যবস্থাও ছিল। হিংস্র জন্তুর ভয় তত নেই কিন্তু হিংস্র মানুষের ভয় ভীষণ।

অনেক সন্ধানেও ঘোড়া দুটিব কোন খোঁজ পাওয়া গেল না। কীচখাম্পা একজন তিব্বতী ঘোড়াওয়ালাকে পাঠিয়ে দিল তাকলাকোটের দিকে। আমরা ছিবরা অভিমুখে রওনা হয়েছি। কর্ণালীর ধারে ধারে পথ। উপরে সূর্যালোক-উদ্ভাসিত আকাশের চন্দ্রাতপ—বামে দীর্ঘ চরাভূমির পরেই কল্লোলমুখরা খরস্রোতা নদীটি। পরপারে নাত্যুচ্চ নগ্ন পর্বতশ্রেণী—সামনে দৃষ্টিরেখার শেষপ্রান্তে আর একটি উচ্চ পর্বত ভ্রূকুটি করে দাঁড়িয়ে। দক্ষিণে ও পশ্চাতে দূরবিন্যস্ত পর্বতমালা। বৃত্তাকারে ঘেরা পর্বতশ্রেণীর দিকে তাকিয়ে মনে হয় চারিদিকই শত্রুপরিবেষ্টিত। এসব তো অতিক্রম করতে হবে!

নদীর তটভূমির উপর দিয়ে আন্দাজ দু মাইল এসেছি। এমন সময় এক আকস্মিক বিপদ সকলকে হতভম্ব করে ফেলল। সোজা পথে যাবেন

ভেবে অরুণ বাবুকে পুরোবর্তী করে ঘোড়সওয়ারীরা চলেছিলেন নদীর ধার ঘেঁসে চরার উপর দিয়ে। হঠাৎ অরুণ বাবুর ঘোড়ার সামনের পা দুটি হাঁটু পর্যন্ত ঢুকে গেল চরার নরম দামের ভিতর—সওয়ার একেবারে ছিট্‌কে পড়ে গেল ঘোড়ার মাথার উপর দিয়ে। খুব ভাল ঘোড়সওয়ার ছিলেন বলে অতর্কিতভাবে পড়ার সময়ও অরুণ বাবু কতকটা সামলে নিয়েছিলেন, নইলে ঘাড় চুরমার হয়ে যেত। সওয়ারমুক্ত হয়ে ঘোড়াটা খুব ধ্বস্তাধ্বস্তি করে কোন রকমে উঠে ভয়ে একেবারে বিপরীত দিকে ছুটেছে। ঐ ঘোড়াটাকে ছুটতে দেখে পেছনের সমস্ত সওয়ারী ও বোঝাবাহী ঘোড়াগুলি বিশৃঙ্খলভাবে ত্রাসে চিৎকার করে এদিকে সেদিকে দৌড়াতে শুরু করল। চকিতে এক মহা হুলস্থূল ব্যাপার! ঘোড়াগুলিকে শান্ত করতে খুবই বেগ পেতে হয়েছিল। সর্দার দরবুব অসীম সাহসিকতায় অনেক কষ্টে অরুণ বাবুর ঘোড়াকে ধরা সম্ভব হয়।

ঘোড়া পেয়ে অরুণ বাবু চেপে বসলেন। কর্ণালীর উপত্যকার ভিতর দিয়ে উঁচুনীচু পথ—নিস্তব্ধ জনমানবশূন্য। গতকল্য তাকলাকোট ছেড়ে পেয়েছিলাম টয়ো গ্রাম। তার পরে এ-দুদিনের মধ্যে লোকালয়ের চিহ্নমাত্র দেখতে পাই নি। না একটা পাখী। অদ্ভুত স্থান—উপকথার ঘুমন্ত দেশের মতন। দুপুরে রোদের তেজ অতি প্রখর। চৌদ্দ হাজার ফুট উচ্চ স্থানেও ঘর্মাক্তকলেবরে চলতে হচ্ছে। রাত্রে তেমন-ই বিপরীত ঠাণ্ডা—তাপমানযন্ত্রের পারা নেমে যায় ফ্রিজিং পয়েন্ট-এর নীচে।

চার ঘণ্টা পথ চলার পর অর্থাৎ প্রায় আট মাইল কর্ণালীর ধারে ধারে এসে এবার কর্ণালীকে ছাড়তে হল। দু-পর্বতের মধ্যবর্তী এক সংকীর্ণ পথে অগ্রসর হচ্ছি। পাশেই খরস্রোতা নির্মলসলিলা একটি ক্ষুদ্র নদী। পর্বতের পাদমূল ঘেঁসে পথ। ঠিক উপরেই বিরাট উন্মুক্ত পাথরগুলি

নিরালম্ব হয়ে যেন কোন চুম্বকের আকর্ষণে ঝুলছে। বুঝিবা সামান্ত শব্দের স্পন্দনেই পাথরগুলি স্থানচ্যুত হয়ে আমাদের চাপা দেয়। উপরের দিকে তাকাতে ভয় হয়। নীচের দিকে মাথা গুঁজে চলেছি। কোন রকমে যতই এগুচ্ছি ততই বাড়ছে পথের দুর্গমত্ব। এবার চলেছি নদীটির জল ছুঁয়ে ছুঁয়ে উপলপরিপূর্ণ অতি সংকীর্ণ পথে। কষ্টের চূড়ান্ত। পাথরে ঠুকে ঠুকে পাগুলি যেন অসাড় হয়ে গেছে। পথের নিত্যনূতন দুর্গমতা। বিপরীত দিকের পর্বতগুলির কঙ্কালসাব নগ্ন চেহাবা দেখে ভয়ের চাইতে সমবেদনাই হচ্ছিল বেশী।

ঐ বিপদসঙ্কুল পথটি কোন প্রকারে অতিক্রম করে চারটে নাগাত ছিব্‌রাতে সেই ছোট নদীটির ধাবে তাঁবু ফেলা গেল। চারিদিকেই উচ্চ পর্বতের আবেষ্টনী। নদীব তীরে সবুজ ঘাস। ঘোড়াগুলি আনন্দে হ্রেষারব করে ঘাস খাচ্ছে। খানিক পবে পলাতক ঘোড়া দুটিকে নিয়ে ঘোড়া-ওয়ালা হাজির হল। তারা পালিয়ে গিয়েছিল তাকলাকোটে—নিজেদের বাড়ীতে। কষ্টের হাত থেকে পরিত্রাণ পেতে সকলেই চায়। ঘোড়াগুলি বুঝেছিল যে তাদের টেনে নিয়ে যাচ্ছে সুদীর্ঘ দুঃখের পথে।

সন্ধ্যার একটু পূর্বে লামাবেশধারী তিব্বতী স্ত্রী-পুরুষকে তাঁবুর দিকে আসতে দেখে অবাক্ হয়ে গেলাম। জনমানবহীন দেশে মানুষের মুখ দেখে আনন্দ না হয়ে ভয়ই হল বেশী। শুনেছিলাম ডাকাতেব দলের লোকেরা নাকি ওরূপ ছদ্মবেশে দিনের বেলায় সব দেখে শুনে যায়। ঐ মূর্তি দুটির আবির্ভাব অশুভই মনে হল। গাইড এগিয়ে গিয়েছে। খানিক কথাবার্তা বলে এসে খবর দিল যে তারা দুজন ভিখারী—ভিক্ষাপ্রার্থী। জানা গেল, তারা বানপ্রস্থ অবলম্বন করে এইভাবে ভিক্ষুজীবন যাপন করছে। ভালো কথা। কিছু ছাতু গুড় ও একটি করে সিগারেট

দিতেই খুশী হয়ে চলে গেল। কিন্তু বেশী দূর গেল না। নিকটস্থ পাহাড়ের উপর উঠে ঘুঁটে জ্বালিয়ে ঘুরে ঘুরে ঘণ্টা ও ডমরু বাজিয়ে খুব উচ্চৈঃস্বরে কি-সব মন্ত্র পাঠ করতে লাগল। ঐ সব মন্ত্রপাঠ ও প্রক্রিয়া নাকি ভূত তাড়াবার জন্য। তিব্বতীদের ভূতের ভয় ভীষণ! তাদের ধারণা যে, ভূত-প্রেত সর্বত্রই ঘুরে বেড়ায় এবং সুবিধা পেলেই ঘাড়টি মটকে দেবে। সন্ধ্যাবেলায় বন্দুকের আওয়াজ করা হল। সারারাত ঐ দুটি প্রাণীর উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখারও ব্যবস্থা হয়েছিল।

রাত্রে শীতে সকলেই একেবারে জড়সড়। ঘুমুতে পারা যায় নি। হাড়ের ভিতর পর্যন্ত কাঁপিয়ে দিয়েছে। ভোর বেলা ডাঃ দে তাপমানযন্ত্রে দেখলেন—তাঁবুর ভিতর ২৮° ডিগ্রী! বিশ্বাসই হচ্ছিল না। কিন্তু পেয়ালার জল জমে বরফ হয়ে গেছে দেখে সন্দেহের আর কোন অবকাশ রইল না। সাড়ে চৌদ্দহাজার ফুটেই এই! প্রায় উনিশ হাজার ফুটে যে কী অবস্থা হবে তা-ই ভেবে সকলকার মুখ শুকিয়ে গেছে। দুর্গাত্মানন্দজী একটি গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললেন—"কি আর হবে। রক্তও জমে বরফ হয়ে যাবে।" বলেই লেপটা ভাল করে মুড়ি দিয়ে পাশ ফিরে শুয়ে পড়লেন।

আজ চৌদ্দ মাইলের পড়াউ। গন্তব্যস্থান 'ইউপ্‌চা'। গাইড বললে, রাস্তার অবস্থা ভীষণ। শেষদিকটায় জল মোটেই পাওয়া যায় না। ইউপ্‌চাতেও একটি মাত্র ছোট ঝরনা। সাড়ে দশটা নাগাত বেরিয়ে পড়েছি। প্রথমেই হাজার ফুটের চড়াই। পথের চিহ্নমাত্র কোথাও নেই। দিকনির্ণয়কারী পর্বতশিখর লক্ষ্য করে সোজা এগিয়ে চলতে হয়—এই নিয়ম। তিব্বতে পথঘাট কোথাও কিছু নেই। পথচিহ্নহীন স্থানে পথ করে এগুতে হয় কোন পর্বতশিখর লক্ষ্য করে। চড়াইটির পরেই খাড়া

উৎরাই। তিনটে পর্যন্ত প্রস্তরময় এই চড়াই-উৎরাই করে আসা গেল অপেক্ষাকৃত সমতল ভূমিতে। নাম—'লাংছু'।

এগিয়ে চলেছি। দূর থেকে দুজন তিব্বতীকে দেখা গেল অনেক ভেড়া-বকরী চরাচ্ছে। গাইড্ এদের কাছে গিয়ে পথের সন্ধান নিল। একটি পর্বত উল্লঙ্ঘন করে সামনে মালভূমিতে দেখা যাচ্ছিল তিন-চারটি কাল তাঁবু। ঐ তাঁবুগুলিই তিব্বতীদেব ঘরবাড়ী সব। স্থান হতে স্থানান্তরে যাবাব পথে—যেখানে জল ও ভেড়া-বকরী চরাবার মতন প্রচুর ঘাস দেখে সেখানেই—তিব্বতীবা তাঁবু ফেলে কিছুদিন বাস করে, আবার চলে। পশ্চিম তিব্বতের অনেক লোককেই বৎসরের অধিকাংশ সময় ব্যবসায়সম্পর্কে এবং গৃহপালিত পশুগুলির পালনের জন্য দেশের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত পরিজনবর্গ ও অস্থাবর সম্পত্তি নিয়ে ঘুরে বেড়াতে হয়।

সাধারণ তিব্বত-ভ্রমণকারী ও বৈদেশিক পর্যটকগণের নিকট ঐ জাতীয় ঘুরে-বেড়ানো তিব্বতীগণ যাযাবর নামে পবিচিত। প্রকৃতপক্ষে তারা যাযাবর নয়। ঘব-বাড়ী ও স্থায়ী বাসস্থান, স্থাবর-সম্পত্তি তাদেরও আছে। কিন্তু কঠোর দারিদ্র্য এ প্রাকৃতিক দুর্যোগের তীব্র তাড়নায় প্রপীড়িত হয়ে আত্মরক্ষা ও জীবিকা-অর্জনেব জন্য বাধ্য হয়ে তাদের ঘুরে বেড়াতে হয় নানা স্থানে। তিব্বতে দারিদ্র্যেব নির্যাতন যে কত ভীষণ, তা যাঁরা তিব্বতীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হবার সুযোগ পেয়েছেন তাঁরাই জানেন।

কালো তাঁবুগুলির পাশ দিয়ে চলেছি, এমন সময় বাঘের মতন বড় বড় চারটি তিব্বতী কুকুর তাঁবু থেকে বেরিয়ে এসে আমাদের তাড়া করল। ভীত ঘোড়া-খচ্চর ও তাদের রক্ষিদল পালাচ্ছিল এদিক সেদিক।

কুকুরগুলি এমনই হিংস্রভাবে আমাদের আক্রমণ করল যে, তাদের কবল থেকে রক্ষা পাওয়া অসম্ভব। কীচথাম্পা তখন বন্দুক তুলে ধরে খুব চেঁচিয়ে তাঁবুওয়ালাদের কুকুর সামলাতে বলল ; কিন্তু কে কার চিৎকার শোনে ! কিন্তু কুকুরগুলিকে মেরে ফেলা হবে বলে, শেষ সাবধানবাক্য শোনাতেই চার-পাঁচ জন তিব্বতী বেরিয়ে এসে শিস্ দিয়ে ডেকে কুকুরগুলিকে শান্ত করল। ব্যাপারটা কিন্তু সেখানেই মিটল না। গুলি ক'রে কুকুর মারা হবে বলাতে, দশ-বার জন তিব্বতী স্ত্রীপুরুষ দলবদ্ধ হয়ে আমাদের আক্রমণ করলে। তাদের হাতে লম্বা দা-এর মতন তলোয়ার। বাক্‌যুদ্ধ ও আস্ফালন এমন গুরুতর আকার ধারণ করল যে, বুঝিবা রক্তারক্তি-কাণ্ড হয়ে যায়। অরুণ বাবু তাঁব রাইফেল্ লোড্ করে নিলেন, কীচথাম্পা ও দরবু বন্দুক উঁচিয়ে দাঁড়াল। শেষটায় বোধ হয় আমাদের আগ্নেয়াস্ত্রগুলি ও দল ভারী দেখে তিব্বতীরা গালাগাল করতে করতে ঢুকে পড়ল তাঁবুতে। ঐ ঝগড়ার সময় তিব্বতীদের হিংস্র চেহারা যে কত ভীষণ বুঝতে পারা গেল।

যদিও ঐ তাঁবুগুলির কাছে প্রচুর জল এবং তাঁবুফেলার মতন যথেষ্ট স্থানও ছিল, কিন্তু ঐ ঝগড়ার পরে ওখানে রাতকাটান সমীচীন মনে না করে আমরা এগিয়ে চললাম ইউপ্‌চা-র দিকে। আরও যেতে হবে তিন-চার মাইল। ইউপ্‌চায় জল পাওয়া সম্বন্ধে গাইড সন্দিহান হয়েছে। সামনেই একটি খাড়া চড়াই। তার পরে দুই পর্বতের মধ্যবর্তী সংকীর্ণ বর্ত্ম অতিক্রম করে সামনে পাওয়া গেল বিস্তীর্ণ মালভূমি। মনোরম প্রাকৃতিক শোভা। পর্বতের চূড়াগুলি দূরে অতি-দূরে সরে গিয়েছে। পর্বতপ্রাচীরে আমাদের ক্লান্ত দৃষ্টি আর প্রতিহত হচ্ছে না। চোখগুলি বিরাট অবকাশের মধ্যে ছাড়া পেয়ে মুক্তির আনন্দ সম্ভোগ করছে। এগিয়ে

চলেছি। যেতে যেতে একটু থামি। চোখভরে দেখে নেই। দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে আবার চলি। দেখে দেখে বেড়ে যায় অতৃপ্তি। যা দেখছি—তা জীবনে আর দেখতে পাব না। মনে ছবি এঁকে রাখি।

'ডামা' নামক কাঁটাঝোপে আচ্ছাদিত মালভূমি। পথের রেখামাত্রও নেই। শুধু সামনে এগিয়ে যাই। ঝোপের কাঁটায় সর্বাঙ্গ রক্তাক্ত হচ্ছে। একটা অনির্বাণ আনন্দের নেশায় মেতে আছি। আনন্দ ও দুঃখ পরস্পর যেন গা ছুঁয়ে পাশাপাশি চলেছে। প্রায় দুটি ঘণ্টা একভাবে অজানা পথে চলার পর গাইড ভীত হয়ে বলল—পথ হারিয়ে গেছে। এদিকে সন্ধ্যার অন্ধকারও ঘিরে আসছিল চারিদিক থেকে। এখন উপায়? কাঁটাবনে আমাদের অপেক্ষা করতে বলে গাইড দু-তিন জন লোক নিয়ে পথ ও জলের সন্ধানে এদিক সেদিক খোঁজাখুঁজি করতে গেল। ক্লান্তি তৃষ্ণা ভয় উদ্বেগ উৎকণ্ঠা। এদিকে হিমকণাযুক্ত হাওয়া বয়ে চলেছে সর্বাঙ্গ কাঁপিয়ে। আসন্ন বিপদ—আমরা যেন ধ্রুব মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়েছি। অতগুলি লোক আর সঙ্গী পশুগুলি জল-অভাবে যে মারা যাবে! দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তো রাতকাটান যাবে না। সকলেরই মুখ শুকিয়ে গেল; বিপদে ধৈর্য ও উদ্যম চাই-ই। নিশ্চেষ্ট না থেকে আমি একজন ঘোড়াওয়ালাকে সঙ্গে নিয়ে চললাম বিপরীত দিকে—আশ্রয়ের সন্ধানে। এদিক সেদিক খানিকটা ঘুরে একটু শুকনো পার্বত্য ঝরনার খাত দেখতে পেয়ে সঙ্গী লোকটির সাহায্যে পাথর সরিয়ে শুকনো বালি খুঁড়তে লেগে গেলাম। দেড় দুই ফুট খোঁড়ার পরেই বালি চুইয়ে সামান্য জল আসতে লাগল।

যত খুঁড়ছি ততই জল বাড়ছে—দেখে ভরসা হল। সকলকে ডাকাডাকি করে সেখানে জড় হয়েছি। ইঞ্জিনিয়ার বাবুর তত্ত্বাবধানে ওখানে

এক প্রকাণ্ড গর্ত খুঁড়ে ফেলা গেল—তখন প্রচুর জল। ঐ জলের পাশেই কাঁটা জঙ্গল কেটে পরিষ্কার করে সেরাত্রির মতন তাঁবু পড়ল। রাত্রে প্রাণান্তকর ঠাণ্ডা। শ্রীভগবানের দয়ায় কোনও প্রকারে তাঁবুর নীচে তো আশ্রয় পেয়েছি! কৃতজ্ঞতায় প্রাণ উচ্ছলিত হয়ে গেল।

ঐ শুকনো ডাঙ্গায় জল বের করার ব্যাপারটি নিয়ে তিব্বতী ও ভুটিয়াদের তাঁবুতে মহা চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। লামা তাঁর সিদ্ধাইশক্তি-বলেই জল বের করে সকলকে বাঁচিয়েছেন—এই তাদের দৃঢ় বিশ্বাস। তিব্বতীরা লামাদের খুবই ভীতিজড়িত শ্রদ্ধার চক্ষে দেখে। তাদের ধারণা—যিনি যত বড় লামা তাঁর অলৌকিক শক্তিও তত বেশী। বৃষ্টি বন্ধ করা, রোগসারান, ভূততাড়ান, মন্ত্র জপে প্রাণে মেরে ফেলা, পাগল করে দেওয়া, আরও কত কি যে তিব্বতী লামারা করতে পারে তার ইয়ত্তা নেই! এই সব বুজরুকি দেখিয়েই তিব্বতের মতন গরীব দেশেও ভিক্ষুক লামারা নিরন্ন দেশবাসীর রুধিরশোষণদ্বারা বেশ স্বচ্ছন্দ জীবন-যাত্রা নির্বাহ করছে। তিব্বতীরা, এমন কি হিমালয়ের উত্তরাংশের ভুটিয়া অধিবাসিগণও ঐ লামাবেশধারীদের খুবই ভয়ের চক্ষে দেখে। তারা যখন ঘণ্টা ডমরু বাজিয়ে হাড়ের মালা গলায় দিয়ে, গম্ভীর শব্দে মন্ত্র আওড়াতে আওড়াতে কারো বাড়ীতে ভিক্ষার জন্য এসে হানা দেয়, তখন গৃহস্থ ভয়ে ভয়ে নিজের মুখের গ্রাসও তাদের হাতে তুলে ধরে। মরার মাথার খুলি, বিড়াল বানর প্রভৃতি জন্তুর হাড় এবং তুকতাক্ করার নানা ভস্মাদি বোঝাই একটা ঝোলা কাঁধে নিয়ে বিকট চিৎকার ক'রে ডমরু বাজিয়ে যখন প্রেতনৃত্য করতে থাকে, তখন তাদের ভয়ঙ্কর মূর্তি দেখলেই প্রাণে দারুণ ভীতির সঞ্চার হয়। বশীকরণ, বাজীকরণ, উচাটনের মন্ত্র ও নানা প্রক্রিয়াদি তারা জানেও। অনেকের কাছেই

শুনেছি—ভিক্ষা না দেওয়ার ফলে তারা মন্ত্রাদির দ্বারা লোককে উন্মাদ করে দিয়েছে, গরু ছাগল মেরে ফেলেছে। অন্ততঃ সাধারণের এই বিশ্বাস।

রাত্রে তাঁবুর ভিতরই ২৭° ডিগ্রি ঠাণ্ডা। সকালে সূর্যকিরণে চারিদিক হাস্যোজ্জ্বল; দূরস্থিত গুরলামান্ধাতার তুহিনাবৃত শৃঙ্গ স্বর্ণবর্ণে রঞ্জিত। চারিদিক নীরব নিথর। সকলেই তাঁবু থেকে বেরিয়ে মিষ্টি রোদ সম্ভোগ করছি। দূরে পাহাড়ের চূড়ায় একটি জঙ্গলী ঘোড়া দেখা গেল। পূর্বদিনই গাইড বলেছিল—তীর্থাপুরীর পথে বন্য ঘোড়ার দল দেখা যাবে। দূরবীনের সাহায্যে ঘোড়াটিকে দেখলাম—বেশ বড় ও বলিষ্ঠ, রং লাল-সাদা-মেশান। ভয়চকিত দৃষ্টিতে তাঁবুর দিকে খানিকক্ষণ দেখে দেখে পালিয়ে গেল। আমাদের তাঁবুর পাশেই ডামা জঙ্গলের মধ্যে অনেক বন্য রাজহাঁস সঙ্গে কাচ্চাবাচ্চা নিয়ে নির্ভয়ে চরে বেড়াচ্ছে। রাজহাঁসগুলি বেশ বড়।

আজ পড়াউ ষোল-সতের মাইলের বেশী। যেতে হবে 'ডুলচু'। পথে কোথাও জল পাওয়া যাবে না। পথও খুব দুর্গম। দশটার মধ্যে আহারাদি করে বের হয়েছি। আহার অবশ্য নামে মাত্র। বায়ুচাপের স্বল্পতা ও অতিরিক্ত ঠাণ্ডার দরুন চাল ডাল সুসিদ্ধ হয় না। ৮০ ডিগ্রি উত্তাপেই সব কিছু টগ্‌বগ্ করে ফোটে কিন্তু সবই থেকে যায় আধসিদ্ধ। প্রয়োজনবোধে ঐ খিচুড়িই দুটি দুটি খেতে হয়েছে। অবশ্য তিব্বতের জল-হাওয়ার গুণে যা খাওয়া যায় তা-ই হজম হয়ে যায়। তিব্বতভ্রমণ শেষ করে মনে হয়েছিল, তিব্বতে ভাত ডাল—আমাদের বাঙ্গালীখাদ্য রান্না করার চেষ্টা না করাই ভাল। ঐ দুটি জিনিসকে বাদ দিয়ে অন্য খাবারের উপর নির্ভর করলে অনেক ঝামেলার হাত থেকে রেহাইও পাওয়া যায়।

গাইড বলেছিল—আজ কৈলাসদর্শন হবে। সেই চিরদুর্লভ, কত যুগের আশা ও আকাঙ্ক্ষার ধন—যার জন্য এ দুর্গম পথযাত্রা, এ যন্ত্রণাজর্জর পথের প্রাণান্তকর তপস্যা—সেই রূপাতীত রূপের দর্শন! কি যেন এক অজ্ঞাত অব্যক্ত আনন্দের আকর্ষণে আত্মহারা হয়ে অভিভূতের ন্যায় চলেছি . . . ! সঙ্গী তিব্বতীদের মুখেও চলেছে—'ওঁ মণি পদ্মে হূং' মন্ত্র।

এক পর্বতে আরোহণ করতে করতে চমকে উঠলাম। ভেড়ার শিঙের মতন ঘোরান প্রকাণ্ড শিংযুক্ত একটা জন্তুর মাথা। ওজন প্রায় একমণ। আমাদের মধ্যে কেউ-ই ঐ জন্তুটি যে কি তা ঠিক নির্ণয় করতে পারছিল না। অনেক পরীক্ষা ও গবেষণার পর তারাপ্রসন্ন বাবু বললেন—আইবেক্স-এর মাথা হতে পারে। তিব্বতের অরণ্যজন্তুর মধ্যে ইয়াক ঘোড়া নানাজাতীয় চিতাবাঘ নেকড়ে আইবেক্স কুকুর ছাগল খরগোশ ও বড় বড় ইঁদুর প্রচুর। ব্রহ্মপুত্রের উৎপত্তিস্থানের নিকটবর্তী স্থানসমূহে প্রায় সতের হাজার ফুট উচ্চেও দলবদ্ধ ইয়াক দেখতে পাওয়া যায়।

চড়াই-পথে উঠছি—পর্বতের সানুদেশে এসেই এক অনির্বচনীয় অপরূপ শোভা দেখে অভিভূত হয়ে গেলাম। চারিদিকে বৃত্তাকারে উদার পর্বত-মালা। দৃষ্টিরেখার শেষ সীমা পর্যন্ত হিমালয় ও তিব্বতের শৈলশ্রেণী অবিচ্ছিন্নভাবে বৃত্তাকারে মিলিত হয়েছে—যেন একই পর্বতশ্রেণী, একই জাতি, একই সভ্যতা-সংস্কৃতি অনাদিকাল থেকে সঙ্গত হয়ে আছে। মধ্যাহ্ন-সূর্যলেখায় প্রতিফলিত হয়ে সবই দেখাচ্ছিল স্বর্ণময়। এ যেন রূপকথার অলোকসামান্য স্বপ্নরাজ্য। এই বিপুল পরিবেশের মধ্যে আত্মস্থ হয়ে দাঁড়ালে নিজ ক্ষুদ্রত্ব মিশে এক হয়ে যায় বিরাটের সঙ্গে।

সাত-আট মাইল পথ অতিক্রম করে ক্রমে এক পর্বতশিখরে উঠেছি। ঠিক সামনেই দেখা গেল শুভ্রতুষার-মণ্ডিত কৈলাসশৃঙ্গের বিরাট চূড়া।

এতকাল যা ছিল কল্পনা ও ধ্যানের বস্তু, তা আজ মূর্ত্ত হয়ে উঠেছে সামনে। ভক্তিবিহ্বলচিত্তে জয়ধ্বনি করে ভূলুণ্ঠিত হয়ে দেবদেবের উদ্দেশ্যে সেখানেই প্রণত হলাম। হৃদয়ের প্রতি তন্ত্রী বেজে উঠেছে এক অজানা আনন্দের সুরে। রৌদ্রোজ্জ্বল সুনীল আকাশ স্পর্শ করে বিভূতিভূষিতাঙ্গ যোগিবর যেন উন্নতশিরে বিরাজমান। মুগ্ধনেত্রে সেই অনুপম রূপমাধুরীর দিকে তাকিয়ে রইলাম। ত্রিলোচনের কৃপানেত্রের আশিস-চুম্বনে সর্বাঙ্গ মুহুর্মুহুঃ রোমাঞ্চিত হচ্ছিল। পরিপূর্ণ আনন্দ। উঠতে আর ইচ্ছা হয় না। আপন মনে গাইতে লাগলাম—"আজি কি হরষসমীর বহে প্রাণে, ভাগবত মঙ্গল-কিরণে . . .।" জনৈক সহযাত্রী ভক্তিবিহ্বলচিত্তে পাঠ করছেন শিব-মহিম্নঃ স্তোত্র। শেষে—

"তব তত্ত্বং ন জানামি কীদৃশোঽসি মহেশ্বর।
যাদৃশোঽসি মহাদেব তাদৃশায় নমো নমঃ॥"

প্রার্থনা ও পাঠ শেষ করে সকলে প্রণতপ্রাণে বসে রয়েছে। যেস্থান হতে প্রথম কৈলাসদর্শন হয়, তারই পাশে প্রস্তরস্তূপ সজ্জিত ছিল। সঙ্গী তিব্বতী ও ভুটিয়ারাও কৈলাসপতির উদ্দেশে শ্রদ্ধা নিবেদন করে নিজেদের রীতি অনুসারে উচ্চৈঃস্বরে নানা মন্ত্র পাঠ করছে। এক মহা জমজমাট ভাব।

প্রথম দর্শনের স্থান হতে সরল রেখাপথে কৈলাসশিখরের দূরত্ব বোধ হয় পনর-বিশ মাইল মাত্র। কৈলাসশিখরটি দেখা যাচ্ছিল ঠিক যেন বিরাট দেবমন্দিরের স্ফটিকগম্বুজ। এত স্বচ্ছ ও শুভ্র যে তার উপমা মিলে না। আর কি শান্ত স্নিগ্ধ গম্ভীর ও নয়নাভিরাম! কী অনির্বচনীয় রূপগৌরব! চিরহিমানীমণ্ডিত ঐ শুভ্র কিরীট সূর্যকিরণে উদ্ভাসিত হয়ে এক অপূর্ব মাধুর্য রচনা করেছে। আজও মনে হয় ঐ সময়টা জীবনের

এক মহাপুণ্য মুহূর্ত। এখনও শিবস্মৃতির স্পর্শ মনে এক অব্যক্ত আনন্দের স্পন্দন সৃষ্টি করে। আর মনে হয়, সেই বিরাট পুরুষ তাঁর পদতলের মধুস্পর্শে আমাদের ক্ষুদ্রত্বকে চিরমহান্ করবার জন্য যুগযুগ ধরে 'স্বে মহিম্নি' বিরাজ করছেন।...

ঐ দিব্য শিখরের প্রশান্ত শোভা! একান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও আবার পথ চলতে শুরু করতে হল। খুব খাড়া উৎরাই পথ। খানিক পরেই এক পর্বতের আড়াল হয়ে কৈলাসচূড়া আর দেখা গেল না। সারাটি মন হাহাকার করতে লাগল। ওগো প্রভু, ওগো দয়াময়, প্রাণের এ শূন্যতা পূর্ণ কর—পরিপূর্ণ দর্শন দাও। যে দর্শনের বিরাম নেই—যে মিলনে বিরহ নেই—যে প্রেমে আকাঙ্ক্ষা নেই—তা-ই প্রাণের কানায় কানায় পূর্ণ করে দাও।

পর্বতের পাদমূলে নেমেছি। সম্মুখে বহুদূরব্যাপী অনুর্বর মালভূমি। প্রস্তর বালুকা ও কণ্টকময় স্থানের উপর দিয়ে চলেছি মাইলের পর মাইল। জলকষ্টে সকলেই প্রপীড়িত। 'তুলচু' না যাওয়া পর্যন্ত তৃষ্ণানিবারণের আশা নেই।

ডানদিকে বিস্তীর্ণ প্রান্তরে দলে দলে জঙ্গলী ঘোড়া। তারা দূর হতে ভয়চকিত দৃষ্টিতে আমাদের গতিবিধি লক্ষ্য করে এক সঙ্গে ধুলো উড়িয়ে তড়িৎবেগে ছুটে পালাচ্ছে—যেন মরুভূমিতে অশ্বারোহী সৈন্যদল।

ক্লান্ত দেহে মুমূর্ষু অবস্থায় তুলচুতে এসে শতদ্রুর একটি শাখানদীর তীরে তাঁবু ফেলা হল। অনতিদূরে তুলচু-গুম্ফা। তা হোক। আমরা এখন আর কিছু চাই নে—শুধু জল আর বিশ্রাম। সামনে বিরাট মালভূমি। তারই শেষ সীমায় বরফাচ্ছাদিত কৈলাসশ্রেণী। সন্ধ্যার একটু বিলম্ব আছে। তুলচুতে পুনরায় কৈলাসদর্শন হল। তাঁবুর মুখ কৈলাসের দিকে

রাখা হয়েছে। ভিতরে বসেই বেশ দর্শন হয়। ক্রমে নেমে এল মৌন সন্ধ্যা। বাম পার্শ্বেই একটি পর্বতশ্রেণী প্রহরীর মত দাঁড়িয়ে। ডুলচুতে ডাকাত ও বন্ধ কুকুরের ভয়। রাত্রে বন্দুক ছোড়া হল।

২০শে আষাঢ়, বুধবার। ঘুমভাঙ্গার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁবুর দরজা খুলে বুভুক্ষু নয়নে চেয়ে দেখলাম। কৈলাসপর্বত ঘনমেঘে আবৃত। দর্শন হল না। একটু বেলা বাড়তে ক্রমে মেঘ সরে গেল। মেঘের ফাঁকে ফাঁকে প্রভাতসূর্য-আলোকিত কৈলাস চকিতের জন্য দেখাচ্ছিল—অতি শোভাময়। [illegible] তেমন তাড়া নেই। পড়াউ ছোট—দশ মাইল মাত্র। সকালটি বেশ লাগছে। এত কষ্ট, এত পরিশ্রম, এত তপশ্চর্যা—আজ সবই সার্থক। এখন মুখ বাড়ালেই কৈলাসদর্শন! তাঁকে এত কাছে পেয়ে বড় আপনার বোধ হচ্ছে। এই সুন্দর সকালটিকে নানাভাবে উপভোগ করছি। মন আনন্দে দুলছে। তাঁবুর ভিতর শিবের স্তবাদি পাঠ হচ্ছে। সকলেরই মন ধ্যানমৌন। ঠিক ঠিক তীর্থের মধ্যে যেন বাস করছি। প্রাণ তীর্থময়। সামনে ডুলচু-গুম্ফা। গুম্ফাবাসীদের দেখা যায়। দিগন্ত অখণ্ডে মিশে গেছে। সসীম—অসীম, ক্ষুদ্র হয়েছে মহৎ। সুন্দর—চিরসুন্দর।

ডুলচুকে বিদায়। সব কিছু পিছনে ফেলে এগিয়ে যাব সেই আকাঙ্ক্ষিতের পদতলে। সাড়ে দশটায় যাত্রা। ঘণ্টাখানেক চলার পরে ডানদিকে তীর্থাপুরী নদীর তীরে ডুলচুগুম্ফা-দর্শনে যাওয়া হল। ছোট গুম্ফা, দ্বার বন্ধ, দর্শনাদি হল না।

ডুলচুর অনতিদূরে কয়েকটি বড় বড় প্রস্রবণ আছে। তিব্বতে জনসাধারণের ধারণা—ঐ প্রস্রবণগুলিই শতদ্রুর (সাটলেজ্) উৎপত্তিস্থান। হতেও বা পারে। ডুলচুর ধার দিয়ে যে তীর্থাপুরী নদীটি বয়ে যাচ্ছে, তা শতদ্রুতেই মিশেছে।

ফিরে এসে চলেছি নদীর বাম তীরে তীরে। নদীটি অপ্রশস্ত—জলও সামান্য। কিন্তু প্রচুর মাছ—ছোট বড় নানাজাতীয়। দেখতে অনেকটা বাংলাদেশের বাটা মাছের মতন। নির্মল জলস্রোতে অসংখ্য মাছের খেলা—বেশ দেখাচ্ছিল। একটু দূরে একটি জলাকীর্ণ প্রশস্ত স্থান। অনেকগুলি সারস ও নানাজাতীয় হাঁস নির্ভয়ে চরে বেড়াচ্ছে। অত বড় সারস ইতঃপূর্বে দেখি নি। আমাদের প্রকাণ্ড দলটি সোরগোল করে খুব কাছ দিয়েই যাচ্ছে—তারা কিন্তু নির্ভয়। সমগ্র তিব্বতে পক্ষিবধ নিষিদ্ধ। তিব্বতীরা অন্য সব জন্তুর মাংসই খেয়ে থাকে, এমন কি বন্য ঘোড়া, চামরি গাই পর্যন্ত ; কিন্তু পাখীর মাংস খাওয়া মহাপাপ। শিবজী নাকি পক্ষিরূপ ধারণ করেছিলেন।

কয়েক মাইল চলেছি কাঁটা-ঝোপের ভিতর দিয়ে। বড় বড় খরগোশ-গুলি ভয়ে এদিক সেদিক ছুটে পালাচ্ছে। একস্থানে কয়েকটি চঙ্গু (বন্য কুকুর) বোঝাবাহী একটি ঘোড়াকে ঘিরে ফেললে, কিন্তু গাইডের তৎপরতায় এবং বন্দুক ছিল বলে চঙ্গুর দল ভয়ে পালিয়ে যায়। চঙ্গুগুলি পনর-বিশটা একসঙ্গে দলবদ্ধ হয়ে থাকে এবং শিকারের উপর বিভিন্ন দিক থেকে এমন অতর্কিত আক্রমণ করে যে, তাদের কবল হতে জঙ্গলী ঘোড়ারা রক্ষা পায় না। 'চঙ্গু' দেখতে কতকটা ছোট নেকড়ে বাঘের মতন।

রোদ খুব প্রখর। বায়ুর চাপের স্বল্পতার দরুন ভীষণ ক্লান্তিবোধ হচ্ছে। প্রায় ষোল হাজার ফুট উপরে উঠেছি। খরস্রোতা ক্ষুদ্র তীর্থাপুরী নদীটি কষ্টে পার হয়ে দক্ষিণ তীরে তীরে এগুচ্ছি। অসংখ্য হাঁস—ছোট ছোট ছানা নিয়ে স্রোতের জলে ভেসে যায় ; আবার উজান পথে সাঁতরে আসে। তাদের নিঃশঙ্ক খেলা দেখতে বেশ। পাখীগুলির এহেন নির্ভয় বিচরণ তাদের প্রতি কেউ হিংসা করে না বলেই সম্ভব হয়েছে।

তীর্থাপুরী

দুটি গিরিশ্রেণীর ভিতর দিয়ে নদীর ধারে ধারে খানিকটা এসেই পেয়েছি তীর্থাপুরী ও দ্রোকৃপোসার নদীর সঙ্গমস্থল। পাশেই ত্রিকোণাকৃতি প্রশস্ত ভূমিখণ্ডে তাঁবু পড়ল। তখনও অনেকটা বেলা আছে। প্রচুর ঘাস ও জল পেয়ে ঘোড়াগুলির খুবই আনন্দ। দ্রোকৃপোসার নদী পেরিয়ে তীর্থাপুরী যাবার পথ। দূরত্ব ছয় মাইল।

অতি শোভাময় স্থান। তিন দিকেই পর্বতের আবেষ্টনী। সঙ্গমের মিলনোচ্ছ্বাস পর্বতগাত্রে প্রতিধ্বনিত হয়ে মিশে যাচ্ছে অনাদি ছন্দে। গিরিগাত্রে দলে দলে অরণ্য-পায়রা উড়ে বেড়াচ্ছে।

আমরা এখন মানবসমাজ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। গত ক'দিন কোথাও লোকালয়ের চিহ্ন দেখতে পাই নি—একটি গুম্ফা ছাড়া। বড় অদ্ভুত দেশ। অথচ যেখানেই তাঁবু পড়ে, অতি অল্পক্ষণের মধ্যেই লামাবেশধারী ভিখারীর দল তাঁবু ঘিরে ফেলে। প্রকাণ্ড জিব বের করে দু হাতের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাতে দেখাতে হামাগুড়ি দিয়ে আসে একেবারে তাঁবুর সামনে। প্রকৃত বুভুক্ষু। তাদের কঙ্কালসার দেহ, কোঠরগত চোখ দেখে প্রাণ কেঁদে উঠে। তিব্বতের ভিখারীদের সম্বন্ধে অনেক কিছু শুনেছিলাম। সেজন্য আমরা এক মণ ছাতু ও গুড় সঙ্গে করে এনেছি এই দরিদ্র-নারায়ণদের জন্য, আর প্রচুর সিগারেট। তিব্বতীরা সিগারেট বিলাসের জিনিস মনে করে, কিন্তু খেতে পায় না। কতকটা ছাতুগুড় আর একটি করে সিগারেট পেলেই তারা মহা খুশী। তাদের অন্তর্দেবতা এ দীন-পূজায় প্রসন্ন হয়ে উঠেন। কত রকমেই যে তারা কৃতজ্ঞতা ও আনন্দ প্রকাশ করে। দুর্গাপ্রসন্নজী দিয়াশলাই জ্বালিয়ে তাদের মুখে যখন সিগারেট ধরিয়ে দেন, তারা অবাক বিস্ময়ে চেয়ে থাকে। কোথাও কিছু নেই—একটু ঘসলেই দপ্ করে আগুন! অল্পেই অল্পতেই এরা তুষ্ট

কিন্তু কিছু না দিয়ে ভ্রুকুটি করে গালি দিয়ে তাড়িয়ে দিলে তাঁদের আত্মসম্মানে বড় ঘা লাগে—তখন ওঠে একেবারে ক্ষিপ্ত হোয়ে। গাইড বলল, "দু বৎসর পূর্বে এক যাত্রিদল ভিখারীদের কিছু না দিয়ে গালমন্দ করে তাড়িয়ে দেয়। উপেক্ষিত ভিখারীরা ক্ষুধার তাড়নায় খাদ্যদ্রব্য জোর করে কেড়ে নেবার জন্ম দলবদ্ধ হয়ে তাঁবু ঘিরে ফেলে। রক্তারক্তি-কাণ্ড হয়ে গিয়েছিল। তিব্বতীদের ঢোলা পোশাকের ভিতর তলোয়ার লুকান থাকে। উন্মুক্ত তরবারী হস্তে তারা যাত্রিদলকে আক্রমণ করল। এক যাত্রীর মাথা বাঁচাতে গিয়ে তলোয়ারের চোট পড়েছিল আমারই হাতের উপর।" কীচথাম্পার হাতে তখনও সেই দাগ ছিল।

২১শে আষাঢ়, মঙ্গলবার। ভোরেই তীর্থাপুরী যাত্রা করেছি। দরবু একাই রইল—বোঝার ঘোড়া ও তাঁবুর প্রহরীরূপে। প্রথমেই ড্রোক্‌পোসার নদী। ঘোড়াডুবু জল। স্রোতও একটানা। নদী অতিক্রম করে যেতে হয়। ঘোড়াগুলিকে প্রথম জলে নামাতে খুবই বেগ পেতে হল, পরে সওয়ারপিঠে সাঁতরে বেশ পেরিয়ে গেল। গাইড ও তিব্বতী ঘোড়াওয়ালারা সকলেই চলেছে ঘোড়ার পিঠে। আমি পড়েছি মুস্কিলে। নদীতে এত বেশী জল ও স্রোত যে, হেঁটে পার হওয়া অসম্ভব। বাধ্য হয়ে ঘোড়ার পিঠে নদী পার হলাম। পর পর তিনটি শৈলশিরা অতিক্রম করে অপেক্ষাকৃত সমতল স্থান। সামনে কণ্টকাচ্ছাদিত বিস্তীর্ণ প্রান্তর। চারিদিকেই অলঙ্ঘ্য পর্বতমালা বৃত্তাকারে দাঁড়িয়ে আছে। পরিচ্ছন্ন আকাশ। তিব্বতীরা 'ওঁ মণিপদ্মে হুঁং' মন্ত্র গম্ভীর স্বরে জপ করতে করতে চলেছে। দলবদ্ধ বন্যকুকুর এদিক সেদিক ঘুরে বেড়াচ্ছে, কিন্তু অনেক লোক দেখে আক্রমণ করতে সাহস পাচ্ছে না।

তিব্বতীরা তীর্থাপুরীকে 'টৈতাপুরী' বলে থাকে। পুরাণে আছে—

তীর্থাপুরী

অতি পুরাকালে জনৈক অসুর অভীষ্টবরলাভের আশায় কৈলাসধামে তীব্র তপস্যায় রত হয়। দীর্ঘকাল কঠোর তপশ্চরণের পর আশুতোষ প্রসন্নবদনে সেই অসুরের নিকট আবির্ভূত হয়ে তাকে অভীষ্ট বর প্রার্থনা করতে বলেন। আনন্দে আত্মহারা অসুর মহাদেবের চরণে লুণ্ঠিত হয়ে বলল, "এই একমাত্র বর চাই যে, যার মস্তকে আমার হস্ত স্থাপন করব, সে যেন তখনই ভস্মীভূত হয়ে যায়।" ভোলানাথ 'তথাস্তু' বলে অসুরকে প্রার্থিত বর প্রদান করেন। সেই দুষ্টমতি অসুর বরের ফলাফল-পরীক্ষার জন্য মহাদেবের শি র'পরি হস্তস্থাপনেব জন্য তখনই হাত বাড়াল। ভূতভাবন মহাবিপন্ন হয়ে বেগে সে স্থান হতে প্রস্থান করেন। অসুরও তাঁর মস্তকে হস্তস্থাপনেব জন্য ছুটছে পেছনে পেছনে। ত্রিভুবন ঘুরেও মহাদেবের নিস্তার নেই—অসুন ঠিক তাঁব পিছনে রয়েছে। ত্রিলোচনের সমূহ বিপদ দেখে লোকপিতামহ ব্রহ্মা ছদ্মবেশে অসুরের সামনে এসে তাকে ইতস্ততঃ ছুটবার কাবণ জিজ্ঞাসা করেন। অসুরের নিকট সমস্ত ব্যাপার শুনে ব্রহ্মা তাকে তিরস্কার করে বললেন—"ছি! তুমি তো বড় বোকা! এ সামান্য ব্যাপাবের জন্য এত ব্যস্ত কেন? এর-ই জন্য এত ছুটাছুটি! মাথার উপর হাত দিয়ে পরীক্ষা কবতে হবে—এই তো? তোমার নিজের মাথায় হাতটি একবার বাখলেই তো বরলাভেব ফলাফল-পরীক্ষা হয়!" ব্রহ্মার মুখে এমন সহজ সমাধান শোনামাত্রই অসুর নিজের মস্তকেই হাতখানি রাখল, আর সঙ্গে সঙ্গে হয়ে গেল ভস্মীভূত। সেই অসুরই ভস্মাসুর নামে খ্যাত। তীর্থাপুরীতে ঐ অসুব ভস্মীভূত হয়। শিবের অপার-মহিমা-স্মরণে সেস্থান তীর্থে পরিণত হয়েছে।

প্রায় দুই মাইল দূর হতেই খড়িমাটির মতন ধপধপে সাদা, বৃক্ষলতা-হীন অনুচ্চ কয়েকটি পাহাড় দেখা গেল। গাইড বললে—ঐ তীর্থাপুরী।

এগুতে এগুতে সাদা পাহাড়গুলি আরও স্পষ্টতর দেখাচ্ছে। একটি পাহাড়ের পাদমূলে নানাবর্ণে চিত্রিত গুম্ফা। তিব্বতের সব গুম্ফারই রং ও কারুকার্য প্রায় একই রকম, সেজন্য গুম্ফা চিনতে বেগ পেতে হয় না।

গুম্ফার বাড়ী তিনটি শতদ্রুর দক্ষিণতীরে—একটু উপরে। অনতিদূরেই তীর্থাপুরী নদী শতদ্রুর সঙ্গে মিশেছে। গুম্ফাটি সেই সঙ্গম-স্থলের পার্শ্বেই অবস্থিত। শতদ্রুর তিব্বতী নাম 'লাংচান্ খাম্বা' বা লাংচান্-চু। গুম্ফার বাম পাশ দিয়ে নীচের দিকে গরম জলের ফোয়ারায় যাবার পথ। অনেকটা নেমে আসতে হল শতদ্রুর ধারে। এখানে শতদ্রু পঁচিশ-ত্রিশ গজ মাত্র চওড়া, কিন্তু খুবই খরস্রোতা। আরও একটু এগিয়ে, একটি সাদা প্রান্তরের মতন স্থানে অনেকটা জায়গা জুড়ে পাশাপাশি গরম জলের কতকগুলি বড় বড় ফোয়ারা। স্থানে স্থানে ফুটন্ত জলের স্রোত বয়ে যাচ্ছে। প্রায় অর্ধমাইলব্যাপী সমস্ত স্থানের মাটি (পাথর) পাউরুটীর মতন ফাঁপা ও নরম। হাঁটবার সময় দুম্ দুম্ শব্দ হয়—ভিতরটা যেন ফাঁকা। আর গন্ধকের কী তীব্র গন্ধ! ঐ আধমাইল পরিধির মধ্যে প্রস্রবণগুলি ভিন্ন ভিন্ন স্থানে কখনও ছয় মাস বা এক বৎসরের জন্য আত্মপ্রকাশ করে, আবার বন্ধ হয়ে যায়, পুনরায় দেখা দেয় নূতন স্থানে। ঐ স্থানটি মাঝে মাঝে ঢিপির মতন উঁচু। একটি খুব বড় ফোয়ারা দেখা গেল শতদ্রুর জলরেখার পাঁচ-সাত ফুট মাত্র উপরে। ফুটন্ত জল ছয়-সাত হাত পর্যন্ত সবেগে বাষ্পাকারে উঠছে—আর কী গর্জন! কাছে যেতে ভয় হয়। সমস্ত স্থানটিই শীতের কয়েক মাস বরফাচ্ছন্ন থাকে। শতদ্রুর স্রোতও জমে যায়। সারা স্থানটিই অবলুপ্ত হয় দশ-বার ফুট বরফের নীচে। অথচ এই গরম উৎসগুলি তখনও কি করে যে

আত্মরক্ষা করে—বড়ই আশ্চর্য! অবাক্ বিস্ময়ে সব ঘুরে ঘুরে দেখছি। একটি গরম ফোয়ারার পাশেই পরপর দুইটি কৃত্রিম চৌবাচ্চা। ফুটন্ত জল বেরিয়ে প্রথম চৌবাচ্চাটিতে প'ড়ে স্রোতাকারে বয়ে যায় দ্বিতীয় চৌবাচ্চার ভিতর দিয়ে। এখানে সকলেই খুব আরাম করে গরম জলে স্নান করে নিলাম। সঙ্গী তিব্বতীরা তাদের ময়লা পোশাক সমেত গরম জলে নেমে পড়েছে—দেখতে দেখতে চৌবাচ্চার জল মসীবর্ণ হয়ে গেল। এত ময়লা তাদের পোশাক! তারাপ্রসন্ন বাবু দোভাষীর সাহায্যে হাসতে হাসতে জিজ্ঞাসা কর. . —"কত দিন পূর্বে স্নান করেছিলে?" "তা বলতে পারি নে।" "জন্মে অবধি কখনও স্নান করেছ কি?" "কয়েকবার করেছি।" শেষ স্নান কতদিন আগে করেছিলে? দু-এক বৎসরে স্নান করেছিলে কি?"—এ প্রশ্নের জবাব পাওয়া গেল না। তিব্বতী মাটির দিকে চোখ করে রইল। কিছুক্ষণ পরে একবার কটমট করে তারাপ্রসন্ন বাবুর দিকে তাকালো। কী হিংস্র ও ক্রূর দৃষ্টি। বুঝলাম—সে ঠাট্টাটি বুঝে খুব আহত হয়েছে। তার আত্মমর্যাদায় লেগেছে ঘা। সঙ্গীকে ব্যাপারটি বুঝিয়ে বলতেই তিনি তাড়াতাড়ি পকেট হতে সিগারেটের কেসটি খুলে তিব্বতীর হাতে কয়েকটি সিগারেট গুঁজে দিলেন। যাদুবলে যেন তিব্বতীর চোখের রং বদলে গেল—হাসি ফুটল তার চোখে মুখে। আমিও স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলাম।

ষোল হাজার ফুট তিব্বতে শতদ্রুর তীরে গরম জলে স্নানটি খুবই উপভোগ্য ও স্মরণীয় হয়েছে। জানা গেল—দশ মাইল দূরে 'থাউং লাং' নামক স্থানে আরও কয়েকটি গরম ফোয়ারা আছে।

ভস্মাসুর পাহাড় দেখতে গেলাম। কিন্তু উপরে উঠা বিপদজ্জনক—গাইড বলল। নরম পাথর—পা দিলেই ঝর ঝর করে ভেঙ্গে পড়ে।

পাহাড়ের পাদমূল থেকে ভস্মাসুরের ভস্ম অর্থাৎ কিছু চুনের মতন পাথরের গুঁড়ো নিয়ে এলাম। ঐ নাকি তীর্থাপুরীর প্রসাদ! শতদ্রুর প্রস্তরাকীর্ণ বেলাভূমিতে বসে বিশ্রাম ও জলযোগ করা গেল।

তিব্বতে এখন গ্রীষ্মকাল! না বসন্ত? তার পরে আসবে বর্ষা। বেশীর ভাগই শিলাবৃষ্টি—কদাচিৎ জল-বৃষ্টিও হয়। তার পরে কার্তিক থেকে চৈত্রের শেষ পর্যন্ত—ছয়টি মাস শীতকাল বা বরফ-কাল। বাকী ছয়টি মাসে অন্যান্য ঋতুগুলি ছুঁয়ে ছুঁয়ে যায়—কোন ঋতুই পুরাপুরি আত্মপ্রকাশ করতে পারে না। শীতকালটা অন্য সব কিছুকেই দাবিয়ে রেখেছে। গরম কালেই ২৪° ডিগ্রি ঠাণ্ডা।

গুম্ফা দেখতে গিয়েছি। জীর্ণ লামাবেশে আবৃতদেহ আট-দশ জন কুতূহলী ডাবা আমাদের ঘিরে দাঁড়িয়েছে। গাইড জনৈক ডাবার কানে কানে দু-চার কথা বলার পরেই ডাবা আমাদের নিয়ে গেল মন্দিরের ভিতর। প্রথমই অন্ধকারময় উপাসনাগার। পূজারী গর্ভমন্দিরে একটি মাখনপ্রদীপ জ্বেলে দিয়ে আমাদের ভিতরে যাবার ইঙ্গিত করল। গর্ভ-মন্দিরটি খুবই ছোট। এক একজন করে প্রবেশ করলাম। উচ্চাসনে ভগবান বুদ্ধদেবের কমনীয় দারুমূর্তি। দু পাশে দু জন লামার বিগ্রহ। সব বিগ্রহগুলিই কাষ্ঠনির্মিত এবং সোনার জলের রং করা। নীচে বেদীর উপর স্তরে স্তরে রক্ষিত অনেকগুলি ধাতব মূর্তি—পার্বতী, চতুর্ভুজ-বিষ্ণু, শিবতাণ্ডবমূর্তি, আচার্য শঙ্কর, অষ্টভুজাদেবী এবং কয়েকটি অপরিচিত দেবদেবী-বিগ্রহ। পূজাদির কোন আড়ম্বর নেই। তিব্বতে ফুল বোধ হয় জন্মায় না। এ যাবৎ কোথাও একটি ফুলও দেখতে পাই নি। আমরা সুগন্ধি ধূপকাটি জ্বালিয়ে দিলাম। গর্ভমন্দিরের দুই পাশে ভীষণাকৃতি কয়েকটি দানবমূর্তি। সকলেই 'টঙ্কা' প্রণামী দিয়ে বেরিয়ে এলাম। পূজারী ও

অনেক ডাবা তখনই প্রণামী টঙ্কাগুলি আনন্দে গুণতে আরম্ভ করেছে। নাটমন্দিরই উপাসনা ও ভোজনাগাররূপে ব্যবহৃত হয়।

জানা গেল, ঐ গুম্ফাবাসীর সংখ্যা তেরজন ডাবা (প্রবর্তক ব্রহ্মচারী)। লামা একজনও নেই। ডাবারা ব্যবসায় প্রভৃতি দ্বারা জীবিকা অর্জন করে। প্রত্যেক গুম্ফারই কিছু কিছু নিষ্কর জমি আছে। তা ছাড়া গরীব অধিবাসীর কাছ থেকেও নজরানারূপে ফসল আদায় করে। যখন উষ্ণ প্রস্রবণগুলি দেখতে যাচ্ছি, তখন একজন ডাবা কয়েকটি জব্বুতে মালপত্র বোঝাই করে—প্রায় ত্রিশ মাইল দূরে গানিমা মণ্ডিতে যাচ্ছিল। তার সঙ্গে একজন বন্দুকধারী প্রহরী। পশ্চিম তিব্বতে লামাবেশধারী ডাবাগণ চাকুরী, ব্যবসায়, ভিক্ষা ইত্যাদি নানা কার্যের দ্বারা জীবিকার্জন করে থাকে। লাভের কতক অংশ গুম্ফাতে দিতে হয়। অনেকে ব্যবসায়াদির দ্বারা কিছু অর্থ জমিয়ে বাড়ীতে ফিরে যায়। গুম্ফার পাশেই চামড়ার থলে বোঝাই প্রচুর পণ্যদ্রব্য স্তূপাকারে রক্ষিত রয়েছে। একজন ডাবা সেগুলি গোছগাছ করছিল।

তীর্থাপুরী গুম্ফা লাদাকের হেমিস্ গুম্ফার অধীন। মাঝে মাঝে ঐ গুম্ফার কোন লামা এসে এখানকার ডাবাদের ধর্মোপদেশ এবং কাজ কর্মের নির্দেশ দিয়ে চলে যান। তীর্থাপুরীর প্রাকৃতিক আবেষ্টনী বড়ই মনোরম। নিকটে কোন উচ্চ পর্বত নেই। সকাল হতে সন্ধ্যা পর্যন্ত পরিচ্ছন্ন সূর্যকিরণে স্থানটি উদ্ভাসিত থাকে। ডাবাদের নিকট বিদায় নিয়ে তিনটে নাগাদ তাঁবুতে ফিরে এলাম।

বিকেল বেলা তিব্বতী ঘোড়াওয়ালা রিং-বু চুপচাপ মাথাটি নীচু করে তাঁবুর সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। একটু হাসি হাসি মুখ। আমরা জানি সে কেন এসেছে। রোজ বিকালে তাদের সিগারেট ও কিছু খাবার দিই।

তার প্রাপ্য পেয়ে সে খুশী হয়ে চলে গেল। তিব্বতীরা এখন আর আমাদের উপর কোন বৈরীভাব পোষণ করে না—ভালবাসে। ভাষার বিভ্রাট। তারা হিন্দি বোঝে না—আমরা জানি নে তিব্বতী। কিন্তু প্রাণের ভাষাটা বেশ বোঝা যায়। প্রথমটা তারা আমাদের ভয় করত—আমরাও তাদের বিশ্বাসের চক্ষে দেখতে পারি নি—এখন আমরা পরস্পরের মধ্যে প্রাণের স্পর্শ পাই। পরস্পরকে বুঝতে পেরেছি। তাদের ব্যবহার এখন বেশ লাগে—ছেলে-মানুষের মতন সরল। আমাদের প্রতি তাদেরও একটা পরম আত্মীয়তাবোধ এসেছে—আমাদের সুখ-দুঃখের সঙ্গে নিজেদের এক করে ফেলেছে।

২২শে আষাঢ়, শুক্রবার। ন'টার পরেই রওনা হয়েছি। চৌদ্দ মাইল অতিক্রম করে সেলাচাকুং যেতে হবে। তীর্থাপুরী নদীর ধারে ধারে অনেকটা পথ। ক্রমে ডানহাতি দিগন্তবিস্তৃত মালভূমির উপর দিয়ে এগিয়ে চলেছি। শেষ যে কোথায় তা ঠিক বোঝা যায় না। যেন অসীম জলধিবক্ষের উপরে হাবুডুবু খাচ্ছি। ঢেউ-খেলানো ছোটবড় চড়াই উৎরাই। সব স্থানটিই তৃণহীন ধূসর অনুর্বর ও প্রস্তরময়। জঙ্গলী ঘোড়ার দল মাঝে মাঝে দেখা যায়। জনৈক সহযাত্রী গম্ভীরভাবে বললেন—"এসব ঘোড়া কি খায় জানেন?—পাথর আর বালি।" বাস্তবিকই অত বড় মালভূমিতে নুড়িপাথর আর কাঁকর ছাড়া কিছু নেই। নানা রং-এর ছোটবড় সুন্দর সুন্দর নুড়িপাথর। ডাঃ দে এবং স্বামী দুর্গাত্মানন্দ ঐ পাথরের লোভ সামলাতে না পেরে ঘোড়া থেকে নেমে পাথর কুড়িয়ে কুড়িয়ে ঘোড়ার বোঝা বাড়াতে লাগলেন।

প্রায় ষোল হাজার ফুটে নদীর চড়ার মতন কাঁকুরেবালি আর অজস্র নুড়িপাথর! কোথা থেকে যে এল—ভাববার বিষয়। ভূতত্ত্ববিদ্‌দের মতে

হিমালয়-সমেত সমগ্র তিব্বত এক সময়ে সমুদ্রগর্ভে ছিল। বিরাট ভূমিকম্প বা আগ্নেয়গিরির বিস্ফোরণের ফলে ঐ সমুদ্রগর্ভ স্ফীত হয়ে পর্বতশ্রেণী ও মালভূমির সৃষ্টি হয়েছে।

এক-পা এক-পা করে চলে ক্রমে এসেছি সেলাচাকুং-এর কাছে। স্থানটি দূর হতে একটি প্রকাণ্ড গোচরের মত দেখাচ্ছিল। তখনও খানিকটা বেলা আছে। উপর হতে দেখলাম—মাঠের মাঝে তিনটি তাঁবু আর চারিদিকে চরে বেড়াচ্ছিল কয়েক শত ঘোড়া খচ্চর ভেড়া ছাগল। দেখেই ভয়ে মুখ শুকিয়ে গেল। শুনেছিলাম—বড় বড় ডাকাতের দল অনেক ঘোড়া নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। তারা অস্ত্রেশস্ত্রে এতই সুসজ্জিত থাকে যে, তাদের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া অসম্ভব। গাইড এদিক সেদিক ছুটাছুটি করে দূরে একজন তিব্বতী স্ত্রীলোককে দেখে তার কাছে গেল। ফিরে এসে বললে—'ওরা তিব্বতী কোন বড় সওদাগর। ভয়ের কোন কারণ নেই।' মাঠের একধারে সবেমাত্র তাঁবু ফেলার আয়োজন হচ্ছে—এমন সময় পূর্বোক্ত তাঁবুগুলির দিক থেকে দু জন লোক হন্‌হন করে এসে ঘোড়া ছাড়তে নিষেধ করল। নির্দিষ্ট সীমার বাইরে গেলে আটক করা হবে—তারা গারফান্ অর্থাৎ তিব্বতের লাটসাহেবের লোক। আর মাঠের সব জানোয়ারগুলিও তাঁরই—আদেশের সুরে বলে গেল। গারফান্-এর নাম শুনে গাইড সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছে।

দূরবীনের সাহায্যে তাঁবুগুলি দেখতে লাগলাম। অনেক লোক ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। অনেকের কোমরে ঝুলছে তলোয়ার। চা খেতে খেতে পরামর্শ স্থির হল—যদি সম্ভব হয় তো গারফানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা উচিত। গাইডকে আমাদের অভিপ্রায় জানাতে সে তো ভয়ে জড়সড় হয়ে বলল, "গারফানের কাছে কি ·· র যাওয়া যাবে? তাঁর

লোকেরা তলোয়ার দিয়ে কেটেই ফেলবে।" অনেক বুঝিয়ে সুঝিয়ে, কি কি বলতে হবে সব শিখিয়ে পড়িয়ে, গাইডকে আমাদের দূতরূপে গারফানের তাঁবুতে তো পাঠান গেল। এদিকে আমাদের চলেছে তুমুল আলোচনা—কি করে অভিবাদন করতে হবে, গারফান্ কেমন লোক, কি প্রসঙ্গ করা যাবে ইত্যাদি। কীচথাম্পা কি খবর নিয়ে আসে তাঁর জন্ম সকলেই উদ্‌গ্রীব।

বাবুরা পরিচ্ছন্ন পোশাক করে সেজে বসে আছেন। খানিক পরে গাইড গারফানের তাঁবু থেকে বেরিয়ে দ্রুতপদে এসে হাসতে হাসতে খবর দিল—গারফান্ খুব ধীরভাবে আমাদের সব পরিচয় নিয়ে দেখা করতে ইচ্ছুক হয়েছেন। আধঘণ্টা পরে যেতে হবে। জানা গেল—গারফান্ নিজ মাতৃভাষা ছাড়া অন্য কোন ভাষা জানেন না। গাইডই দোভাষীর কাজ করবে। একটি পাত্রে মেওয়া প্রভৃতি সামান্য উপঢৌকন সহ গাইডকে নিয়ে লাটদর্শনে রওনা হওয়া গেল। দুই তাঁবুর মধ্যে ব্যবধান প্রায় সিকি মাইল। কাছাকাছি গিয়ে দেখা গেল, অনেক লোক আমাদের আগমন-প্রতীক্ষায় উৎসুকভাবে তাঁবুর চারধারে দাঁড়িয়ে আছে। তাদের অঙ্গভঙ্গিতে বেশ বোঝা যাচ্ছিল—তারা আমাদের সম্বন্ধেই কথাবার্তা বলছে।

পাশাপাশি তিনটি তাঁবু। আমরা অগ্রসর হলাম বড় সুসজ্জিত তাঁবুটির দিকে। তাঁবুর দরজার সামনে আসতেই ঈষৎ নীলাভ মূল্যবান মখমলের পোশাক-পরিহিত একজন সৌম্যদর্শন লোক হাসিমুখে এগিয়ে এলেন এবং সকলের সঙ্গে সহৃদয় করমর্দন করে আমাদের ভিতরে নিয়ে গেলেন। যিনি করমর্দন করেছেন তিনিই যে স্বয়ং গারফান্ সে বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ রইল না। চেহারা ও পোশাকের পারিপাট্য, আভিজাত্য-পূর্ণ চালচলন, মধুর অমায়িক ব্যবহার তাঁর পদমর্যাদার পরিচয় দিচ্ছে।

· তাঁবুর উপরের দিকে বড় দুটি রোসন্‌দান। ভিতরে দু পাশেই মখমল-মোড়া লম্বা সোফা। বিপরীত দিকে তাকিয়া-সাজান উচ্চ আসন। তার সামনেই মেওয়া প্রভৃতি নানাপ্রকার খাদ্যসম্ভার এবং কিছু পুস্তক ও লিখবার সাজসরঞ্জামে পরিপূর্ণ টেবিল। দু পাশের সোফায় আমাদের বসবার ইঙ্গিত করে গারফান্ নিজে তাঁর উচ্চাসনে বসেছেন এবং হাসিমুখে খুব উৎসুক দৃষ্টিতে আমাদের দিকে তাকাতে লাগলেন। যা সামান্য উপঢৌকন নিয়েছিলাম তা রাখা হল তাঁর সামনে। তাঁর সঙ্গে দেখা করার সুযোগ দেওয়ার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানালাম। "আপনাদের সঙ্গে দেখা হয়ে আমিও খুবই আনন্দিত" বললেন। খানিকক্ষণ চুপচাপ। পরে গারফান্ আমাদের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ঘুরিয়ে তিব্বতে আসার উদ্দেশ্য জানতে চাইলেন। "তীর্থভ্রমণ করতেই তিব্বতে এসেছি"—এবারে বললাম।—"ইতঃপূর্বে খোচরনাথ ও তীর্থাপুরী দেখেছি। ক্রমে কৈলাস-দর্শন ও পরিক্রমা সেরে মানসসরোবরে স্নানাদি করে তাকলাকোট হয়ে ফিরে যাব ভারতবর্ষে।" জবাব শুনে তিনি খুশী হলেন মনে হল। সহযাত্রীদের পরিচয় দিয়ে তাঁদের পদমর্যাদাদি তাঁকে জানিয়ে দিলাম। সহযাত্রীরা সকলেই উচ্চশিক্ষিত এবং ভারত-সরকারের পদস্থ কর্মচারী জেনে গারফান একটু বিস্ময়াবিষ্ট এবং খুবই আনন্দিত হলেন। স্বামী দুর্গাআনন্দের বেশ লম্বা দাঁড়ি-গোঁফ ও পরিচ্ছদের বৈশিষ্ট্য গারফানের সবিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। হাসতে হাসতে কারণ জিজ্ঞাসা করায় বললাম—"উনি একটু বেশী শীত-কাতুরে। সেজন্য বিশেষভাবে মুখটিকে তিব্বতের বরফানি হাওয়া ও দুর্জয় ঠাণ্ডার হাত থেকে বাঁচাবার জন্য অমন করে দাঁড়ি-গোঁফ রেখেছেন।" শুনে গারফান হাসতে লাগলেন।

খুবই ভদ্রভাবে গারফান্ চা খাবার নিমন্ত্রণ করলেন। তাঁকে আন্তরিক

ধন্যবাদ জানিয়ে বললাম—"আমরা সবেমাত্র চা খেয়ে এসেছি।" শুনে তিনি স্মিতমুখে বলছেন, "আমাদের দেশে রীতি আছে যে, কেউ চা-র নিমন্ত্রণ করলে তা প্রত্যাখ্যান করতে নেই। চা-প্রত্যাখ্যান শত্রুতার জ্ঞাপক।" শুনে খুবই আগ্রহসহকারে সম্মতি জানালাম। তাঁর ইঙ্গিতানুসারে রৌপ্য ও শ্বেত-প্রস্তরের পেয়ালায় আমাদের সামনে গরম চা পরিবেশিত হল। গারফানের সামনে পূর্ব হইতেই সোনার ঢাকনি-সমেত পাত্রে চা এবং রূপার পেয়ালা রাখা ছিল। তিনি নিজের হাতে আমাদের প্রচুর মেওয়া পরিবেশন করলেন।

জীবনে এই প্রথম তিব্বতী চা খাওয়া। তিব্বতে চা প্রস্তুত করার প্রণালী সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। চীনা চা—বেশ বড় বড় পাতা—বহুক্ষণ গরম জলে সিদ্ধ করে তাতে চামরী গরুর প্রচুর মাখন ও সামান্য নুন ফেলে দিয়ে বেশ ভাল করে মিশিয়ে নেওয়া নয়। ঐ চা পাত্রসমেত সব সময় বসান থাকে অল্প আগুনের উপর। গরম চা একটু ছাতু মিশিয়ে গরীব তিব্বতীরা খুব খায়। চা তাদের পক্ষে আহার ও পানীয় দুই-ই। খেতে খেতে গারফান্ বললেন—"আমরা চা-টা খুবই বেশী খাই। চায়ের পাত্র সব সময়ই আগুনের উপর চড়ান থাকে। বন্ধুবান্ধব বা পরিচিত যে-কেউ আসে চা খেতে বলা হয়। কেউ কেউ রোজ পঞ্চাশ-ষাট পেয়ালা চা-ও খায়।" শুনে তো অবাক। পেয়ালাগুলি অবশ্য খুবই ছোট।

গারফান্ ধীরে ধীরে আরম্ভ করলেন রাজনৈতিক আলোচনা। আমরা পূর্ব থেকেই ঠিক করেছিলাম যে, কথাবার্তা খুবই বুঝেসুঝে করতে হবে—বিশেষ রাজনৈতিক আলোচনা গারফানের সঙ্গে আদৌ করব না। তিনি নিজেই যখন ইউরোপের রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং ভারতের আভ্যন্তরীণ অবস্থার কথা পর পর জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন, তখন আমরা পড়ে

গেলাম একটু মুশ্‌কিলে। সব প্রশ্নেরই যতটা সম্ভব পাশ কাটিয়ে জবাব দিয়ে শেষটায় বললাম, "গত এক মাসেব বেশী হল আমরা তো খবরের কাগজের মুখ দেখতে পাই নি! দুনিয়ায় এখন কি যে হচ্ছে না হচ্ছে কিছুই জানি নে।"

প্রসঙ্গান্তর-অবতারণার জন্য টেবিলেব উপর একখানি ইংলিশ প্রাইমার দেখে গারফান ইউরোপীয় কোন ভাষা জানেন কিনা জিজ্ঞাসা করেছি। বললেন—"নিজ মাতৃভাষা ছাড়া অন্য কোন ভাষা আমি জানি নে। টেবিলের উপর যে ইংরেজী বইখানি তা বড় ছেলের। তাকে সামান্য ইংরেজী শেখাবার চেষ্টা করছি। এখন গাব্‌টকে যাব। সেখানে সে ইংরেজী পড়বে।"

প্রসঙ্গচ্ছলে ক্রমে তিব্বতের শাসনপদ্ধতি সম্বন্ধে প্রশ্ন করেছি। গারফান্‌ বললেন—"সমগ্র তিব্বত পূর্ব ও পশ্চিম দুভাগে বিভক্ত। প্রত্যেক অংশের জন্য একজন করে গারফান্‌ ও ডেপুটি গারফান্‌ নিযুক্ত আছে। পশ্চিম তিব্বতে ৩৯টি ডিভিসান। সমগ্র পশ্চিম তিব্বতের শাসনভার তিনজন বিচারপতি ও ৩৯ জন জংপানের (কমিশন) উপর ন্যস্ত। গুরুতর ব্যাপারে গারফানের আদেশমত শাসনকার্য পরিচালিত হয়। গারফানের নির্দেশই চূড়ান্ত। প্রাণদণ্ডের আদেশ দেবার অধিকারও গারফানের আছে। রাজস্ব-আদায় ও ডাকসরবরাহ করার জন্য জংপানদের অধীনে 'ছাচুজ্‌' বা তহশীলদার এবং 'টাসাম্‌' বা ডাকমুন্‌শীগণ নিযুক্ত আছে। গত কয়েক বৎসর যাবৎ ডাকবিভাগে বিভিন্ন মূল্যের টিকেটের প্রবর্তনও হয়েছে। শাসনকার্যের সহায়তার জন্য প্রত্যেক গ্রামের 'গোবা' বা প্রধান এবং কয়েকটি গ্রামের উপর 'মাগপান্‌' বা পাটোয়ারী আছে। গোবা এবং মাগপান্‌ স্থানীয় লোকদের বংশানুক্রমিক পদ। সকল রাজকর্মচারীই

লাসা হতে তিন বৎসরের জন্য নিযুক্ত হয়। কিন্তু প্রয়োজনবোধে রাজ-কর্মচারীদের ততোধিক কালও কার্যে বাহাল রাখার রীতি আছে। লাসা হতে ল'দাক পর্যন্ত সহস্রাধিক মাইল বিস্তৃত বাণিজ্যপথ। ঐ পথে পণ্যদ্রব্য ও ডাক যাতায়াত করে প্রায় পৌনে-পাঁচ লক্ষ বর্গমাইলব্যাপী স্থানে। তিব্বতের লোকসংখ্যা ত্রিশ লক্ষের কিছু বেশী। কিন্তু দীর্ঘকাল পদ্ধতি-অনুসারে কোন আদমসুমারি হয় নি।"

রাজস্ব এবং শাসন-সংক্রান্ত অনেক বিষয় জানবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু তাতে কোন রাজনৈতিক অভিসন্ধি সূচিত হতে পারে ভেবে সে সব প্রশ্ন হতে বিরত হলাম। কথাপ্রসঙ্গে তিনি বললেন—"রাজকার্যোপলক্ষে আমাকে একবার কলকাতা ও বোম্বাই যেতে হয়েছিল। কলকাতা খুব বড় শহর। লোকজন গাড়িঘোড়া মোটর বাড়ীর উপর বাড়ী—কোথাও একটু চুপ করে দাঁড়াবার উপায় নেই। আমি তো একেবারে হাঁপিয়ে উঠেছিলাম। সর্বক্ষণ ভয়—কখন চাপা পড়ে মবে যাই! তার চাইতে বোম্বাই আমার লেগেছিল ভাল। এও ঠিক যে আমাদের দেশের মতন—এমন শান্তিপূর্ণ সুন্দর স্থান আর কোথাও নেই।"

গারফানের সঙ্গে কথাবার্তা বেশ জমে উঠেছিল। তিনিও খুবই আগ্রহসহকারে আমাদের কথা শুনছিলেন, কিন্তু মুশ্‌কিল হয়েছিল দোভাষী নিয়ে। আমাদের সব কথা ঠিক ঠিক গারফান্‌কে সে বোঝাতে পারছিল না। একেতো সে ভয়ে জড়সড়! সাধারণ তিব্বতীরা গারফান্‌কে রাজার মতন ভীতিজড়িত শ্রদ্ধার চক্ষে দেখে। অনেকের ভাগ্যেই গারফানের দর্শন কখনও ঘটে উঠে না।

আমাদের দেখাবার জন্য গারফান্ ডেকে পাঠালেন তাঁর ছেলে দুটিকে। তারা তাঁবুর দরজার পাশে এসে লজ্জায় দুহাত দিয়ে চোখমুখ ঢেকে

খানিকটা দাঁড়িয়ে থেকেই একসঙ্গে ছুটে পালাল। ছেলে দুটি দেখতে চমৎকার। গায়ের রং বেশ ফরসা, মুখ-চোখও প্রতিভাব্যঞ্জক।' বড়টির বয়স তের-চৌদ্দ এবং ছোটটির দশ-এগার বলে মনে হল। বেশ বলিষ্ঠ গড়ন। পশ্চিম তিব্বতে এ যাবৎ স্ত্রী-পুরুষ যা দেখেছি অধিকাংশেরই গায়ের রং ময়লা—তামাটে রং—মুখ কাল। সারাটি মুখ যেন পুড়ে গেছে। তিব্বতে হাওয়া এমনই তীব্র ও ঠাণ্ডা যে শরীরের অনাবৃত অংশ একেবারে হিম-ঝলসান কাল হয়ে যায়। মুখের সৌন্দর্যরক্ষা করার জন্য তিব্বতী রমণীগণ সারা মুখে রক্তচন্দনের মতন কোন জিনিসের প্রলেপ দেয়। তিব্বতে বাস করেও গারফান্ এবং তাঁর ছেলেদুটির রং এমন সুন্দর ও কমনীয় কি করে রয়েছে তা-ই ভাবছিলাম।

নানা কথাবার্তায় অনেকক্ষণ কেটে গেল। গারফান্ স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়েই বললেন—"এখানে চোর-ডাকাতের উপদ্রব খুবই বেশী। আপনাদের তীর্থভ্রমণ যাতে নিরুপদ্রব হয়, তার জন্য আমি একখানি বিজ্ঞপ্তিপত্র দেব। তাতে সমগ্র দেশবাসীকে সাধারণভাবে জানিয়ে দেওয়া হবে যে, তারা যেন প্রয়োজনমতন আপনাদের সাহায্য করে। গুম্ফাতে লামারা যেন টাকা-পয়সার জন্য আপনাদেব পীড়াপীড়ি না করে।" আমাদের সব প্রকার নাম লিখে নিলেন এবং পরদিন সকালে স্থানপরিত্যাগের পূর্বেই ফরমান্খানি পাঠিয়ে দেবেন বললেন। তাঁর দয়া ও উদারতার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে আমরা বিদায় নিলাম। তিনি সঙ্গে সঙ্গে তাঁবুর বাইরে পর্যন্ত প্রত্যুৎগমন করে সকলের সঙ্গে করমর্দন করলেন। আমাদের তিব্বতভ্রমণ ও তীর্থযাত্রা যাতে আনন্দের হয় সেজন্য আন্তরিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করে স্মিতমুখে বিদায় দিলেন। তিব্বতে এসে অপ্রত্যাশিতভাবে গারফানের সঙ্গে দেখা ও তাঁর প্রীতিপূর্ণ ভদ্রব্যবহার সকলকেই মুগ্ধ করেছে।

প্রায় সাড়ে-ষোল হাজার ফুট উঁচুতে এই প্রথম রাত্রিবাস। পর্বত-চূড়ায় চূড়ায় বরফ। দারুণ ঠাণ্ডায় কারও ভাল ঘুম হল না।

২৬শে আষাঢ়, শনিবার। নিঃশব্দ অরুণোদয়। শুভ প্রভাত। বাল-সূর্যকিরণে কৈলাসশিখর রক্তিম হয়ে উঠেছে। যেন এ জগতের অন্ধকারের পরপারে একটি মঙ্গল-দীপশিখা শূন্যে অনন্ত গগনে মহাশান্তি-রূপে দীপ্তি পাচ্ছিল। ক্রমে উজ্জ্বল কিরণে হেসে উঠেছে চারিদিক। কৈলাসই আমাদের বিশেষ আকর্ষণের বস্তু। সুনীল অম্বরতলে রজত-শুভ্র শিখর। আশেপাশে নানাবর্ণের ছোট ছোট মেঘগুলি কৈলাসকে প্রদক্ষিণ করে বেড়াচ্ছে।

সকালে দেখা গেল গারফানের তাঁবু থেকে একজন লোক হাতে অনেক জিনিস নিয়ে আসছে। কীচথাম্পাকে সঙ্গে নিয়ে লোকটি গারফানের দেওয়া জিনিসগুলি ও 'ফরমান্' আমাদের হাতে দিল। গারফান্ একপাত্র চামরী গাভীর দুগ্ধ, ছাগলের দুধের প্রচুর মাখন, শুকনো পনীর ও মেওয়া প্রভৃতি আমাদের জন্য পাঠিয়েছেন। গারফান্‌কে আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে লোকটিকে বিদায় দেওয়া গেল।

এখন গারফানের চিঠিখানি দেখার পালা—তিব্বতী ভাষায় লেখা—সবই গ্রীক বা হিব্রুর মতন। ফরমান্ খানির নিম্নে একটি বড় শীল-মোহর। শীলটি যে তিব্বত-সরকারের তরফ থেকে দেওয়া হয়েছিল—তা বেশ বোঝা গেল। হাতে তৈরী পুরু কাগজে উজ্জ্বল কালকালিতে গারফানের নিজের হাতের লেখা চিঠি। খানিকক্ষণ নাড়া চাড়া করে ভবিষ্যতে কাজে লাগতে পারে ভেবে ফরমান্‌টি তুলে রাখা হল। ভারতে ফিরে কলকাতায় জনৈক তিব্বতী-ভাষাজ্ঞর সাহায্যে ফরমান্‌টির অনুবাদ করান হয়েছিল।—"এই ফরমানের বাহক স্বামী অপূর্বানন্দ

ও তাঁর সঙ্গিগণ তীর্থভ্রমণ-উদ্দেশ্যে তিব্বতে আসিয়াছেন। এতদ্দ্বারা সকল তিব্বতবাসীদের জানান হইতেছে যে, সকলেই যেন তাঁহাদিগকে প্রয়োজন-মত সাহায্য করে। কোন গুম্ফাদিতে অর্থাদির জন্য তাঁহাদের উপর যেন কোনপ্রকার উৎপীড়ন করা না হয়।"

খুব ভোরেই দলে দলে ঘোড়া খচ্চর বোঝাই করে গারফানের মালপত্র চালান হচ্ছিল। তাঁর তাঁবুর কাছে বাঁধা ছিল আট দশটি সুসজ্জিত বলিষ্ঠ ঘোড়া। প্রায় আটটা নাগাত সমগ্র মুখমণ্ডল বস্ত্রাবৃত অবস্থায় গারফান্ তাঁবু থেকে বেরিয়ে এলেন; সঙ্গে ছেলে দুটি। ছেলেদেরও মাথা হতে গলা পর্যন্ত বস্ত্রাচ্ছাদিত। এসেই তাঁরা ঘোড়া ছুটিয়ে সশস্ত্র-প্রহরী-পরিবেষ্টিত হয়ে চলে গেলেন। দুরবীনের সাহায্যে সব দেখা যাচ্ছিল। গারফান্ ও তাঁর ছেলে দুটি নীলরং-এর খুব পাতলা রেশমী কাপড়ে মুখমণ্ডল আবৃত করে তাঁবুর বাইরে এসেছিলেন। কেন যে তাঁরা মুখ ঢেকে রওনা হলেন আর কি করেই বা তাঁদের মুখের রং এমন কমনীয় রয়েছে, তা বুঝতে আর বাকী রইল না। তিব্বতের হিমতীব্র হাওয়ার দরুন এ কয়েক দিনেই আমাদের সকলকার মুখ ও শরীরের অনাবৃত অংশ হিমঝলসান কাল হয়ে গিয়েছিল। তারাপ্রসন্ন বাবু সারা মুখে ভেসেলিনের মোটা প্রলেপ দিয়ে চলতেন। বললেন—'কেমন, ঠিক করেছি কি না বলুন? এতদিন তো বড্ড ঠাট্টা করছিলেন।'

গারফান্ চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁবুগুলি সব গোটান হচ্ছিল। অনুসন্ধানে জানা গেল—ঐ তাঁবুগুলি গারফানের নিজের নয়। পদস্থ রাজকর্মচারিগণ সফরে বেরিয়ে যে যে স্থানে থাকেন, সে-সকল গ্রামের প্রধানরাই কর্মচারীদের পদমর্যদানুসারে বাসস্থান ও আহারাদির সুব্যবস্থা করতে বাধ্য। তিব্বতে গারফান হতে নিম্নপদস্থ কোন রাজকর্মচারীই

সরকারের নিকট হতে মাইনে বা অন্য বৃত্তি প্রাপ্ত হন না। প্রত্যেক রাজকর্মচারীই পদমর্যাদা-অনুসারে প্রজাদের নিকট হতে নজর বা সেলামী আদায় ও ব্যবসায়াদি দ্বারা অর্থোপার্জন করে থাকে। রাজকর্মচারীদের পণ্যদ্রব্যাদি প্রজাদের কিনতে বাধ্য করা হয়। তিব্বত সরকারের নির্দিষ্ট কোন সৈন্যবাহিনী বা পুলিস নেই। সম্প্রতি অল্প পরিমাণ সৈন্য ও পুলিসবাহিনী-গঠন ও রক্ষার প্রচেষ্টা আরম্ভ হয়েছে। দেশের শান্তি ও দেশরক্ষার জন্য প্রত্যেক পরিবার হতে একজন করে বলিষ্ঠ লোককে রক্ষিদলে যোগদান করতে হয়। তিব্বতীরা বন্দুক-চালনায় খুবই অব্যর্থ-লক্ষ্য।[১]

আজ দশ মাইলের পড়াউ—কৈলাসশ্রেণীর খুবই কাছে কার্লেপ নামক স্থানে যেতে হবে। বেরুবার বিশেষ তাড়াতাড়ি নেই। কাল হতে কৈলাস-পরিক্রমা আরম্ভ হবে। দশটার পরে প্রখর রোদের মধ্যে রওনা হয়েছি। খানিক অগ্রসর হয়েই এক বিস্তীর্ণ উপত্যকার মধ্যে এসে পড়লাম—নুড়ি-পাথর ও বালুকাময়। আমরা সবুজের কাঙ্গাল হয়েছি। কোথাও একটু সবুজ দেখতে পাই নে। পাথর বালি ধূসর পর্বত—মরু-ভূমির মতন শুষ্ক অন্তহীন মালভূমি। সবকিছুই বাধা সৃষ্টি করে, দুঃখ দেয়, পীড়ন করে। কিন্তু এখন আর তত কাতর হই নে—বুঝিছি এসব সইতেই হবে। ক্রমে যন্ত্রণা ও দুঃখকষ্ট শরীরের সঙ্গে খাপ খেয়ে গেছে। জীবনে সকল দুঃখই এমনি করে সইবার শক্তি বাড়িয়ে দেয় অথবা বোধশক্তি নষ্ট করে। দুদিন পূর্বে যা ছিল সহনশক্তির বাইরে, আজ তাতে আর

১ এ গ্রন্থে তিব্বত সম্বন্ধে যা লেখা হয়েছে, সবই কয়েক বৎসর পূর্বের খবর। এর মধ্যে জগতের অন্যান্য স্থানের ন্যায় তিব্বতেও অনেক কিছুর পরিবর্তন হয়েছে।

আমরা বিচলিত হই নে—তার প্রতিবাদও করি নে। মানুষকে শক্ত করে তোলার ও দুর্জয়কে জয় করার গুহ্য মন্ত্র হল সয়ে যাওয়া। সহ্য করারও অবশ্য একটা সীমারেখা আছে।

পাঁচ-ছয় মাইল পরে এসেছি থোক্-চু নদীর ধারে। বেশ চওড়া ও প্রস্তর-সমাকীর্ণ নদীবক্ষ—জল সামান্যই। পথের বৈচিত্র্য তেমন নেই। ক্রমে সবই যেন একঘেয়ে লাগছে। তিনটে নাগাত কার্লেপে এসেছি। তখন তাপ ৮৬° ডিগ্রি। প্রায় সতের হাজার ফুট উচ্চ স্থানে—চিরহিমানীর গায়ের কাছে—এতটা গরম! যে উপত্যকাটিতে তাঁবু ফেলা হল, তার তিন-দিকেই প্রস্তরময় সম-উচ্চতার পর্বতমালা অর্ধবৃত্তাকারে ঘিরে আছে। কী সুন্দর আর কত নূতন! যেন কোন স্বর্গীয় ভাস্কর সযত্নে ঐ পর্বত-গুলিকে সমবিন্যস্ত করে সাজিয়ে রেখেছেন! অনতিদূরে মহাপবিত্র কৈলাসশিখর 'ধ্যানমগ্ন শান্তি'রূপে বিরাজমান।

উজ্জ্বল সূর্যকিরণ। নবনীল নভস্তলে সাদা পালকের মত দু-এক টুকরা মেঘ বায়ুভরে সঞ্চারিত হয়ে ভেসে বেড়াচ্ছে। বিছানাপত্র গোছগাছ করে বাইরে এসেছি। ততক্ষণে দূরে উত্তরপশ্চিম দিক থেকে একখানি ধূসর ঘন মেঘ বিস্তৃত হয়ে দ্রুত আসছিল অ. দের দিকে। দেখে কীচখাম্পা একটু চিন্তিত হয়ে বলল, "ঐ যে মেঘখানি দেখছেন এ বরফভরা মেঘ। শীঘ্রই প্রবল শিলাবৃষ্টি বা বরফপাত করবে। লক্ষণ বড় সুবিধার নয়।" তখনই সে ঘোড়াগুলিকে কাছাকাছি আনবার নির্দেশ দিল। আমরা গাইডের কথা তখন অতি সহজ-ভাবেই নিয়েছিলাম। তিব্বতে বরফপাত দেখার আশায় কেউ কেউ খুবই খুশী হলেন। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই উন্মত্ত দৈত্যের ন্যায় চারিদিক মথিত করে উঠল প্রবল ঝড়। আকাশ মেঘে মেঘে ছেয়ে

গেছে। হিমকণাময় বাতাস। দেখতে দেখতে কড় কড় শব্দে মেঘ ডেকে উঠল—আরম্ভ হলো প্রবল শিলাবৃষ্টি। শুধু শিলা—একফোঁটাও জল নেই। চারিদিকে এক মহা আলোড়নের সৃষ্টি হয়েছে; আমরা তো ঢুকেছি তাঁবুর ভিতর। ঘোড়াওয়ালারা ছুটেছে কম্বলহাতে ঘোড়াগুলিকে কম্বল ঢাকা দিতে। গাইড দু-তিন জনকে নিয়ে কাঠের কোদাল দিয়ে তাঁবুর উপরকারের স্তুপাকার শিলা সরাচ্ছে—তবু মড়মড় শব্দে তাঁবু যেন ভেঙ্গে পড়ে। ঝড় আর শিলাবৃষ্টি চলল প্রায় আধঘণ্টা। সে এক ক্ষুদ্র প্রলয়কাণ্ড! শিলাবৃষ্টি যখন থামল ততক্ষণে প্রায় দেড়ফুট শিলা জমে গেছে। চারিদিক উজ্জ্বল সাদা। চোখ ঝলসে যায়। কী বিরাট নিস্তব্ধতা আর বিপুল রূপগৌরব! দৃষ্টিরেখার শেষপ্রান্ত পর্যন্ত সমগ্র প্রদেশ যেন একখানি রূপার পাত দিয়ে মোড়া।

তাঁবুর মধ্যে ৩২° ডিগ্রি ঠাণ্ডা—অর্থাৎ একঘণ্টার মধ্যে ৫৪° ডিগ্রী নেমেছে। এমন শিলাবৃষ্টি তিব্বতেই সম্ভব। ক্রমে নেমে এল হিমজর্জর রাত্রি। তাঁবুর ভিতরেই ২৪° ডিগ্রি। জল পাবার জো নেই। সব বরফ হয়ে গেছে। রাত আব কাটছে না। শেষটায় তাঁবুর ভিতর ষ্টোভ্ জ্বালিয়ে—তা-ই ঘিরে বসে রয়েছি। দাঁতে দাঁতে ঘষে কর্কশ শব্দ হতে লাগল। তবু তো তাঁবুব ভিতর! কিন্তু পথে চলতে চলতে আশ্রয়হীন অবস্থায় এভাবে শিলাবৃষ্টি-আক্রান্ত হলে সকলেরই মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। গাইডের সঙ্গে পরামর্শ করে ঠিক হল—পরদিন হতে ভোরে রওনা হয়ে অপরাহ্নের পূর্বেই গন্তব্য স্থানে পৌঁছতে হবে। ঝড় জল শিলাবৃষ্টি বরফপাত সাধারণতঃ হয়ে থাকে বিকালের দিকেই।

কৈলাস

"……সহস্র দিনের মাঝে আজিকার এই দিনখানি
হয়েছে স্বতন্ত্র চিরন্তন।
তুচ্ছতার বেড়া হতে মুক্তি তারে কে দিয়েছে আনি'
প্রত্যহের ছিঁড়িছে বন্ধন।
প্রাণ-দেবতার হাতে জয়টীকা পরেছে সে ভালে,
সূর্য-তারকার সাথে স্থান সে পেয়েছে সমকালে,
সৃষ্টির প্রথম বাণী যে-প্রত্যাশা আকাশে জাগালে
তাই এল করিয়া বহন॥"

*　　　　*　　　　*

২৪শে আষাঢ়, রবিবার। সাড়ে ছটায় দুর্জয় শীতে হি হি করে কাঁপতে কাঁপতে বরফের উপর দিয়ে চলেছি। কার্লেপ নদীর জল জমে গিয়েছে। বরফ—আর বরফ। খানিক দূর আসার পরই জনৈক তিব্বতী ঘোড়া-ওয়ালা দারুণ পেটের বেদনায় গড়াগড়ি যেতে লাগল। সহযাত্রীর ঘোড়ার পিঠে তাকে শুইয়ে ধীরে ধীরে চলেছি। কিন্তু ঘোড়ার পিঠেই সে সংজ্ঞাহীন হয়ে গিয়েছে। মহা বিপদ! ডাঃ দে গিয়েছেন এগিয়ে। গাইড ছুটে গেল তাঁকে ফিরিয়ে আনতে। রোগীটিকে নিয়ে বসে রইলাম। ডাঃ দে এসে নাড়ী পরীক্ষা করে হতাশ হয়ে গেছেন। পরপর দুটি ইনজেক্‌সন দেবার পরে রোগীর জ্ঞান ফিরে এল। খানিক পরে তাকে ঘোড়ার পিঠে বসিয়ে দুজনে ধরে ধরে এগুতে হল।

প্রায় তিন মাইল আসার পর লা-চু নদী। দক্ষিণতীরে নিয়ান্‌ডি গুম্ফা দেখা যাচ্ছে। পর্বতগাত্র কেটে খুব উপরে নিরাপদ স্থানে মঠটি তৈরী। রোগীকে ছেড়ে গুম্ফা দেখতে যাবার ইচ্ছা হল না। দূর হতে দেখা গেল—গুম্ফার বাইরে তিন-চার জন লামাবেশধারী ঘুরে বেড়াচ্ছে। লা-চুর সেতু পেরিয়ে বাম তীরে তীরে এগিয়ে চললাম।

নিয়ান্‌ডি হতেই কৈলাস-পরিক্রমা ঠিক ঠিক আরম্ভ হয়। পাশেই কৈলাসশ্রেণী। এত উঁচু ও খাড়া যে তাকাতে ভয় হয়। কার্লেপ নদী অতিক্রম করার পর আর কৈলাস দেখা যায় না।

লা-চুর তীরে তীরে অনেক স্থানেই বিরাট বিরাট জমাটবাঁধা পাথর (conglomerated rock) পড়ে আছে। ঐ পাথরগুলি দেখে মনে হয় যেন কোন রাসায়নিক উপায়ে ছোট ছোট নুড়ি-পাথর জমিয়ে প্রকাণ্ড পাথরে পরিণত করা হয়েছে। কৈলাসগিরিশ্রেণীর ধার ঘেঁসে দেখতে দেখতে চলেছি। মনে হচ্ছিল যে সমগ্র গিরিশ্রেণীই একটি জমাটবাঁধা

পর্বত। ইতঃপূর্বে তীর্থাপুরী ও অন্যান্য স্থানে যাবার পথে নুড়িপাথর-সমাকীর্ণ বালুকাময় স্থানের উপর দিয়ে মাইলের পর মাইল অতিক্রম করতে হয়েছিল। যেতে যেতে মনে হত যেন নদীর চড়া। আমরা এ পর্যন্ত সতের হাজার ফিটের বেশী উপরে উঠেছি। অত উচ্চ মালভূমিতে কি করে কোথা থেকে এত নুড়িপাথর ও বেশ মোটা দানার বালি আর এই জমাট-বাঁধা পাথর এল, তা গবেষণার বিষয়। পশ্চিম তিব্বতের নানাস্থান ঘুরে এই ধারণা হয়েছে যে, বহু লক্ষ বৎসর পূর্বে সমগ্র তিব্বতই সমুদ্রগর্ভে ছিল। কোন সময়ে বি ... অগ্ন্যুদ্গারের ফলে সমুদ্রগর্ভ স্ফীত হয়ে পর্বতমালাসমেত তিব্বতের মালভূমির সৃষ্টি হয়। কৈলাস-গিরিশ্রেণী দেখে এই ধারণা আরও বদ্ধমূল হয়েছে।

লা-চুর ধারে ধারে কৈলাস-পরিক্রমা করে চলেছি। পথে অনেক তিব্বতী যাত্রীর সঙ্গেও দেখা হল। কেউ কেউ দণ্ডপরিক্রমা করছে। এই দুর্গম পথে অনাবৃত দেহে প্রস্তরময় পথরেখার উপর দণ্ড দিতে দিতে কী কষ্ট করেই না তারা এগুচ্ছে। তাদের তিতিক্ষা দেখে আনন্দ ও বিস্ময়ে শরীর রোমাঞ্চিত হয়। নিজেদের কষ্টের কথা ভুলে যাই। এদের ভক্তির গভীরতা ও প্রাণের ঐকান্তিকতা বড়ই মর্মস্পর্শী। দণ্ডবৎ হয়ে পাথরের উপর শুয়ে পড়ে। পুনরায় দাঁড়িয়ে উঠেই ভক্তিভরে করজোড়ে কৈলাস-পতির উদ্দেশ্যে প্রাণের শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করছে। এদিকে সর্বক্ষণ চলছে—'ওঁ মণিপদ্মে হুং' মন্ত্র-আবৃত্তি। গাইড জিজ্ঞাসা করে জানল তারা লাসার নিকটের লোক। কৈলাসপতির দর্শন ও দণ্ডপরিক্রমাদ্বারা তাঁকে প্রসন্ন করে পূর্বজন্মার্জিত পাপক্ষয় করার জন্য এসেছে এতদূরে। এই দণ্ড-পরিক্রমায় লাগবে প্রায় একমাস। খুব ভোরে উঠে অভুক্ত অবস্থায় পরিক্রমা আরম্ভ করে এবং দ্বিপ্রহর পর্যন্ত এই ভাবে দণ্ড দিয়ে অগ্রসর হয়

পরিক্রমার পথে। পরে পথের পাশেই কোনস্থানে বিশ্রাম ও আহারাদি হয়। সঙ্গে আরও লোক রয়েছে। সাধারণতঃ প্রত্যেক গ্রামের পক্ষ হতে দেবদেবের প্রসন্নতালাভ করে সকল গ্রামবাসী ও গৃহপালিত পশুগণকে বিপন্মুক্ত করার জন্য একজন ব্রতী হয় এবং এই কঠোর ব্রত-উদ্‌যাপন করে পূজাদি-সমাপনান্তে স্বস্থানে ফিরে যায়।

ভারতাগত চার-পাঁচ দল যাত্রীর সঙ্গেও দেখা হল। গার্বিয়াং-এ যাদের ছেড়ে এসেছিলাম তাদের তিনটি দল এতদিনে এসে পৌঁছেছে। একদল যাত্রী বিশেষ বিপদগ্রস্ত ও অসুস্থ হয়ে ফিরে যেতে বাধ্য হয়।

বেলা প্রায় দুটার সময় ডিরিফুতে এসেছি। ডিরিফু গুম্ফার ঠিক বিপরীত দিকে লা-চুর ধারে আমাদের তাঁবু পড়ল। সকলেই অর্ধমৃত ও জরাজীর্ণ। কোনরকমে শুতে পারলেই বাঁচি। শরীর যেন চির-বিশ্রাম চায়। সহনশক্তির শেষ সীমায় এসে পৌঁছেছে, অথচ এখনও বাকী অনেকটা।

এতক্ষণে বহু লামাবেশধারী ভিক্ষুক এবং কৈলাসধূপ ও বিভূতি-বিক্রেতা তাঁবুর চারিদিকে ভিড় জমিয়েছে। কৈলাসধূপ আর কিছু নয়—স্থানীয় ঘাস-বিশেষ—জ্বালালে বেশ মিষ্টগন্ধ। আর কৈলাস-বিভূতি—এখানকার একপ্রকার সাদা নরম পাথর—খড়িমাটির মতন। ভিক্ষুকদের সকলকে ছাতু গুড় ও সিগারেট দিয়ে পরিতৃপ্ত করা হল। সামান্য আহারাদি শেষ করতে বেজে গেল প্রায় চারটে।

প্রায় ত্রিশ মাইল পরিক্রমা-পথে ডিরিফু-ই কৈলাসশিখরের সর্বাপেক্ষা বেশী নিকটে। সরল রেখাক্রমে দূরত্ব বোধ হয় তিন মাইলের বেশী নয়। কৈলাসের এত কাছে এসে সমগ্র প্রাণমন এক অপার্থিব আনন্দে ভরে উঠেছে। এতদিনের দুর্গম পথযাত্রা আজ সার্থক। কৈলাসের শোভাও

এস্থান হতে অনুপম। পবিত্র চূড়াটি দেখাচ্ছিল ঠিক যেন একটি বিরাট স্ফটিকস্তম্ভ—সূর্যকান্তমণি প্রতিবিম্বিত হয়ে স্বর্ণময়!

কৈলাস নামটি খুব সম্ভব 'কেলাস' শব্দ হতে উৎপন্ন। হিমালয়ের পার্বত্য অধিবাসীরা 'কেলাস'ই বলে থাকে। স্ফটিকের মতন স্বচ্ছ ও শুভ্র—সেইজন্যই বোধ হয় কৈলাস। আমার কেবলই মনে হচ্ছিল—কি করে কৈলাসের আরও কাছে যাওয়া যায়। আহারের পরে সকলেই তাঁবুর ভিতর বিশ্রাম কচ্ছেন। এমন সময় ধীরে ধীরে তাঁবুর বাইরে এসে একদৃষ্টে কৈলাসশিখরের দিকে বিহ্বলপ্রাণে তাকিয়ে রইলাম। এক অজ্ঞাত আনন্দে দেহ পুলকিত। প্রাণে অনুভব করলাম আরও এগিয়ে যাবার এক দুর্দমনীয় আকর্ষণ। নিজেকে আর সামলাতে পারলাম না। গাইডকে ইঙ্গিত করে তৃষিতনয়নে এগিয়ে চলেছি। খানিকটা বেশ খাড়া চড়াই। প্রায় আধ মাইল পরে উঠলাম এক শৈলশিরার উপর। আহা! কী অনুপম! পাদদেশ হইতে শিখর পর্যন্ত সমগ্র কৈলাস বেশ পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে—সামনে কোন বাধা নেই! আর অত কাছে! দেখে দেখে বেড়ে যাচ্ছিল অতৃপ্তি। ইচ্ছা হচ্ছিল বুকের ভিতর টেনে নিতে, পদতলে লুণ্ঠিত হতে। ঐ শৈলশিরা থেকে নেমে এগিয়ে চলেছি। খুবই প্রস্তরবহুল ও বিপদসঙ্কুল স্থান। পড়ছি—আবার চলছি। উত্তেজনা ও আবেগে বিন্দু বিন্দু ঘাম বেরুচ্ছে সর্বাঙ্গে। ক্রমে নেমে এলাম এক বরফের নদীর ধারে। চারিদিকে স্তূপাকার বরফ, মাঝে বরফাচ্ছাদিত নদীগর্ভ। নদীর উপরকার বরফ স্থানে স্থানে ফেটে গিয়ে ফোয়ারার আকারে জল উঠছিল সশব্দে। বরফের উপর দিয়ে নদীর তীরে তীরে অগ্রসর হচ্ছি। ঐ নদীটি যে-করেই হোক অতিক্রম করতে হবে। অথচ পার হবার অনুকূল স্থান কোথাও পাচ্ছি নে। বরফের নীচ দিয়ে কুলকুল

শব্দে জল বয়ে যাচ্ছে—শুনতে পাচ্ছি। তাতে মনে হল বরফ খুব পুরু নয়। বরফের উপর দিয়ে হেঁটে পার হতে গেলে বরফ ভেঙ্গে নদীগর্ভে ডুবে যাবার সম্ভাবনা। অনুকূল স্থান দেখতে দেখতে এগিয়ে চলেছি। একস্থানে হিলস্টিক ও পাথর মেরে পরীক্ষা করে মনে হল বেশ পুরু বরফ। উপর দিয়ে পার হওয়া সম্ভব। মরিয়া হয়ে ঐ বরফের উপর দিয়ে খুব দ্রুতবেগে কোনপ্রকারে পরপারে এলাম। গাইডও এল।

পথের কোন চিহ্ন নেই। পথের সন্ধানের প্রয়োজনও নেই। কৈলাস-পাদমূল লক্ষ্য করে সামনের দিকে এগিয়ে চলেছি। এখন এক গিরিখাতের ভিতর দিয়ে কোন রকমে হামাগুড়ি দিয়ে পাথর ধরে ধরে উপরে উঠতে লাগলাম। এ স্থানের বরফ সবেমাত্র গলে গেছে—উন্মুক্ত প্রস্তরস্তূপ। মহাবিপদসঙ্কুল স্থান—বিপদময় মুহূর্ত। কোন প্রকারে একটি মাত্র প্রস্তর স্থানচ্যুত হয়ে গড়ালেই সব শেষ। শ্রীভগবানের চরণে আত্মনিবেদন করা ছাড়া অন্য উপায় নেই। কাঁচখাম্পা পা পিছলে পড়ল—গড়াতে গড়াতে দশ-বার ফুট নীচে। দৈবকৃপায় বিশেষ আঘাত লাগে নি। হাঁপাতে হাঁপাতে উঠে এল। সামনে আশেপাশে সর্বত্র বরফ। এ-ই ঠিক ঠিক বরফের রাজ্য। বরফের উপর দিয়ে খুবই সন্তর্পণে যাচ্ছি, তবু পা পিছলে ছিট্‌কে পড়ে গেলাম। কোমর পর্যন্ত অসাড় হয়ে পক্ষাঘাতের মতন হয়েছে—আর পা তো চলছে না। উপায়? ফিরে যাব কি? —না। কোথায় যাব ফিরে? ক্রমে সর্বাঙ্গ অসাড় হয়ে আসছে। কোথাও হাঁটু পর্যন্ত ডুবে যাচ্ছে—বরফের ভিতর। বরফাচ্ছাদিত এক অতি সংকীর্ণ শৈলশিরার উপর দিয়ে বসে বসে চলেছি। দাঁড়িয়ে হেঁটে যাওয়া অসম্ভব—এতই সংকীর্ণ। কোন প্রকারে ডানে বা বাঁয়ে গড়িয়ে পড়লেই একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে হবে। এখন চারিদিকেই শুভ্র তুষার।

এত উজ্জ্বল যে চোখ ঝলসে যায়। অন্ধের মতন হাতড়ে হাতড়ে চলেছি সেই বিরাট পুরুষের চরণ স্পর্শ করবার জন্য। অন্তরে বিপুল উৎসাহ, অনন্ত আশা কিন্তু শক্তি যেন নিঃশেষ হয়ে গেছে! তবু নিজেকে টেনে টেনে চলেছি।

শৈলশিরার শেষ প্রান্তে এসে—আহা! এ কী দেখছি? এতো সৌন্দর্য নয়—এ যে লোকোত্তর দ্যোতনা! সে দৃশ্য কৈলাসের স্মৃতির সঙ্গে মানসপটে চিরতরে অঙ্কিত হয়ে রয়েছে। সম্মুখে প্রায় এক মাইলব্যাপী বরফাচ্ছাদিত অপেক্ষাকৃত সমতল স্থান। দুপাশে বরফের পাহাড় দ্বারা সুরক্ষিত বিরাট নাটমন্দিরের মতন। আর শেষপ্রান্তে তুষারময় পট-ভূমিকায় রজতশুভ্র কৈলাসশিখর বিরাজমান। সদাশিবের পাদমূল হতে সর্বোচ্চ শিখর পর্যন্ত সর্বাঙ্গই এস্থান হতে দর্শন হয়। কৈলাসপতির বিভূতি-ভূষিতাঙ্গে অস্তগামী সূর্যের রক্তিমচ্ছটার মিশ্রণ এক অনুপম রূপমাধুরীর সৃষ্টি করেছিল। স্তব্ধ হয়ে গেলাম। মুগ্ধনেত্রে বিহ্বলপ্রাণে তৃষিতের মতন চেয়ে রইলাম। নীরব নিথর আবেষ্টনী—ধ্যান-গম্ভীর। আবেগ উত্তেজনা শ্রদ্ধা ও আনন্দ-উল্লাসে হৃদ্‌পিণ্ডের ক্রিয়া যেন বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। স্থাণুর মতন দাঁড়িয়ে অতৃপ্ত ক্ষুধা নিয়ে বুভুক্ষুর মতন চেয়ে রইলাম। এ দেখার যেন কখনও শেষ না হয়। যুগযুগান্তর—অনন্তকাল ধরে যেন শুধু চেয়ে থাকতে পারি। আর কিছু চাইবার নেই, পাবারও নেই।

এখনও মনে হয়, ঐ স্থান জাগতিক কোলাহলের—যাবতীয় দ্বন্দ্বের কত দূরে! আহা, কত ঊর্ধ্বে।

আরও নিকটে যাবার দুর্দমনীয় আকর্ষণে বরফের উপর দিয়ে এগিয়ে চলেছি। দেহে এসেছে নব বল—প্রাণে বিপুল আনন্দ। বরফের ভিতর হাঁটু পর্যন্ত ঢুকে যাচ্ছে, কিন্তু কোন কষ্ট নেই। ঠাণ্ডা বা শ্বাসকষ্ট কিছুই

বোধ হচ্ছে না। শরীর হালকা হয়ে গেছে—যেন শূন্যে ভেসে চলেছি। এক বরফের খাতের ভিতর কীচথাম্পার কোমর পর্যন্ত ঢুকে গেল। কোন রকমেই উঠতে পাচ্ছে না। যত ধ্বস্তাধ্বস্তি করছিল ততই যেন আরও তলিয়ে যাচ্ছিল। উপায়? হাতধরে অনেক টানাটানি করে তাকে তোলা গেল। হঠাৎ চারিদিকের পর্বতগাত্র কম্পিত করে এক বিরাট কর্কশ শব্দ হল এবং সঙ্গে সঙ্গে তার প্রায় দু'মিনিট পরে বজ্রনির্ঘোষের মতন কর্ণবধির শব্দ! যেন পর্বতচূড়া খসে পড়েছে। আমাদের নিকটেই—উপর হতে কোন প্রকাণ্ড জিনিস সজোরে পড়ল। দু'জনেই সভয়ে হতবুদ্ধি হয়ে নিশ্চলভাবে দাঁড়িয়ে রইলাম। পর্বতগাত্রে-গাত্রে তীব্র প্রতিধ্বনি হচ্ছে—যেন ভূত-প্রেতের বিকট কোলাহল!

গাইড ধীরে ধীরে বলল, "স্বামীজী, আর আগে বেড়ো না, ফিরে চল। কৈলাসদর্শন তো বেশ ভালভাবেই হয়েছে। কিন্তু এগিয়ো না বলছি। শিবজীর অনুচর আর ভূতপ্রেতেরা বরফ ছুঁড়ে মারছে। আর এগিয়ে যেতে দেবে না। কোন মর্ত্যবাসীকেই এগুতে দেওয়া হয় না। তাদের নিষেধ না শুনে এগিয়ে গেলে দু'জনেরই মৃত্যু অনিবার্য।"

খুব শান্তভাবে তাকে বললাম, "তুমি ফিরে যাও। কৈলাসের পাদদেশ স্পর্শ না করে আমি ফিরে যাব না। আমার মৃত্যু-পণ! ফিরে যাবার জো নেই।" শুনে কীচথাম্পা চুপ করে রইল। পুনরায় বললাম, "ঐ যে ভীষণ বজ্রনির্ঘোষের মতন শব্দ শুনেছ, তা হিমবাহের পতনশব্দ। কৈলাস-শিখর হতে ওরকম হিমবাহ গড়িয়ে পড়ে। মহাভাগ্য যে আমাদের উপর না পড়ে খানিকটা দূরে পড়েছে। শিবজী একবার যখন প্রাণ বাঁচিয়েছেন, তখন ভবিষ্যতেও তিনি রক্ষা করবেন—এই আমার দৃঢ় বিশ্বাস। তাঁকে ডাক। বাঁচাবার মালিক তিনিই। আর যদি না-ই

বা বাঁচান তা হলেও এমন মহা পবিত্র স্থানে শ্রীভগবানের নাম নিতে নিতে মরা তো মহাভাগ্যের কথা। তুমি ফিরে যাও। তোমার পরিজনবর্গ আছে।" কীচথাম্পা চুপ করে রইল। দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে বলল, "আমি তোমাকে ছেড়ে যেতে পারব না। চল এগিয়ে যাই, যা হবার হবে। মরতে হয় একসঙ্গেই মরব।"

দু'জনেই পাশাপাশি নিঃশব্দে ধীরে ধীরে এগুচ্ছি। কথা বলতেও ভয় হচ্ছিল পাছে শব্দের স্পন্দনেই হিমবাহের পতন হয়। এখন যে স্থানটির ভিতর দিয়ে অগ্রসর হচ্ছি তার প্রসারতা পাঁচশত ফুটের বেশী নয়। দু'ধারেই চিরতুষারাবৃত অত্যুচ্চ পর্বত কৈলাসের প্রবেশ-দ্বার বেষ্টন করে রয়েছে। চোখ-ঝলসান বরফ। সর্বত্রই একটা মহাভীতিপ্রদ নিস্তব্ধতা। কৈলাস-শৃঙ্গের যত কাছে এগুচ্ছি ততই গতিবেগ কমে আসতে লাগল। ক্লান্তিতে কীচথাম্পা আর চলতে পারছে না।

কৈলাসপাদমূল হতে তখনও চার-পাঁচ শত গজ দূরে—এমন সময় এক অতি গম্ভীর ওঁকার-ধ্বনি শুনতে পেলাম। এগিয়ে চলেছি। ঐ ওঁকারধ্বনি ক্রমে আরও স্পষ্ট শুনা যাচ্ছে। কী গম্ভীর নাদধ্বনি! প্রলয়ের মহামৌনের মাঝে যে শাশ্বতধ্বনি প্রচ্ছন্ন ছিল, তা-ই যেন শুভ্র উচ্ছলিত হয়ে উঠল। ক্রমে জোর হতে হতে প্রবল তরঙ্গাকারে আবর্তমান ঐ ধ্বনিতে পরিব্যাপ্ত হয়ে গেল চারিদিক। সেই নাদধ্বনির মধ্যে ডুবে গেছি। ভিতরে বাইরে সেই অনাহত শব্দের স্পন্দন। মনে হল যেন ব্যোমপথে ভেসে আসছে ঐ মধুর ওঁকারনাদ। এক অব্যক্ত আনন্দে আত্মহারা—সুখ নেই দুঃখ নেই—অতীত নেই ভবিষ্যৎ নেই—সমগ্র সত্তা যেন ডুবে আছে সেই অ-উ-ম ধ্বনির মধ্যে।

ঐ স্থানের উচ্চতা প্রায় বিশ হাজার ফুট। শ্বাসকষ্ট মোটেই

বোধ হচ্ছিল না। উচ্চতা ও আবেষ্টনীর তুলনায় ঠাণ্ডাও কম। যদিও আমি হঠাৎ বেরিয়ে এসেছিলাম গায়ে যা ছিল তা-ই নিয়ে—এদিকে আস্‌বার কোন আয়োজন ছিল না—কিন্তু তাতেও শীতবস্ত্রের কোন অভাব বোধ করতে হয় নি। প্রাণে বয়ে যাচ্ছিল এক অনির্বচনীয় আনন্দহিল্লোল। এখনও এতকাল পরেও সেই আনন্দস্মৃতি প্রাণে আনে এক দিব্য পুলক, আর রোমাঞ্চিত ক'রে তোলে তনু-প্রাণ-মন।

কৈলাস-পাদমূলের আর একশত ফুট মাত্র বাকী। এমনই স্থানে বরফের উপর দেবদেবের চরণে সাষ্টাঙ্গে প্রণত হলাম। গড়াগড়ি দিয়েও তৃপ্তি হয় না। লুণ্ঠিত হয়ে আবেগভরে ঐ স্থানটিতে মুখ ঘষড়াতে ঘষড়াতে পড়ে রইলাম অনেকক্ষণ। কানে ভেসে আসছিল সেই মধুর ওঁকারধ্বনি। প্রাণ মাতোয়ারা করে তুলেছিল।

উঠে এগিয়ে চলেছি আরও কাছে পাদমূল স্পর্শ করবার জন্য। কিন্তু ঠিক পাদমূলে পৌঁছে একেবারে হতাশ হয়ে গেলাম। স্থানটি এমনই বরফাচ্ছাদিত যে পাদমূল স্পর্শ করা অসম্ভব। নিদারুণ ব্যর্থতার আঘাতে প্রাণ কেঁদে উঠল। এত দুঃখকষ্টের ভিতর দিয়ে প্রাণের মায়া তুচ্ছ জ্ঞান করে এতদূর আসার পরে ব্যর্থমনোরথ হয়ে ফিরে যাওয়া! আবেগে নিজের অজ্ঞাতসারেই দু'গণ্ড প্লাবিত করে বয়ে যেতে লাগল অশ্রুজল। অথচ নিরুপায়। হঠাৎ মনে হল বরফ সরিয়ে পাদমূল স্পর্শ করা তো সম্ভব হতে পারে? হিল্‌স্টিকের সাহায্যে বরফ ভেঙ্গে দু'জনেই একটু স্থান পরিষ্কার করতে লাগলাম। বরফ মুক্ত করতে করতে প্রায় দেড় হাত নীচে পাথরের সন্ধান পাওয়া গেল। আনন্দে আর জ্ঞান রইল না। কৈলাসপতির জয়ধ্বনি করে উঠলাম। আহ্লাদে আর সংযম মানল না। সাশ্রুনয়নে মুখ চেপে আদরে আদরে স্থানটিকে ভরিয়া দিলাম। পবিত্র প্রস্তর

স্পর্শ করে অনেকক্ষণ পড়ে রয়েছি। সেই বিরাটের চরণে চাইবার কিছুই ছিল না। শুধু চাইছি তাঁকে। তিনি যে অন্তরে বাইরে পরিপূর্ণ হয়ে রয়েছেন। মহাপবিত্র কৈলাসের চরণ চুম্বন করতে পেয়ে কৃতকৃতার্থ হয়েছি। কীচখাম্পা অতি কষ্টে হিলষ্টিকের সাহায্যে কৈলাসের পাদমূল থেকে ছোট ছোট কয়েক খণ্ড প্রস্তর আহরণ করে নিল।

ততক্ষণে সূর্য অস্ত গিয়েছে। শেষ স্বর্ণরেখার আভা কৈলাসশিখরকে শোভাময় করেছিল। সন্ধ্যা ও রাত্রির সন্ধিক্ষণে ঐ পুণ্য মুহূর্তে দেবদেবের চরণে প্রাণের ভক্তি-অর্ঘ্য নিবেদন করে দু'জনেই ধীরে ধীরে পিছনে ফিরে প্রত্যাবর্তন আরম্ভ করলাম। স্থানের এমনই একটা দিব্য আকর্ষণ যে, ছেড়ে আসতে মোটেই ইচ্ছা হচ্ছিল না। বার বার কৈলাসের দিকে তাকাচ্ছি—প্রণতি জানাচ্ছি। অনেক দূরে আসার পরে প্রাণের ভিতরটা উচ্ছ্বাসে কেঁদে উঠল। জীবনে আর কখনও এ মহাপবিত্র স্থানে আসা হবে না। বিরাটপুরুষ নিজ মহিমা বিস্তার করে আপনার ধামেই বিরাজমান রইলেন; দূরে চলে যাচ্ছিলাম আমি-ই। সঙ্গে বয়ে চলেছি শুধু স্মৃতি, চিরন্তন পুণ্যমধুর স্মৃতি, বিপুল আনন্দ আর সামান্য কয়েক খণ্ড পবিত্র প্রস্তর।

চুপচাপ দ্রুত এগিয়ে চলেছি। সর্বত্রই একটা ধ্যানমগ্ন প্রশা[illegible]। অন্ধকার ক্রমেই নিবিড় হয়ে এসেছে। অনন্ত আকাশ ভরে গিয়েছিল স্তব্ধ কুতূহলী সারি সারি নক্ষত্র-মণ্ডলীতে। অবাক্ দৃষ্টিতে তারা যেন লক্ষ্য করেছিল আমাদের গতিবিধি। সেই বরফের নদীর ধারে এসে কীচখাম্পা বললে, "আজ আমরা যেস্থানে গিয়াছিলাম, কোন হুনিয়াও (তিব্বতের অধিবাসীদের হুনিয়া বলা হয়) সেখানে যেতে সাহস করে নি। আমি তো এযাবৎ যাত্রী নিয়ে প্রায় পঞ্চাশ বার কৈলাসে এসেছি, কিন্তু এর পূর্বে কোন যাত্রীই কৈলাসের পাদমূলে যায় নি, আর কেউ

গিয়েছে বলেও শুনি নি। আজ তোমার সঙ্গে আমারও দর্শন হয়ে গেল।"

তাঁবুতে যখন ফিরে এলাম তখন রাত্রি সাড়ে-আটটা। আমাদের নিরুদ্দেশ দেখে যাত্রীরা খুবই শঙ্কিত হয়ে পড়েছিলেন। নিরাপদে ফিরতে দেখে সকলেই নিশ্চিন্ত হয়েছেন এবং কৈলাসের পাদমূলের পবিত্র প্রস্তর মস্তকে ধারণ করে নিজেদের কৃতার্থ জ্ঞান করলেন। ঐ স্থানের গল্প করতে অনেক রাত পর্যন্ত মহা আনন্দে কেটে গেল।

খুব ভোরেই ডিরফুক্‌কে ছেড়ে চলেছি। আর কোন যাত্রী তখনও পথে বের হয় নি। পথে বরফ বেশী ছিল না, অনেক বরফই গলে গিয়েছে। প্রস্তরসমাকীর্ণ স্থানের উপর দিয়ে পথরেখা ধরে অগ্রসর হচ্ছি। আধ মাইল পরেই আরম্ভ হল চড়াই।

লা-চুর অপর তীরে ডিরফুক্ গুম্ফা। দেখতে যাওয়া হয় নি! কাল বিকালে যাবার কথা ছিল কিন্তু আমি নিরুদ্দেশ হয়ে গিয়াছিলাম বলে সঙ্গীরা কেউ গুম্ফা দেখতে যান নি। গুম্ফা দেখার পরে আজ আর এগিয়ে যাওয়া সম্ভব হত না—সেজন্য স্থগিত রইল। লা-চু নদীটি বেশ প্রশস্ত। জল অবশ্য বেশী নয়; হেঁটে পার হওয়া যায়। গুম্ফা দেখা যাচ্ছিল। বেশ বড় ও সুন্দর। শুনেছি ঐ গুম্ফার উপর হতে কৈলাসের দৃশ্য অতি মনোরম।

ক্রমে ভারতীয় যাত্রিদল এবং দণ্ডপরিক্রমাকারীরাও বেরিয়ে পড়েছে। ডিরফুক্ হতে দোলমা-লা প্রায় তিন মাইল। শেষের দিকটা খাড়া চড়াই। কৈলাসযাত্রাপথে বা পশ্চিমতিব্বত-ভ্রমণকালে দোলমা-লাই সর্বোচ্চ স্থান অতিক্রম করতে হয়। উচ্চতা ১৮,৬০০ ফুট। তিব্বতী ভাষায় 'লা' শব্দের অর্থ গিরিদ্বার।

দোলমা-লার প্রায় অর্ধেকটা উঠেছি এমন সময় ভারতীয় এক যাত্রিদলের ঝোব্বু হঠাৎ ভয় পেয়ে পিঠের বোঝা সমেত উন্মত্তের মতন ছুটতে আরম্ভ করেছে। তা দেখে অন্য ঝোব্বুগুলিও খুবই চঞ্চল হয়ে পড়ল—সবই বেসামাল অবস্থা। খানিক দৌড়বার পরেই ঝোব্বুটার পিঠ থেকে সমস্ত বোঝাটি পড়ে গিয়ে গড়াতে গড়াতে চার-পাঁচ শত ফুট নীচে ডান হাতি গিরিখাতের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল। বোঝামুক্ত পশুটি নির্বিকার চিত্তে অবাক্ বিস্ময়ে দেখছিল বোঝাটি কিভাবে গড়িয়ে পড়ছে। তার দার্শনিক-সুলভ নিস্পৃহভাব দেখে দুঃখের ভিতরও পাচ্ছিল হাসি। ঝোব্বুর পিঠের বোঝাটি বোঝা না হয়ে মানুষ হলে যে কী অনর্থই হত!

পূর্বদিন খবর পেয়েছিলাম পাঞ্জাবী যাত্রিদলের কোন বৃদ্ধা ঝোব্বুর পিঠ থেকে বোঝার মতন পড়ে গিয়ে হাড়গোড় ভেঙ্গে একেবারে পঙ্গু হয়েছে। ঘোড়া অপেক্ষা ঝোব্বু বোঝা বইতে পারে বেশী, আর কম ভাড়ায়ও পাওয়া যায়। কিন্তু ঐ জন্তুগুলি অনেক সময়ই ক্ষিপ্ত হয়ে বহু অনর্থের সৃষ্টি করে। অনেকে খরচ কমাবার জন্য ঝোব্বু ভাড়া করে অকালে প্রাণ হারায়। এসব বিপদের বিষয় জেনেই আমরা ঘোড়া ও খচ্চর ভাড়া করেছিলাম। ঝোব্বু চামরী ও গৃহপালিত গরুর সং[illegible]শে জাত গৃহপালিত পশুবিশেষ। দেখতে বিরাটকায়—মোষের চাইতেও বড় আর শক্তিও খুব। তিব্বতীরা ঝোব্বুর দুধ খায় আর মেরে মাংসও খেয়ে থাকে। শীতকালে বরফের সময় একটি ঝোব্বু মারা হল তো এক মাস দেড় মাস ধরে মাংস খেতে পারে। ঠাণ্ডার দরুন মাংস নষ্ট হয় না। অনেক সময় শীতকালে একস্থান হতে অন্যস্থানে ছাগল ভেড়ার দল নিয়ে যাবার সময় অতর্কিতভাবে তুষারাক্রান্ত হয়ে সমস্ত পশুগুলিই তুষারের নীচে চাপা পড়ে যায়। ছয়মাস পরে বরফ যখন গলে যায় তিব্বতীরা ঐ

মৃত পশুগুলি নিয়ে গিয়ে তার মাংস ব্যবহার করে। বরফচাপা থাকে বলে এত দীর্ঘকালেও ঐ মাংস নষ্ট হয় না।

শেষ দিকটায় খুবই কঠিন চড়াই। ঘোড়া খচ্চরগুলি পর্যন্ত উঠতে পারছিল না—দশ পা উঠেই দাঁড়িয়ে পড়ে। অনেক যাত্রীই পথের ধারে শ্বাস-কষ্টের দরুন বসে পড়েছিল—একপাও আর এগুবার শক্তি নেই। কেউ বা হাঁপানী রোগীর মতন হাঁপাচ্ছে। ঐ কষ্ট দেখতেও প্রাণে বড় ব্যথা লাগে।

এতক্ষণে অরুণালোকে চারিদিক পুলকিত হয়ে উঠেছে। নীল নভস্তলে বালার্কের হাসি-উজ্জ্বল আবির্ভাব! সব কষ্ট ভুলে যাচ্ছি প্রকৃতির শোভাময় প্রকাশের দিকে তাকিয়ে। ধীরে ধীরে উঠছি—কেবলই উঠছি। কোনরকমে দোলমা-লাতে পৌঁছান গেল। এস্থান হতে গগনস্পর্শী কৈলাস-শিখরটি দেখা যায় ঠিক সামনে—মাঝে কোন বাধা নেই। কী স্বচ্ছ শান্ত মনোরম ও ধ্যানগম্ভীর! দেখে প্রাণ জুড়িয়ে গেল—সব কষ্টই সার্থক হয়েছে। প্রথম দৃষ্টিতে কৈলাসচূড়াটি স্ফটিক বা শ্বেতমর্মর-নির্মিত একটি বিরাট মন্দিরের চূড়া বলে ভ্রম হয়। ঐ চূড়ার সামনেই প্রকাণ্ড নাটমন্দির আর দু'পাশের বরফচূড়া দুটি যেন গোপুরম্। শাস্ত্রে কৈলাসকে শিবপুরী বলেছে। অবশ্য বিংশতি শতাব্দীর সভ্য জগতের কাছে ওসব কথা বলা চলে না—ওসব হল অবাস্তব রূপকথা। কিন্তু ঐ সভ্যতার বাইরে দাঁড়িয়ে ওকথা বিশ্বাস করতে বিন্দুমাত্রও দ্বিধা বোধ হয় না। হতে পারে এ একটা কল্পনামাত্র কিন্তু অর্থপূর্ণ মধুর কল্পনা।

দোলমালাতে অনেকক্ষণ বসে ঐ অনুপম সৌন্দর্যসুধা প্রাণভরে পান করতে লাগলাম। যুগযুগান্তর ধরে দেখলেও যেন তৃপ্তি হয় না। সেই ধ্যানমৌন প্রশান্তি মনের উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করে, মনকে শান্তিময় করে দেয়।

এতক্ষণে দোলমালার উপরে অনেক তিব্বতী ও ভুটিয়া যাত্রী সমবেত হয়ে উচ্চৈঃস্বরে অবোধ্য মন্ত্রাদি পাঠ করতে আরম্ভ করছে। ঐ মন্ত্র ভূত-প্রেতের উৎপীড়ন থেকে বাঁচাবে—এই তাদের বিশ্বাস। দোলমালাতে—দোলমা নামক এক প্রকাণ্ড পাথর আছে। তিব্বতীরা ঐ প্রস্তরটিকে দেব-বিগ্রহের মতন মহাপবিত্র জ্ঞান ক'রে, মাখন ও ঘৃত লিপ্ত ক'রে সাজায় এবং নানা পূজোপকরণ নিবেদন করে। সেই প্রস্তরটির উপর মৃত আত্মীয়দের দাঁত চুল হাড় ইত্যাদি সাজিয়ে দেয়। প্রস্তরটির পাশে ছাগল-ভেড়ার শিং স্তূপীকৃত আছে—বোধ হয় সে সবও দেবতার উদ্দেশ্যে নিবেদিত। পাশেই ডালসমেত একটা শুকনো গাছ প্রোথিত রয়েছে আর তাতে উড়ছে নানা রং-এর নিশান।

আমরা উঠেছি খুবই উঁচুতে। কৈলাসশিখর ছাড়া আর সকল পর্বতই আমাদের নীচে। রৌদ্রোজ্জ্বল আকাশ যেন মাথায় ঠেকছিল। উন্মুক্ত চারিদিক। দৃষ্টির সকল বাধা ঘুচে গেছে। জীবনেও বোধ হয় এমনই হয়। জীবনের গতি যখন সকল গণ্ডী, সকল সীমা, সংকীর্ণতা ও দ্বন্দ্বের ঊর্ধ্বে চালিত করতে পারা যায়, তখনই উহা রূপান্তরিত হয় মহৎ জীবনে।

দোলমালার চারশত ফুট নীচে গৌরীকুণ্ড। পুরাণে আছে শিব-সতী পার্বতী নিত্যস্নান করেন ঐ গৌরীকুণ্ডে। খুবই খাড়া উৎরাই ও প্রস্তর-বহুল পথ। সকলেই চলেছি হেঁটে। তিব্বতীরা গৌরীকুণ্ডকে 'থুজীম্ব' বলে। কুণ্ডে স্নান করব স্থির করেছিলাম। কিন্তু কুণ্ডের ধারে এসে যা দেখা গেল, তাতে প্রাণ কেঁপে উঠল মহা আতঙ্কে। স্নান করব কি? জল কোথায়? সমস্ত কুণ্ডটিই বরফাচ্ছাদিত। বরফ ভাঙ্গা যাবে কি করে? আর নীচে জল আছে কি? শুনেছিলাম শীতকালে সমগ্র মানসসরোবর ও রাক্ষসতালও জমে বরফ হয়ে যায় কিন্তু ঐ বরফের নীচে জল থাকে।

১৮,২০০ ফুট উচ্চ তুহিনাবৃত স্থানে বরফ ভেঙ্গে জল যদিও বা পাওয়া. যায় কিন্তু ডুব দেওয়া যাবে কি করে? গাইডের সঙ্গে পরামর্শ করে কয়েকজন মিলে কুণ্ডের বরফের উপর বড় বড় পাথর গড়িয়ে ফেলতে লাগলাম। পাথর মেরে মেরে খানিকটা স্থানের বরফ তো ভাঙ্গা গেল, জলের সাক্ষাৎও মিলল কিন্তু ঐ জলের নীচেও যে আবার স্তূপাকার নীলাভ বরফ। উপরে বরফ নীচে বরফ মাঝে তিন-চার ফুট মাত্র জল। পূর্বে গঙ্গার উৎপত্তিস্থান গোমুখীতে দেখেছিলাম—এমনি ধারা নীলবরফ জলের নীচে জমে আছে। এক-দেড ফুট পুরু বরফ ভেঙ্গে ভেঙ্গে নেমে ডুব দেবার মতন একটা গর্ত তো করা হল। কিন্তু জলে একটু হাত ডুবাতে হাত অবশ হয়ে যায়। বরফের মতন ঠাণ্ডা দৃষ্টান্ত-হিসাবে বলে কিন্তু এ বরফের অপেক্ষাও অনেক ডিগ্রি বেশী ঠাণ্ডা। দৃঢ় সঙ্কল্প যে স্নান করতেই হবে। প্রস্তুত হতে লাগলাম। ধূপবাতি জেলে গৌরীকুণ্ডের পূজা করে দুর্গা দুর্গা বলে তিনটি ডুব দিয়েই কোনরকমে উঠে পড়েছি। সর্বাঙ্গ অবশ—হৃদ্‌পিণ্ডের ক্রিয়া যেন এককালে বন্ধ হয়ে গিয়েছে। কষ্ট-বোধ কতটা হয়েছিল তা ভাববার মতন মনের শক্তি ছিল না। আত্যন্তিক দুঃখের অনুভূতিটা প্রকাশ করা যায় না। খানিকক্ষণ পরে দেহমনের অবশ ভাবটা কেটে গিয়ে এক অভাবনীয় আনন্দরসে আপ্লুত হয়ে গেল মনপ্রাণ।

অনেক যাত্রীর মুখেই শুনেছি গৌরীকুণ্ডে স্নান করা অসম্ভব। বাস্তবিকই অসম্ভব ব্যাপার। ওস্থানে বৎসরের মধ্যে দৈবাৎ কোন দিন সূর্যের মুখ দেখা যায়। জল ভীষণ কন্‌কনে ঠাণ্ডা—আবহাওয়াও এমনই বরফ-শীতল যে স্নানের দুরাশাই কেউ করে না। কীচথাম্পা বলেছিল—"আমিও পঞ্চাশবার এসেছি যাত্রী নিয়ে। কিন্তু গৌরীকুণ্ডে এমন খট্‌খটে রোদ এই প্রথম দেখলাম। বড়ই আশ্চর্য ব্যাপার।"

কৈলাস

তুষারপাত, তুষার-ঝটিকা-বৃষ্টি, শিলাবৃষ্টি, মেঘমলিন আকাশ, হিমকণা-যুক্ত তীব্র হাওয়া—এই স্বাভাবিক অবস্থা গৌরীকুণ্ডের। এ সকল প্রাকৃতিক দুর্যোগের জন্য খুব কম লোকই কুণ্ডে অবগাহন-স্নানের সুযোগ পায়।

তিব্বতী ঘোড়াওয়ালা রুংপু কুণ্ডে স্নান করব শুনে খুবই ভীত হয়ে বলেছিল—"স্বামীজী, এমন কাজটি করো না—খবরদার। বলছি, আমার কথা শোন। ঐ কুণ্ডে যক্ষরা বাস করে। নামলেই ধরে নিয়ে তাদের রাজা কুবেরের কাছে হাজির করবে। আর ফিরে আসতে দেবে না। মানুষ কখনও ওতে স্নান করতে পারে না। ঐ যে বরফ দেখছ তার নীচেই যক্ষদের থাকবার স্থান।" গাইড তিব্বতীর কথাটি আমাকে জানাতেই সহযাত্রীরা কৃত্রিম গাম্ভীর্যের সুরে ঘোড়াওয়ালার কথার অনুবৃত্তি করলেন।

গৌরীকুণ্ডের ব্যাসার্ধ এক-দেড় শত গজের বেশী মনে হল না। অনেকটা গোলাকার—তিন দিকেই পর্বতবেষ্টিত। স্নান সেরে খটখটে রোদের মধ্যে কুণ্ডের তীরে দাঁড়িয়েছি এমন সময় হঠাৎ এক বিকট শব্দে চারিদিক প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠল। চমকে গিয়ে এদিক সেদিক তাকাচ্ছি। দেখা গেল কুণ্ডের পশ্চিম কোণে ফেনিল প্রবল জলপ্রপাতের মত শুভ্র তরল বরফ কৈলাসশ্রেণী হতে সশব্দে পড়ছে। হিমানীসম্প্রপাত! চার-পাঁচ মিনিটের মধ্যেই প্রচুর প্রপাতের ফলে স্থানটি বরফে স্তূপীকৃত হয়ে গেল। হিমানীসম্প্রপাতটি উজ্জ্বল সূর্যকিরণে উদ্ভাসিত হয়ে দেখাচ্ছিল যেন কুবের তাঁর ধনভাণ্ডার হতে রাশি-রাশি গলিত স্বর্ণ গৌরীকুণ্ডে উৎসর্গ করছেন।

সে সৌন্দর্যরাজ্যে বেশীক্ষণ থাকবার অবকাশ হল না। যেতে হবে অনেক দূরে। হিমালয়কন্যা গৌরীর চরণে প্রণত হয়ে যাত্রা করলাম।

ঘোড়া প্রভৃতি এগিয়ে গিয়েছিল লামছিকি-চুর ধারে। প্রাণান্তকর উৎরাই। প্রস্তরবহুল ও অতি সংকীর্ণ পথ। অরুণ বাবু বিশেষ অবসন্ন হয়ে পড়েছেন। দু'জন লোক তাঁকে কোনরকমে বয়ে নামাচ্ছিল। ক্রমে লামছিকি-চুর ধারে সমবেত হয়েছি। পাশেই উচ্চ পর্বত—তারই পাদদেশে স্বল্পপ্রশস্ত উপত্যকার শেষপ্রান্তে ছোট নদীটি। তার পরই উচ্চ গিরি-শ্রেণী। তিব্বতীদের মধ্যে প্রবাদ—গৌরীকুণ্ডের জল ভূগর্ভস্থিত স্রোতপথে প্রবাহিত হয়ে লামছিকি নদীর সৃষ্টি করেছে। হতেও পারে। কুণ্ডের আধ মাইল দূরে প্রায় আটশত ফুট নীচে ঐ নদীটিকে প্রথম দেখতে পাওয়া দায়।

উপত্যকায় খানিকক্ষণ গা এলিয়ে বিশ্রামের পর পুনরায় এগিয়ে চলেছি। নদীর তীরে তীরে অপেক্ষাকৃত সমতল রৌদ্রময় পথ। অনেক তিব্বতী যাত্রী ও লামাবেশধারীদের সঙ্গে দেখা হল। যাচ্ছে কৈলাসের দিকে। এক তিব্বতী পরিবার গৃহস্থালির যাবতীয় তৈজসপত্র কয়েকটি ঝোব্বুর পিঠে চাপিয়ে চলেছে। ঝোব্বুর পিঠে তিনটি ছেলেমেয়েকেও দিয়েছে বেঁধে। তারা বেশ নিশ্চিন্ত মনে দুলে দুলে যাচ্ছিল। নদীতীর ছেড়ে এখন চলেছি প্রস্তরসমাকীর্ণ উঁচুনীচু পথে—কাঁটাঝোপের ভিতর দিয়ে। এ কষ্টকর পথের আদি আছে কিন্তু অন্ত নেই। সকলেরই দেহ ক্লান্তি-জর্জরিত। কোনরকমে দেহটাকে টেনে চলেছি। তিনটে নাগাত জুনথুলফুক্ গুম্ফার কাছে, যমদ্রু-চুর ধারে তাঁবু পড়ল। আহারের পর্ব শেষ হল সাড়ে চারটায়। শুয়ে পড়া ছাড়া আর কিছু করবার শক্তি ছিল না।

তীর্থযাত্রার এ দুরধিগম্য দীর্ঘ পথটি আমাদের কঠোর তপস্যা। পথের মর্মান্তিক পীড়নে দেহ ও মন অবসন্ন হয়ে পড়েছে। গভীর বেদনাভরা প্রাণে পরস্পরের দিকে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করি। একে অন্যের চেহারা দেখে

শিহরে উঠি। সকলেরই মসিবর্ণ দেহ, কোটরস্থ শূন্য দৃষ্টি। সমবেদনা জানাই নে। কারণ তা উপহাসের মতন হয়ে প্রাণে আরও মর্মন্তুদ ব্যথা দেবে। নীরবে শুধু দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলি। এক-একটা দিন যাচ্ছে—মনে হয় যেন এক-একটা যুগ। এইভাবে একটি মাস ধরে চলে চলে উঠেছি প্রায় উনিশ হাজার ফুটে, আর আড়াইশো মাইল অতিক্রম করে এসেছি। সমতল স্থানে এ দূরত্বটা কিছুই নয়। এমন কি কেদারনাথ-বদরীনারায়ণের যাত্রাপথের কষ্টও এ কষ্টের তুলনায় নেহাত ছেলেখেলা বলে মনে হতে লাগল। এ যন্ত্রণা-জর্জর পথের প্রাণান্তকর তপস্যার মধ্যেও কিন্তু কি এক অনির্বচনীয় আনন্দ যেন সঞ্জীবনী সুধার ন্যায় নিত্য নব জীবনদান ক'রে আমাদের নিয়ে চলেছে এগিয়ে! শেষ পর্যন্ত সেই আনন্দের স্মৃতিই হয়েছিল দুস্তর পথের একমাত্র পাথেয়।

কোন কিছুই বাদ দিতে ইচ্ছা হয় না। সন্ধ্যার পর পঙ্গু দেহগুলি গা ঝাড়া দিয়ে উঠল—চলল গুম্ফাদর্শনে। প্রথমেই কতকটা খাড়া চড়াই। অন্ধকার হয়ে গিয়েছে। গুম্ফার কাছে আসতেই একটা প্রকাণ্ড কুকুর ঘেউ ঘেউ করে তাড়া করে এল। গুম্ফার বাইরে প্রবেশ-দ্বারের দক্ষিণ-দিকে একটা বড় পান্থনিবাস—তিব্বতী যাত্রী ও গাঢ় ধোঁয়ায় পরিপূর্ণ। কীচথাম্পা একজন ডাবাকে সঙ্গে করে গুম্ফার ভিতরে নিয়ে গেল। প্রথমেই প্রার্থনামন্দির বা ভোজনাগার। দেখা গেল চার-পাঁচ জন ডাবা সান্ধ্য ভোজনে রত। সামনেই ক্ষুদ্র গর্ভমন্দির। একটি মাত্র মাখনের ক্ষীণদীপ মিটু মিটু করে জ্বলছে। পূজার জন্য কয়েকটি টঙ্কা প্রণামী দিতেই পূজারী ডাবা তাড়াতাড়ি কয়েকটি প্রদীপ জ্বালিয়ে দিল। বেদীর উপর মধ্যস্থলে সোনার জলে রং করা কাঠের বুদ্ধমূর্তি—আর দু'পাশে দু'জন বৌদ্ধাচার্যের বিগ্রহ। নীচের সোপানে ধাতুনির্মিত হিন্দুদেবদেবীর মূর্তি-

গুলির মধ্যে তারা, অষ্টভুজা, মহাদেব ও আচার্য শঙ্করের বিগ্রহ চেনা গেল! দেয়ালের কুলুঙ্গিতে অনেকগুলি ভূতপ্রেতের মূর্তি। বেদীতে ছোট বড় নানা আকৃতির অনেক শঙ্খ সাজান। পূজারী ডাবা বললে, "এ সব শঙ্খ শিবজীর শঙ্খ। তিনি রোজ দু'বার করে শাঁক বাজাতেন—একবার সকালে, একবার সন্ধ্যায়।"

"এখন কে বাজায়?" "এখন আমরাই বাজাই বিশেষ বিশেষ দিনে, পূজাপার্বণে বা কোন মৃত গ্রামবাসীর পারলৌকিক ক্রিয়াদিতে"—ডাবা বললে। গর্ভমন্দিরের সামনেই ছয়-সাত হাত লম্বা গোল একখণ্ড কষ্টিপাথর রক্ষিত। জিজ্ঞাসিত হয়ে ডাবা পরম উৎসাহের সহিত বলল, "এটি শিবজীর হাতের লাঠি। এই লাঠিতে ভর করেই শিবজী কৈলাস থেকে নামতেন।"

"এখন এ লাঠি কে ব্যবহার করে? শিবজী এখন কি করে নামেন?"

"এ লাঠি শিবজী গভীর রাতে নিয়ে যান। আবার কৈলাসপর্বতের চারিদিকে বেড়িয়ে ফিরে যাবার সময় এখানে রেখে যান।" —বিস্ফারিত লোচনে ডাবা বলল।

নাটমন্দিরের এক কোণে সিংহাকৃতি একখণ্ড প্রকাণ্ড কাল রং-এর পাথর পড়ে আছে। ডাবা বললে—"এ পাথরটি অতি পুরাকালে মানস-সরোবর থেকে উঠেছে। শিবজীর আসন। শিবজী বেড়াতে বেরুলে পাথরটিও পিছু পিছু যায়। তিনি পরিশ্রান্ত হলে এ প্রস্তর-খণ্ডের উপর বসে বিশ্রাম করেন।" প্রমাণস্বরূপ যা যা বললে—তার উল্লেখ না করাই ভাল।

গুম্ফাবাসীর সংখ্যা সাত জন—সকলেই ডাবা। লামা একজনও নেই। কৈলাসপরিক্রমা-পথে টারচান, নিয়ান্‌ডি, ডিরিফুক ও জুনথুল-ফুক—

এই চারিটি গুম্ফা। আমাদের উপর প্রসন্ন হয়ে পূজারী দেবতার প্রসাদ-স্বরূপ কিছু রঙ্গিন সুতো ও বস্ত্র দিল।

জুনুথুল-ফুকে আমরা যেখানে তাঁবু ফেলেছিলাম ঠিক সেখানেই কৈলাস-যাত্রাকালে মহীশূরের মহারাজার তাঁবুও পড়েছিল। কীচথাম্পা বললে, "মহারাজার দলের সঙ্গে আমরা আঠার জন গাইড এসেছিলাম। সে এক বিরাট ব্যাপার। কত ঘোড়া, লাদ্-ঘোড়া, তাঁবু, চাকর, বামুন, ডাক্তার, কবিরাজ, সেপাই-সান্ত্রী, ধোপা নাপিত মেথর—শত শত লোক—কত কর্মচারী এক সঙ্গে চলেছে! মহারাজা গঙ্গাজল ছাড়া খেতেন না। ভাঁড়ে ভাঁড়ে ঐ জল বয়েই চলেছিল কত লোক! নিত্য সকালে স্নান করে সোনার বিল্বপত্র দিয়ে শিব পূজা করতেন—ব্রাহ্মণরা বেদপাঠ করত। হবন-যাগযজ্ঞ-সমাপনান্তে তিনি রওনা হতেন।"

সহযাত্রী—মহারাজা কি সারা পথ হেঁটেই গিয়েছিলেন?

গাইড—তা নয় তো কি? তিনি রোজ চার-পাঁচ-ছয় মাইল করে হাঁটতেন—তাঁর সঙ্গে সঙ্গে অবশ্য ঘোড়া ডাণ্ডী এসব থাকত। তিনি কিন্তু বরাবর হেঁটেই চলেছেন। আমিতো ধারচুলাতে গিয়ে তাঁর দলের সঙ্গে মিশেছি এবং কৈলাস-দর্শন ও পরিক্রমা শেষ করে পুনরায় ধারচুলা পর্যন্ত গিয়েছিলাম। তাঁকে বরাবর হাঁটতেই দেখেছি। মহারাজা অভুক্ত অবস্থায়ই বেরুতেন। কোথাও কোথাও দেখেছি আর পারেন না—পাথরের উপর এলিয়ে পড়েছেন। লোকজন ঘিরে ডাক্তার নাড়ী দেখছে, কেউ হাত-পা টিপছে। যাত্রাপথে তিনি জপ করতে করতে যেতেন—হাতে জপমালা সব সময়ই থাকত। মহারাজা সকালে রওনা হবার পূর্বেই দু-তিন দল লোক এগিয়ে যেত। একদল রাস্তা পরিষ্কার করে করে এগিয়ে চলেছে, একদল স্থানে স্থানে তাঁবু খাটিয়ে তাতে আরাম-কেদারা খাটিয়া

ইত্যাদি ঠিক করে রাখছে—মহারাজা পরিশ্রান্ত হলে বিশ্রাম করবেন। একদল আহারাদির ব্যবস্থা করতে চলে যেত।

সোৎসাহে গাইড কত কথাই বলে যাচ্ছিল—মহারাজার তীর্থযাত্রা-প্রসঙ্গে।

গাইড আবেগভরে বলল, "এমন লোক দেখি নি। আহা কী দয়া! গরীব দুঃখী কাঙ্গাল কেউ বিমুখ হয় নি। আশাতীত পেয়েছে—আশীর্বাদ করতে করতে গেছে। দান করবার জন্য অনেকগুলি বাক্স ভরে টাকা এনেছিলেন। এখনও লোকে ধন্য ধন্য করে। আমাদের সকলকেও প্রচুর বকশিস্, নূতন পোশাক ইত্যাদি দিয়েছিলেন। এমন রাজা আর হবে না!"

আমার কেবলই মনে হচ্ছিল—কি সেই আকর্ষণ যা আজন্ম বিপুল ঐশ্বর্যে পালিত একজন প্রবীণ নরপতিকে এ দুরধিগম্য যাত্রাপথে টেনে এনেছিল? এমনটি বোধ হয় এই পুণ্যভূমি ভারতেই সম্ভব। এ তো উড়ো জাহাজে চড়ে পৃথিবীভ্রমণ নয়—এ যে প্রতি পদে মৃত্যুকে বরণ করে যাওয়া! আমাদের এ বিচিত্র দেশেই জন্মান্ধ যাত্রী দুর্লঙ্ঘ্য কৈলাস-পথের পথিক, কটিবাস-পরিহিত কম্বল-মাত্র-সম্বল কপর্দকহীন সন্ন্যাসীর 'ওঁ নমঃ পার্বতীপতয়ে হর হর' শব্দে সুদুর্গম লিপুগিরিবর্ত্ম মুখরিত, ঐশ্বর্যশালী নরপতি তুষারাবৃত কৈলাসের পাদমূলে সামান্য পটাবাসে 'সত্যং শিবং সুন্দরম্'-এর ধ্যানে মগ্ন! প্রতীতি হয় ঋষিবাক্য সফল হবে—'ভারত আবার জগৎসভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে।'

কাল বার-তের মাইল যেতে হবে বংড়ু পর্যন্ত। কোথায় কোন্ দিন যেতে হবে আগে থেকেই তা ঠিক করা থাকে। ব্যতিক্রম হবার জো নেই। সাধারণতঃ ঘোড়াগুলির ঘাস-জলের সুবিধা বিচার করেই পড়াউ ঠিক হয়। আহাঁ! গত কয়েক দিনে বেচারীদের যা চেহারা হয়েছে, দেখে

কষ্ট হয়। উন্মুক্ত প্রস্তরের উপর চলে চলে খুর ফেটে গেছে। নেহাৎ খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলে; আধপেটা খেয়ে বেরিয়ে গেছে হাড়-পাঁজরা। ক্ষুধার তাড়নায় সবুজ কিছু দেখলেই তাতে মুখ দেয়—তা কাঁটাঝোপই হোক আর যাই হোক। তীর্থের সুফল যদি থাকে তো ওদেরই প্রাপ্য। এদের কৃচ্ছ্রসাধনের সীমা নেই!

গত দিনের কষ্টের কথা ভুলে গেছি। আমাদের কাছে বর্তমানটাই বাস্তব। অতীত ও ভবিষ্যতের মধ্যে আনাগোনা করার মতন মনের অবস্থা নয়। নূতন পপ্রাতের সঙ্গে প্রাণে নূতন করে জেগে উঠে সেই অনির্বাণ নেশা—অজানার আকর্ষণ। আমরা এগিয়ে চলি। এতেই পরম সার্থকতা, অপরিসীম তৃপ্তি।

ভোর হবার অনেক পূর্বেই জ্যোতির্ময়ের আভাস পাওয়া যাচ্ছিল। চারিদিকেই ধ্যানমৌন প্রশান্তি। প্রভাত জেগে উঠল। হেসে উঠেছে কৈলাসশিখর। পাশেই দলচু-চুর কলকলধ্বনি। শূন্য নদীতীরে পশুগুলি তখনও তন্দ্রালস্যে রোমন্থন করছে।

মানসসরোবর

জুনথুল-ফুক্ ছেড়েই দলচু-চুর ধারে ধারে উন্মুক্ত প্রান্তরের উপর দিয়ে প্রায় দু'মাইল পথ। ক্রমে অতি সংকীর্ণ পথে খাড়া চড়াই শেষ করে পৌঁছেছি এক শৈলশীর্ষে। সামনেই যোজন-যোজন-ব্যাপী বিস্তীর্ণ মালভূমি। অবাক বিস্ময়ে দেখছি। এ যেন অসীম জলধি—প্রাণে জাগিয়ে দেয় ভূমার ভাব। এ অন্তহীন মালভূমির উত্তরে সূর্যকিরণস্নাত কৈলাসশ্রেণী, দক্ষিণে দূরে গুরলার তুষারাবৃত পটভূমি, আর পশ্চিমে সেলাচাকুং পর্বতমালা। যেন স্বপ্নরাজ্য! পরিপূর্ণ সৌন্দর্যবৈভব, নয়নাভিরাম রূপ। শৈলশিখর হতে অবতরণ করে এবার চলেছি এগিয়ে। ক্রমে টারচান্ গুম্ফার কাছে এলাম। গুম্ফা দেখতে যাবার খুবই ইচ্ছা ছিল কিন্তু দেরী হবে বলে অধিকাংশেরই অনিচ্ছা, কাজেই যাওয়া হল না। এখানেই কৈলাসপরিক্রমা শেষ। গুম্ফাটি ডানদিক থেকে অভিমানভরে আড়নয়নে যেন আমাদের দেখছে। দূরে দেখা গেল কতকগুলি কাল রং-এর তাঁবু। আমাদের যেতে হবে ওদিকেই।

কোমল নীল আকাশ—সূর্যকিরণ-উদ্ভাসিত ও উজ্জ্বল। মহা উৎসাহে চলেছি মালভূমির উপর দিয়ে। রাত্রি ও প্রভাতের প্রচণ্ড শীত মধুর বসন্তে রূপান্তরিত হয়েছে। দেহে এসেছে নব বল, মন দুলছে নূতন আনন্দে। তিব্বতের আবহাওয়ায় এমন-ই একটা আশ্চর্য শক্তি যে, একটু বিশ্রামের পর প্রাণে এনে দেয় অনুপ্রেরণার জোয়ার।

কালো তাঁবুগুলির কাছে এসে দেখা গেল তাতে দানবের মতন ভীষণাকৃতি বহু তিব্বতী পুরুষ-স্ত্রী। ছেলেমেয়েও অনেক। একটু দূরেই

চরে বেড়াচ্ছিল শত শত ছাগল ভেড়া ঘোড়া ঝোব্বু। তিব্বতী স্ত্রী-পুরুষদের বলদৃপ্ত সুগঠিত শরীর দেখে ভারী আনন্দ, আবার ভিতরে ভিতরে ভয়ও হচ্ছিল। তারাও আমাদের লক্ষ্য করছিল খুব উৎসুক দৃষ্টিতে। অরুণ বাবুর রাইফেলটির উপর একজন তিব্বতীর ভারি লোভ হল। কীচখাম্পাকে বলল—"এমন রাইফেল কোথায় পাওয়া যায়? এটি বিক্রি করবে? গাইড একটু মজা করতে লাগল—"বেচতে তো রাজী আছি। কিন্তু এর দাম কত জান? দশহাজার টঙ্কা। এই রাইফেল দিয়ে একসঙ্গে দশজন লোককে মারা যায়।" তিব্বতী অবাক্-বিস্ময়ে চেয়ে চেয়ে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলল—"পঞ্চাশটা ছাগল দিতে রাজী আছি। এ রাইফেলটি আমায় দাও।"

জানা গেল তারা লাসাসীমান্তের লোক। পশম ও অন্যান্য জিনিস বিক্রি করতে যাচ্ছে গানিমা মণ্ডিতে। প্রতি বৎসরই নেমে আসে এ অঞ্চলে। মেয়েদের গায়ে ঢোলা পোশাক—গলা হতে পা পর্যন্ত। গলায় নানা রং-এর কাঁচের মালা, পায়ে হাঁটু পর্যন্ত পশমের জুতা, হাতে রূপার মোটা মোটা গয়না, মুখে রক্ত চন্দনের মতন কোন জিনিসের মোটা প্রলেপ। তাদের কেশবিন্যাস-পারিপাট্য লক্ষ্য করার মত। বেশ লম্বা চুল—শত শত সরু বেণীবদ্ধ হয়ে ঝুলে পড়ছে পিঠের উপর দিয়ে কোমরের নীচ পর্যন্ত। পুরুষদের চুলও মোটা বেণীবদ্ধ ও লম্বিত, কানে সোনার গয়না—কারো বা তাতে মুক্তা বসান। এদের চেহারায় কমনীয়তা ও নম্রতার লেশমাত্র নেই। থেবড়া নাক, কোটরস্থ চক্ষু অর্ধ-নিমীলিত—মিট্ মিট্ করছে। পুরুষদেরও দাড়ি-গোঁফের বালাই নেই। শীতপ্রধান দেশ; সকলেই চামড়ার পোশাক ব্যবহার করে। চামড়ার লোমগুলি থাকে ভিতরের দিকে, তাতে গরম হয় বেশী। আলখাল্লার মতন ঢোলা পোশাক

হাঁটুর নীচ পর্যন্ত—খুব লম্বা হাতা, আঙুল ঢেকেও কতকটা ঝুলতে থাকে। এরা মঙ্গোলিয়ান-শ্রেণীসম্ভূত। কিন্তু জাপানী ব্রহ্মদেশী বা নেপালী গুরখাদের মতন খর্বাকৃতি নয়। বেশ লম্বা চওড়া। ফটো নেবার খুবই ইচ্ছা হয়েছিল, কিন্তু গাইড ক্যামেরা বের করতে নিষেধ করলে। সাধারণ তিব্বতীদের ধারণা—যার ফটো তোলা হয় তার সদ্য মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী।

তিব্বতীরা ছাগদুগ্ধের মাখন ও চামর ইত্যাদি বিক্রি করতে চাইলে। কিন্তু তাদের সঙ্গে বেশী ঘনিষ্ঠতা নিরাপদ নয় ভেবে তাড়াতাড়ি এগিয়ে চললাম।

ক্রমে বেশ গরম বোধ হতে লাগল। চারিদিক খাঁ খাঁ করছে। দক্ষিণে অতিদূরে দিগ্‌বলয়ের শেষপ্রান্তে গুরলামান্ধাতার চিরতুষারময় পিঙ্গল কিরীট প্রাণে ভয় ও বিস্ময়ের সঞ্চার করে। কোথাও লোক-বসবাসের চিহ্নমাত্র দেখা যায় না। বৃক্ষ-লতা-গুল্ম-তৃণহীন রুক্ষ মালভূমির ভিতর দিয়ে যেতে যেতে মনে হয় যেন অগাধ সমুদ্রে পাড়ি দিয়েছি, আর এই অসীম সমুদ্রেরই কোন একটা অজানা অচেনা স্থানে আজকের মতন নোঙর ফেলতে হবে। পথের রেখা পর্যন্ত কোথাও নেই। একটা দিক লক্ষ্য করে এগিয়ে চলেছি—এই মাত্র। পাখারাও ঠিক এমনি করেই বোধ হয় অসীম আকাশে উড়ে যাবার সময় গন্তব্য লক্ষ্য স্থির করে। টারচান অনেক পেছনে পড়ে রয়েছে। কৈলাসশ্রেণীও ক্রমে সরে যাচ্ছে দূরে, আরও দূরে। তৃষ্ণায় টাকরা পর্যন্ত শুকিয়ে গেছে। পা আর চলে না, তবু যেতেই হচ্ছে।

প্রায় একটা নাগাত অজ্ঞাতনামা একটি ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনীর ধারে গাইডের নির্দেশে থামা গেল। ঐ নাকি বংডু। বাঁচা গেল! তাঁবু পড়েছে, ঘোড়াগুলি একটু গড়াগড়ি দিয়ে জল খেয়ে তৃণ-অন্বেষণে ঘুরছে।

আমরাও এলিয়ে পড়লাম তাঁবুর ভিতর। কথা বলার শক্তি ছিল না—মুখের ফেনাটুকু পর্যন্ত মুছে ফেলবার প্রবৃত্তি হয় না। কিন্তু এমনই জল-হাওয়ার গুণ—আধ ঘণ্টার মধ্যেই মৃতপ্রায় দেহগুলি গা-ঝাড়া দিয়ে উঠল। কেউ চললেন নদীতে স্নান করতে, আর রান্নাবান্না গল্পগুজবে স্থানটি মুখর হয়ে উঠেছে। ছোট নদীটি দলচু-চুর নির্মল জল নিয়ে অবিশ্রান্ত গতিতে ছুটে চলেছে রাক্ষস-তালে। দারুণ গরম—ছায়াহীন নির্মম স্থান। তাঁবুর ভিতরই ৮৫° ডিগ্রি। অথচ উচ্চতা পনর হাজার ফুটের বেশী। আজ একটু পাঁপর-ভাজা পেয়ে সকলেই খুশী। ডাঃ দে বললেন, আজ একটু কিছু খেলুম বলে মনে হল।

শুয়ে বসে কাটাচ্ছি। তাঁবুর মুখ কৈলাসের দিকে খোলা। ভিতরে বসেই অসমান মালভূমির অনেক দূর দেখা যায়। তিন-চার মাইল দূরে বরখা গ্রাম। ঘরবাড়ীগুলি কয়েকটি বিন্দুর মতন দেখাচ্ছে। ঐ একটি-মাত্র গ্রাম। তিব্বতের ডাকসরবরাহকারী ডাবমুন্সী 'টারজাম' ঐ গ্রামে থাকে। স্বামী দুর্গাআনন্দ হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলেন—"ঐ দেখুন, কতকগুলি লোক আসছে না? ডাকাত নয় তো?"

দিনদুপুরে ডাকাত? দূরবীন হাতে নিয়ে দেখা গেল আট-দশজন লোক আমাদের তাঁবু লক্ষ্য করে দ্রুত এগিয়ে আসছে। বিধাতার কি নিদারুণ উপহাস! সমাজবদ্ধ জীব আমরা, তবু কয়েকটি লোক আসছে দেখে খুশী না হয়ে হচ্ছি পীড়িত। এমন জনমানবহীন মালভূমির মধ্যে অজ্ঞাত অনাহূত লোককে তাঁবুর দিকে আসতে দেখে আতঙ্ক হয়। সকলেই চঞ্চল হয়ে উঠলেন। কীচখাম্পা ও দরবু তাড়াতাড়ি কার্তুজের বেল্ট ঝুলিয়ে বন্দুক পিঠে বেরিয়ে এল। দূরবীন হাতে একটু এগিয়ে খানিকক্ষণ দেখে গাইড বলল, "মনে হচ্ছে হুনিয়ারা জিনিসপত্র বিক্রী

করতে আসছে। ভয়ের কোন কারণ নেই। তাদের হাতে হাতে কি সব মালপত্র দেখা যাচ্ছে।" বন্দুক পিঠে তারা দুজনেই ঘুরে বেড়াতে লাগল।

এই দিনের বেলায়, আমাদের অতবড় দলটি! তবু ডাকাতের ভয়? হাসির কথাই বটে। কিন্তু তিব্বতে এমনটিই হয়; ডাকাতদের দিন আর রাত্রের বিচারের প্রয়োজন নেই। তেপান্তরের মাঠের শেষ আছে—শেষ সীমায় লোকজন আছে কিন্তু তিব্বতের মালভূমির যে শেষ নেই! আর লোকজন? সুবিধে পেলে একটু-আধটু লুটতরাজ সবাই করে। অরক্ষিত অসহায় যাত্রীদের আত্মরক্ষার কোন উপায়ই যে নেই! না আছে পুলিস থানা, না আছে বিচার-বিবেচনা সহায় সম্পদ। চীৎকার করে মরতে পার, তার প্রত্যুত্তর পাবে না। তিব্বতীদের দেশ—তাদেরই জোরজুলুম। বিচারপ্রার্থী হয়ে তাকলাকোটে পৌঁছতেই পাঁচ দিন। তারপরে তাদের বড় মাথাব্যথা পড়েছে যে, এই নিয়ে 'ঘরের খেয়ে পরের মোষ তাড়াবে।' এতে তাদের লাভ কি? তিব্বতে পরদেশীয়দের ধনপ্রাণ মোটেই নিরাপদ নয়।

"কীচখাম্পা তো বললে—ভয়ের কোন কারণ নেই। ভরসাও তো কিছু দেখছি না। কি রকম হন্‌হন্ করে দৈত্যের মতন লোকগুলি আসছে দেখছেন? হাতে পিঠে কি সব রয়েছে।" —তারাপ্রসন্ন বাবু উত্তেজিত হয়ে বললেন। অরুণ বাবু তো রিভলভার হাতে করে বসে আছেন। লোকগুলি দুশো গজের মধ্যে আসতেই গাইড এগিয়ে গিয়ে চিৎকার করে কি যেন জিজ্ঞাসা করল। তারাও একটা জবাব দিল। খানিক পরে গাইড এল আটজন তিব্বতীকে সঙ্গে নিয়ে তাঁবুর সামনে। পাঁচজন পুরুষ ও তিনজন স্ত্রীলোক। সকলের হাতেই চামর। ছাগল-

ভেড়ার চামড়া এবং সঙ্গে একটি জ্যান্ত ছাগল। এদের চেহারা দেখলেই ভয় হয়, যেন যমদূত! কী বিকট চেহারা, আর ভূতের মতন পোশাক! যে সর্বাগ্রে আসছিল সে আমাদের দিকে মুখ করে একটু হাসবার চেষ্টা করল। হাসি তো নয় যেন ভ্রুকুটি। সকলেই তাঁবুর সামনে বসেছে। তাড়াতাড়ি সিগারেট বের করে সকলের হাতে দিয়েছি। মেয়েরাও সলজ্জভাবে নিল। ভারি খুশী। ক্রমে তাঁবুর ভিতর তাদের প্রবেশ করতে দেখে অরুণ বাবু একেবারে রুখে উঠলেন। তাঁকে ইসারা করে থামান গেল। বললাম—"কি এদের মতলব একটু দেখাই যাক না! মজা দেখার এমন সুযোগ আর না-ও হতে পারে। আপনার রিভলভার তো ভরাই আছে। আর ভাবনা কি?" অরুণ বাবু—"আপনার এ বড় বাড়াবাড়ি। এরা জোর করে সব নিয়ে যাবে। তখন?" তাঁবুর ভিতরকার আসবাবপত্র দেখে তাদের চোখ ঝলসে গেছে। এমন সুটকেস বিছানা কম্বল পোশাক তারা কখন দেখে নি। সব কিছুই নিবিষ্টভাবে নেড়ে চেড়ে দেখছে। সকলকে দেখাচ্ছে—নিজেদের মধ্যে কি সব বলাবলি করছে। একজন তো তারাপ্রসন্ন বাবুর সুটকেসটি খুলে দেখতে লাগল। কামাবার সুগন্ধি সাবান ও স্নোর গন্ধে লোকটি যেন আত্মহারা হয়ে গেছে। একটি ছোট এনামেলের বাটি, সুগন্ধি সাবানখানি ও টর্চলাইটটি তার ভারি পছন্দ। লোকটির সম্বল ছিল ছয়টি চামর—তার যথাসর্বস্ব দিয়েও ঐ জিনিস কটা নিতে চাইলে। আমরা দিলাম না। বড়ই হতাশপ্রাণে জিনিসগুলি নেহাৎ অনিচ্ছাসত্ত্বে রেখে দিল। আহা! তার মুখের কাতর ভাব দেখে মনে কষ্ট হয়।

আমরা একটিমাত্র ছোট চামর নিয়েছি। কিন্তু কীচখাম্পারা উদ্বৃত্ত কিছু আটা ছাতু ও চালের বিনিময়ে অনেকগুলি শুকনো চামড়া ও

ছাগলটি কিনেছে। সকলকে একটু একটু গুড় দেওয়াতে তারা খুশী হয়ে বিদায় নিল। নিশ্চিন্ত হওয়া গেল।

আগত তিব্বতীদের মধ্যে একজন ছিল প্রায় চার মাইল দূরবর্তী দমজু গ্রামের মোড়ল (প্রধান)। তার কাছে একটি ভীতিপ্রদ সংবাদ পেয়ে সকলেই বিশেষ শঙ্কিত হয়েছি। —"জামর-রা ঠোকর মণ্ডিতে লুটপাট করছে। বহুলোক খুনজখম হয়েছে। ডাকাতেরা দলে ভারি। তাদের অত্যাচারে মণ্ডি জনশূন্য। তারা নাকি এদিকেই এগিয়ে আসছে।" সুসংবাদই বটে! আমরা জুনথুলফুক্ ছেড়েই জামরদের ডাকাতির কানা-ঘুষা শুনেছিলাম। এখন সঠিক খবরটি পেয়ে মুখ শুকিয়ে গেল।

জামররাও তিব্বতী। কতকটা চীনসীমান্তের লোক। আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত—দলবদ্ধ ডাকাত। তারা আসে বণিক সেজে। গৃহ-পালিত পশু ও স্ত্রী-পুত্রাদিও সঙ্গে থাকে। যাতায়াতের পথে যেখানেই সুবিধে পায় লুটতরাজ করে। বাধা পেলে মেরে কেটে সর্বনাশ করে। বলপ্রকাশ ক'রে তাদের হাতে পরিত্রাণ পাওয়া অসম্ভব। জামররা আসছে খবর পেলেই তিব্বতীরাও গ্রাম ছেড়ে আত্মগোপন করে। তিন বৎসর পূর্বে জামররা টারচানমণ্ডি লুট করেছিল। বাধা দেবার ফলে ভোটান-রাজপ্রতিনিধির রক্ষিসৈন্যদের সঙ্গে তাদের খণ্ডযুদ্ধ হয়। উভয় পক্ষেই হতাহত হয়েছিল অনেক।

আগামী কাল আমাদের যেতে হবে মানসসরোবরে। জামর-লুণ্ঠিত ঠোকরমণ্ডি সরোবর থেকে আট-নয় মাইল মাত্র। বংড়ুতে বসে থাকাও নিরাপদ নয়—জামরদের গতিবিধির স্থিরতা নেই। তা ছাড়া তিব্বতী মাত্রই ছোটখাট জামর। সুবিধে পেলে কেউ কম যায় না। এখন বেশ শান্তমনে লিখছি বটে কিন্তু জামরদের সংবাদে সমূহ মৃত্যুর ছায়ায়

অন্ধকার হয়ে পড়েছিল সকলেরই মন। তেপান্তরের মাঠে—মুখ কাল করে সকলেই জামর-বিভীষিকা দেখছি। "খুব ধর্ম করুন। এখন মুখ শুখাচ্ছে কেন?" —বললেন জনৈক সহযাত্রী। কেউ প্রতিবাদ করলে না, আর যিনি কঠোর মন্তব্যটি প্রকাশ করেছিলেন তিনিও গম্ভীর হয়ে গেলেন।

তখনও অনেকটা বেলা আছে। দেখতে দেখতে ঘনঘটা করে গর্জে উঠল মেঘ। অল্পক্ষণেব মধ্যেই কাল মেঘে আকাশ ছেয়ে গেল। বিদ্যুৎ খেলতে লাগল। প্রবল ঝড়বেগ থেকে তাঁবু বুঝিবা আর রক্ষা হয় না। তাঁবু আঁকড়ে ধরে ভয়ার্ত দৃষ্টিতে চারিদিকে দেখছি। ভীষণ শিলাবৃষ্টি আরম্ভ হল। একফোঁটাও জল নেই—কেবলই শিলাবর্ষণ। আধঘণ্টা যাবৎ চলল প্রকৃতির এই প্রলয়-নৃত্য। আর কী দারুণ ঠাণ্ডা! হাড়েব ভিতর পর্যন্ত ঠক্‌ঠক্ করে কাঁপছে—দাঁতে দাঁত লেগে গেছে। ক্রমে সব শান্ত হল। চারিদিক ধবধবে সাদা। ধীরে ধীরে ধরণীর বুকে নেমে এল 'অবনতমুখী সন্ধ্যা'। দ্বিপ্রহরে তাঁবুর ভিতরে ৮৫° ডিগ্রি, আর রাত্রে ২৪° ডিগ্রি। চারিদিকে বরফের মতন স্তূপাকার শিলা। পাশেব নদীটি শিলাতে ভরে গেছে—জল জমে সব বরফ। ঐ বরফের রাজ্যে বরফের ভিতর শীতজর্জরিত দেহে কোন প্রকারে রাতটি কাটান গেল। তারাপ্রসন্ন বাবু শীতে কাঁপছেন। বললেন, "জামরদের হাতে মরাও যে এব চাইতে ছিল ভাল। এমন তিল তিল করে মরা! কৈলাসপতি মাথায় থাকুন। নাকে খত্ দিচ্ছি—আর জীবনে কখনও এমুখো হচ্ছি না। কোন প্রকারে প্রাণটি নিয়ে যেতে পারলে হয়।"

এদিকে সঙ্গী তিব্বতীদের তাঁবুতে মহা হৈ হৈ পড়ে গিয়েছে। আনন্দ-

কোলাহলে তাঁবু মুখরিত। জানা গেল ছাগলটিকে তারা বধ করে মহা উল্লাসে তা-ই ঝলসে খাচ্ছে। কীচখাম্পা বলল—"তিব্বতীরা ছাগলটাকে পা বেঁধে মাটিতে ফেলে একটা দড়ি দিয়ে নাকমুখ কসে বেঁধে নিঃশ্বাস বন্ধ করে মেরেছে। একবিন্দু রক্তও বেরুতে দেয় নি। গোটা ছাগটাই পুড়িয়ে নিয়ে চাকু দিয়ে কেটে কেটে খাচ্ছে। পেটের নাড়িভুঁড়ী খেতে বেশ ভাল লাগে। গরম গরম রুটী বা পরেটার সঙ্গে খেতে হয়। সব চাইতে উপাদেয় হল ছাগলের জিব্‌টা। কান দুটোও বেশ লাগে।"

সহযাত্রী—পোড়াগন্ধ লাগে না?

গাইড—না, মহারাজ। খেয়ে দেখ না। তখন বলো। নিয়ে আসব একটু?

সহযাত্রী—রক্ষা কর বাবা। তোমরাই খুব পেট ভরে খাও।

তিব্বতীরা বৌদ্ধ। কিন্তু তাদের প্রাণিবধের প্রণালী অদ্ভুত। রক্তপাত করে মারাটা তাদের ধর্মের বিরোধী। সেজন্য তারা সব জানোয়ারকেই শ্বাসবন্ধ করে মারে। এ জাতীয় হত্যা তাদের ধর্মে চলে। তাছাড়া রক্তপাত না হবার ফলে মাংস নাকি বেশী বলকারক ও সুস্বাদু হয়। তিব্বতীরা কাঁচা মাংস খায়—বিশেষ শীতকালে। কিছু কিছু কাঁচামাংস এবং ভেড়া ছাগল ছোট হরিণ প্রভৃতি পুড়িয়ে খাবার রেওয়াজ অবশ্য কাশ্মীর হতে নেপাল পর্যন্ত সমগ্র পার্বত্য প্রদেশেই আছে। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় উচ্চবর্ণরাও মাংস পুড়িয়ে খায়।

সূর্যালোক-উদ্ভাসিত প্রভাতে দেখা গেল যে, রাত্রে প্রচুর বরফ পড়েছে। কৈলাসশৃঙ্গ হতে আরম্ভ করে চারিদিকের উচ্চ পর্বতশিখরগুলি সমস্তই বরফে ঢাকা।

এখানে বসে থাকলেও তো জামরদের হাত থেকে রক্ষা পাবার জো

নেই! অতএব মানসসরোবরের দিকে এগিয়ে যাওয়াই স্থির হল। কৈলাস-শ্রেণীকে—পশ্চাতে রেখে বিকট মাঠভূমির উপর দিয়ে চলেছি ক্রমশঃ গুরলামান্ধাতার দিকে। ডানদিকে বর্‌খা গ্রাম। সাদা সাদা পাঁচ-ছয়খানি মাত্র বাড়ী। ঐ গ্রামটি বিশাল মরুভূমির মধ্যে যেন একটি ক্ষুদ্র মরূদ্যান। উঁচুনীচু বালির চড়া—পাথর নেই বললেই চলে। পায়ের অনেকটা ঢুকে যাচ্ছে বালির ভিতর। পা টেনে তুলতে প্রাণান্ত। দু-এক পা এগুচ্ছি আর মনে হচ্ছে যেন কয়েক যোজন পেরিয়ে এলাম। ছোট ছোট কাঁটা ঝোপে পা ক্ষত-বিক্ষত। ঘোড়সওয়ারীদের এ কষ্ট ভোগ করতে হয় না। তীব্র ঝড় বয়ে চলেছে। বালিকাঁকর উড়ে এসে ছুঁচের মতন বিঁধছে চোখে মুখে। চোখ চাইবার উপায় নেই। মানসসরোবর নাকি এগার মাইল। এ মাইল অবশ্য 'ডালভাঙ্গা' মাইলকেও হার মানিয়ে দেয়। তিব্বতের মাইল সময়ের পরিমাপক—দূরত্বের নয়। মোটামুটি ধরে রাখি যে, ঘণ্টায় দেড় মাইল করে এগুন যায়।

ঘোড়সওয়ারীরা একটু এগিয়ে চলেছে। তাদের সঙ্গে সমান তাল রেখে আর চলতে পারছি না। নানা কথা বলতে বলতে চলেছি গাইডের সঙ্গে। তাতে শারীরিক কষ্ট খানিকটা ভুলে থাকতে পারছিলাম, আর শোনা যাচ্ছিল তিব্বত—তিব্বতীদের সম্বন্ধে নানা তথ্য।

তিব্বত দেশটি যেমন বিচিত্র তেমনই ওখানকার লোকজন; তাদের বেশভূষা, আহার-বিহার, সামাজিক রীতিনীতি আরও বেশী অদ্ভুত ও রোমাঞ্চকর। তিব্বতের ইতিহাসপাঠে জানা যায়, সপ্তম শতাব্দীতে স্রোং স্রেন্‌-গাম্‌পুর রাজত্বকালে তথায় বৌদ্ধধর্ম প্রথম প্রবেশলাভ করে। তার পূর্বে তিব্বতীরা সকলেই ছিল হিন্দুধর্মাবলম্বী। কোন কোন পাশ্চাত্ত্য ঐতিহাসিকের মতে বৌদ্ধধর্মের পূর্বে তিব্বতে 'বনধর্মের' প্রাধান্য ছিল।

ঐ 'বনধর্ম' হিন্দু বা বৈদিক ধর্মেরই নামান্তর মাত্র। প্রাচীন আর্য-ঋষিগণ বনে বাস করতেন এবং তাঁদের ভজন, সাধন ও প্রচারের স্থান ছিল অরণ্য; সেজন্যই পাশ্চাত্ত্য ঐতিহাসিকগণ বৈদিকধর্মকে বনধর্ম আখ্যা দিয়েছেন। যদিও বৌদ্ধ, কিন্তু মাংসই তিব্বতীদের প্রধান খাদ্য। প্রায় সব রকম মাংসই তারা বিশেষ রুচির সহিত খেয়ে থাকে—এমন কি গরু মহিষ ঘোড়া পর্যন্ত। শীতপ্রধান স্থান বলেই বোধ হয় মাংস ও মদ্য না হলে তাদের চলে না। চামরীগরু মারা হল তো একটি পরিবারের তাতে দেড়-দু মাস কাল বেশ চলে যায়।

তিব্বতে প্রায় সর্বত্রই স্ত্রীলোকদের জন্য এখনও একাধিক পতিবরণ-প্রথা প্রচলিত।[১] এক পরিবারে দুই তিন বা ততোধিক ভাই থাকলেও তাদের ধর্মপত্নী একজনই। তাতে নাকি 'ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই' হয় না, আর পারিবারিক কলহও কম হয়। প্রত্যেক ভাইর জন্য এক একজন স্ত্রী—এ ব্যবস্থা শুনে তিব্বতীরা হাসে। ধর্মতঃ ও সামাজিক প্রথানুসারে বড় ভাই-ই বিবাহ ক'রে থাকে এবং সন্তানগণও তারই সন্তান বলে পরিচিত হয়। আইন অনুসারে জ্যেষ্ঠ পুত্রই স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তির মালিক। কিন্তু স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় বা হস্তান্তরিত করার অধিকার কোন প্রজারই নেই। একাধিক পুরুষের এক স্ত্রী—এই ব্যবস্থার ফলে তিব্বতে অবিবাহিত স্ত্রীলোকের সংখ্যা খুবই বেশী এবং ব্যভিচার ও নানা কুৎসিত রীতি দেশময় ছেয়ে পড়েছে।

---

১ মহাভারতের যুগে পঞ্চপাণ্ডবের এক ধর্মপত্নীর উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়। তিব্বতে ঐ প্রকার বিবাহপ্রথা খুব সম্ভব তৎকালীন ভারতীয় সামাজিক রীতি হতে উদ্ভূত। হিমালয়ের কোন কোন স্থানে এক পরিবারে সকল ভাইদের জন্য বিবাহিত স্ত্রী একজনই—এ প্রথা এখনও বর্তমান। এ প্রথার আদি কোথায়—তা নির্ণয় করা সুকঠিন ব্যাপার, সন্দেহ নাই।

তিব্বত পৃথিবীর মধ্যে সর্বোচ্চ মালভূমি। এই বিস্তীর্ণ মালভূমির সর্বনিম্ন স্থান দশহাজার ফুট হতে আরম্ভ করে আঠার হাজার পাঁচ শত ফুট উচ্চ স্থানে পর্যন্ত লোকজনের বসবাস দেখতে পাওয়া যায়। অনেক স্থানই বৎসরের ছ'মাস বরফে আচ্ছন্ন থাকে। পশ্চিম তিব্বত অপেক্ষাকৃত বেশী উঁচু। তের হাজার ফুটের কম উচ্চতার স্থান কোথাও নেই। তিব্বতীদের পোশাক এক অদ্ভুত ধরনের। যদিও গ্রীষ্মকালে তারা মোটা পশমের পোশাক ব্যবহার করে কিন্তু শীতের পোশাক অধিকাংশই চামড়ার তৈরী। কোথাও বা পশমী পোশাকের উপর ব্যবহৃত হয় চামড়ার পোশাক। ছাগল বা ভেড়ার চামড়ার লম্বা লম্বা লোম ভিতরের দিকে দিয়ে তারা গোটা চামড়াটাই সেলাই করে পা-জামা এবং ঢোলা লম্বা কোট প্রস্তুত করে। পশম ভিতরের দিকে থাকার দরুন ঐ পোশাক খুবই গরম হয়। আর চামড়া বাইরের দিকে থাকে বলে বরফ বা বৃষ্টি নিবারণ করে। মাথায়ও চামড়ার কানঢাকা টুপী। পায়ে চামড়ার আস্তরণ দেওয়া হাঁটু পর্যন্ত পশমের জুতা। আঙ্গুলসমেত ঢেকে গিয়েও জামার হাতাগুলি ঝুলতে থাকে অনেকটা। ঐ চামড়া তারা নিজেরাই এমন নরম করে পরিশোধন করে যে, তাতে বেশ ম. । পোশাক তৈরী হয়। দেখতে যদিও বিকটাকার কিন্তু বড়ই আরামদায়ক। সঙ্গতিসম্পন্নদের পোশাকে অবশ্য যথেষ্ট পারিপাট্য আছে।

তিব্বতে মৃতদেহের সৎকার-প্রণালী বড়ই রোমাঞ্চকর। যদিও তাদের ধর্মানুশাসনে শব দাহ করার বিধি আছে কিন্তু কাষ্ঠাদির অপ্রাচুর্যের জন্য বিশেষতঃ পশ্চিম তিব্বতে খুব অল্পসংখ্যক মৃতদেহই দাহ করা হয়। অবশ্য বিশিষ্ট লামা ও ধনীলোকদের মৃতদেহ এক-দু মাস পরে খুবই ঘটা ক'রে দাহ করে এবং সেই শ্মশানের উপর নির্মিত হয় ছোট-বড়

স্তূপ। তা ছাড়া সাধারণের মৃতদেহ খণ্ড খণ্ড করে কেটে শিয়াল, কুকুর বা শকুনিদের খেতে দেওয়ার প্রথা। আর মৃতের খুব নিকট আত্মীয়কেই সম্পন্ন করতে হয় ঐ শবব্যবচ্ছেদ-ক্রিয়াটি। লামা পুরোহিত ঐ মাংস মন্ত্রপূত করে বাড়ীর কোন্ দিকে কতদূরে কোন্ শুভ মুহূর্তে উহা নিক্ষেপ করতে হবে তার বিধান দেন। মৃতদেহ বরফের নীচে প্রোথিত করা বা জলে ফেলে দেওয়ার রীতিও আছে। মৃতের আত্মা নাকি সৎকারের পূর্ব পর্যন্ত দেহটিকে আশ্রয় করেই অবস্থান করে। দেহটির এই পরিণতি দেখে আত্মা দুহাত তুলে সকলকে আশীর্বাদ করতে করতে স্বধামে গমন করে। এ বিবরণ শুনে জনৈক সহযাত্রী আতঙ্কে বলে উঠলেন—"মশাই! জন্মান্তরে তিব্বতে যেন আসতে না হয়। আস্ত দেহটাকে কেটে কেটে শেয়াল কুকুরকে খাওয়াবে—এ দু'চোখ দিয়ে দেখতে পারব না। এখানে দেখছি মরার আগেই মরে যাওয়া ভাল।"

বেলাবাড়ার সঙ্গে রৌদ্রও প্রখর হয়ে উঠেছে। গা যেন পুড়ে যায়! ডান দিকে প্রায় দেড় মাইল দূরে রাক্ষসতাল। বিশাল হ্রদের সুনীল জলরাশি সূর্যকিরণে ঝিক্‌মিক্ করছে। রাবণহ্রদকে তিব্বতীরা বলে 'লাঙ্গক্ ছো' এবং এই তালের জলকে মহা অপবিত্র বলে পানের অযোগ্য মনে করে। বেশ বড় সরোবর—প্রায় দেড়শো বর্গমাইলব্যাপী। ঐ বিশাল হ্রদের মধ্যে বৃক্ষলতাহীন প্রস্তরময় কূর্মপৃষ্ঠাকৃতি দুটি দ্বীপ আছে—প্রত্যেকটিই দৈর্ঘ্যে প্রায় এক মাইল। একটি 'লাচা-টু' অর্থাৎ হংসদ্বীপ, অপরটির নাম 'টোপ্ সামরা'। শীতকালে যখন মানসসরোবর ও রাক্ষস-তাল প্রভৃতি তিব্বতের বৃহৎ জলাশয়গুলি জমে যায়, তখন ঐ সকল জলাশয়ের নানাজাতীয় অসংখ্য হংসগুলি কিছুদিনের জন্য আশ্রয় নেয় রাক্ষসতালের দ্বীপ দুটিতে এবং তথায় প্রচুর ডিম পাড়ে। রাবণহ্রদের

জল এমনই কঠিন বরফে পরিণত হয় যে, তার উপর দিয়ে মানুষ ঘোড়া প্রভৃতি অনায়াসে যাতায়াত করে থাকে।

প্রবাদ—দশমুণ্ড রাবণ সমগ্র কৈলাসসমেত মহাদেবকে লঙ্কায় নিয়ে যাবার সঙ্কল্প করে এস্থানে কঠোর তপস্যা করেছিলেন। তাঁর সহস্র সহস্র বৎসরের মহোগ্র তপস্যায় প্রসন্ন হয়ে দেবাদিদেব 'তথাস্তু' বলে রাবণকে প্রার্থিত বর দান করলেন। কিন্তু সামান্যমাত্র সর্ত রাখলেন যে, পর দিবস সূর্যোদয়ের পূর্বে তিনি যদি কৈলাসশিখরে উপনীত হতে না পারেন, তাহলে তাঁর মনস্কামনা পূর্ণ হবে না। এদিকে রাবণ রাত্রি-শেষেই কৈলাসে আরোহণ আরম্ভ করেছেন। কিন্তু পথ হারিয়ে এদিক সেদিক ঘুরতে ঘুরতে কিছুতেই সূর্যোদয়ের পূর্বে কৈলাসশিখরে পৌঁছতে পারলেন না। বিফলমনোরথ লঙ্কেশ্বর ভয়ানক ক্রোধাবিষ্ট হয়ে বিপুল শক্তিপ্রয়োগে বিংশতি হস্তে কৈলাসপর্বতকে আঁকড়ে ধরে সমূলে উৎপাটন করার জন্য টানাটানি করতে লাগলেন। সমগ্র কৈলাস কেঁপে উঠল—প্রচণ্ড বেগে প্রস্তরসমূহ স্থানচ্যুত হয়ে ভীষণ শব্দে পড়তে লাগল। শিবানুচর-বর্গ ভয়ে দারুণ কোলাহল করে উঠেছে দেখে পার্বতী ভীতা হয়ে দেব-দেবকে জিজ্ঞাসা করলেন—"ব্যাপার কি?" নীলকণ্ঠ সবই জানতে তিনি মৃদু হেসে ডান পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলি দ্বারা একটু চাপ দিলেন কৈলাসের উপর। সে চাপে মর্মান্তিক আর্তনাদ করে রাবণ মূর্ছিত হয়ে পড়লেন। কৈলাস-উৎপাটনের জন্য প্রাণান্ত ধস্তাধস্তি করার ফলে রাবণের শরীর হতে এত ক্লেদ নির্গত হয়েছিল যে, তাতে একটি প্রকাণ্ড হ্রদের সৃষ্টি হয়।

ব্যর্থকাম রাবণ পুনর্বার তীব্র তপস্যায় প্রবৃত্ত হলেন। সহস্র বৎসরের উগ্র তপস্যায় তুষ্ট হয়ে আশুতোষ রাবণকে পুনর্বার দর্শন দিয়ে বললেন—"তোমার শৌর্যবীর্য ও ঐকান্তিকতায় পরম প্রীত হয়েছি। যতকাল কৈলাস

বর্তমান থাকবে, ততদিন তোমার নামও হবে অক্ষয়। আজ হতে এ হ্রদ রাবণহ্রদ নামে খ্যাত হবে।"

রাক্ষসতালের তীরে একরাত্রি কাটাবার ইচ্ছা ছিল কিন্তু 'জামরভীতি' সেই ইচ্ছা পূর্ণ হতে দিল না। আমরা চলেছি সোজা মানসসরোবরের দিকে। আজ আমাদের দলটি ছন্দোবদ্ধভাবে চলছে না, সবই যেন কেমন খাপছাড়া—কাঁটা-ঝোপের ভিতর দিয়ে কোন প্রকারে এগিয়ে যাওয়াই একমাত্র লক্ষ্য। ঘোড়া এবং খচ্চরগুলিও ক্রমে অকর্মণ্য ও উচ্ছৃঙ্খল হয়ে পড়েছে। গাবিয়াং ছেড়েছি অনেক দিন। তিব্বতে ঘাস নেই বললেই চলে। ক্ষুধার তাড়নায় বেচারীরা এখন কাঁটাঝোপ খেতে আরম্ভ করছে। তারা এখন কোনরকমে বাঁচতে চায়। কঠোর শাসনও তাদের সংযত ও শৃঙ্খলাবদ্ধ করতে পারছে না—আত্মরক্ষার প্রচেষ্টায় মরিয়া হয়ে উঠেছে। পুণ্যকামীর দল আমরাই তো পশুগুলির এত দুঃখের কারণ!

সমাজবদ্ধ মানুষের জীবনেও বোধ হয় এমনটি-ই হয়। জীবনের গতি যখন সহজ থাকে, তখন মানুষ মেনে চলে সকল অনুশাসন কিন্তু অভাবের দারুণ নিষ্পেষণ, বলবানের নির্যাতন, স্বার্থান্বেষীদের তাড়না তাকে করে ফেলে অসংযত। তখন সে ন্যায়-অন্যায় সৎ-অসৎ-এর বাঁধনগুলি নির্মম হস্তে ভেঙ্গে ফেলতে দ্বিধা বোধ করে না। আত্মরক্ষার প্রচেষ্টা বেগবতী নদীর স্রোতের মতন সব কিছু প্রতিবন্ধক ভাসিয়ে নিয়ে যায়। বাঁচবার সর্বজয়ী ইচ্ছা কোন বাধাই মানে না।

ক্রমে গঙ্গাচু-র ক্ষীণ জলধারা অতিক্রম করে চলেছি। রাক্ষসতাল মানসসরোবর অপেক্ষা অনেক নিম্নে অবস্থিত। মানসের উদ্বৃত্ত জলরাশি স্রোতাকারে প্রবাহিত হয়ে রাক্ষসতালের অপবিত্র জলের সঙ্গে মিশেছে। ঐ স্রোতপথটি-ই গঙ্গাচু। চল্লিশ-পঞ্চাশ হাত মাত্র চওড়া

ও খুব অগভীর। মানসের জল কমে গেলে গঙ্গাচু একেবারে শুকিয়ে যায়। দুই হ্রদের ব্যবধান মাইল দুই মাত্র। গঙ্গাচু-র ধারে ধারে কয়েকটি উষ্ণ প্রস্রবণ আছে।

বেলা প্রায় সাড়ে দশটা। ক্ষুদ্র চড়াইটি শেষ করে একটা উঁচু জায়গায় দাঁড়িয়ে একটু দম নিচ্ছি। দেখা গেল—দূরে তিনজন অশ্বারোহী রাক্ষসতালের দিক থেকে দ্রুত ঘোড়া ছুটিয়ে আমাদের দিকে আসছে। তাদের অশ্বচালনার ভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছিল—তারা পাকা সওয়ার। একজন বলল—ডা: : নয় তো? দিন দুপুরে জামর? এদের লক্ষ্য করা প্রয়োজন। গাইড দাঁড়ালো সেখানেই। ডাঃ দে এসে পৌঁছতেই তাঁর দূরবীন নিয়ে দেখা হল। ক্রমে সকলেই জড়ো হলাম। গাইড মুখ শুকনো করে বললে, "ঠিক বুঝতে পারছি নে। এরা কে তা নির্ণয় না করে এগিয়ে যাওয়া ঠিক হবে না।"

সকলেই খুব চঞ্চল হয়ে উঠেছে। আগ্নেয়াস্ত্রগুলি ভরা হল। কীচখাম্পা কার্তুজবেল্ট নিয়ে ঝোপের আড়ালে গুঁড়ি মেরে মেরে এগিয়ে চলেছে। অশ্বারোহীরা আসছিল আমাদের দিকেই। ঘোড়াগুলি খুবই তেজস্বী-- দ্রুত আসছে। খানিক পরে কীচখাম্পা দূর থেকে চিৎকার করে কি যেন জিজ্ঞাসা করেছে। তারাও জবাব দিয়ে ক্রমে এগিয়ে এল গাইডের দিকে। তাদের সঙ্গে হাসিমুখে গাইডকে কথা বলতে দেখে বোঝা গেল—'মিত্র পথ'। আরোহীরা নীচ দিয়ে সোজা চলে গেল মানসের দিকে। "লোকগুলি পরিচিত ছুনিয়া। অন্য যাত্রিদলের সঙ্গে তাঁবু ফেলেছে রাক্ষসতালের ধারে। যাত্রীদের জন্য মানসের জল নিয়ে যাবে"—গাইড বলল।

বাঁচা গেল। এতক্ষণে আরম্ভ হল আমাদের সাহসী সহযাত্রীদের বিরাট আস্ফালন। অরুণ বাবু বলছেন,—"এ তিনটেকে একাই শেষ

করে দিতাম।" তারাপ্রসন্ন বাবুও বীরত্বে কম যান না। বললেন—"বাছাবা বড্ড বেঁচে গেল। আর একটু এলেই তো মেরে দিতুম।"

খুব শোরগোল করতে করতে এগিয়ে চলেছি। দারুণ রোদ। পূর্বরাত্রির দুর্জয় ঠাণ্ডা রূপান্তরিত হয়েছে নির্মম গ্রীষ্মে। লু-র মতন গরম হাওয়া।

ক্রমে এসে দাঁড়ালাম মানসের তীরে। এ কি স্বপ্ন? কী অনির্বচনীয় সৌন্দর্যগরিমা! সম্মুখে—দূরে দৃষ্টির শেষ সীমা পর্যন্ত নির্মল অগাধ জলরাশি। তিব্বতের মালভূমিতে পনর হাজার ফুট উচ্চে দাঁড়িয়ে আছি—না সমুদ্রের ধারে? বিপুল বিস্তৃতি। উপরে সুনীল আকাশের চন্দ্রাতপ—ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গের সঙ্গে সূর্যকিরণের অপরূপ মিলনখেলা। মধ্যাহ্ন-সূর্যের উজ্জ্বল রশ্মিতে সমগ্র সরোবরটি ঝক্‌ঝক্ করছিল—যেন আনন্দশিহরণ। পূর্ব-পশ্চিম-উত্তর-দক্ষিণে দূর-দূরান্তর পর্যন্ত ছুটে যায় অবারিত দৃষ্টি। সামনে দিকচক্রবাল পরপারে গুরলার গগনস্পর্শী ধূসর শিখরের সঙ্গে মিশে গিয়ে দেখাচ্ছিল একটি ক্ষীণ রেখার মতন। সেই বিপুল অবকাশের মধ্যে আত্মস্থ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। জীবনের সকল সীমা অবলুপ্ত হল অসীমে। এ আত্মবিস্মৃতির যেন কখনও শেষ না হয়।

কীচখাম্পার নির্দেশে তাঁবু পড়ল সরোবরের বেলাভূমির ঠিক উপর। যাত্রীগণ পবিত্র জল স্পর্শ করলেন। শত শত রাজহংস সরোবরের তীরে বসেছিল। নিস্তব্ধ মধ্যাহ্নে আমাদের দলটির আকস্মিক আগমনে তন্দ্রাবিষ্ট মরালগুলি ভয়ে কলধ্বনি করে ত্রস্তভাবে সরোবরে উড়ে পড়ছিল। যে সকল নানাজাতীয় অসংখ্য হংস নিজেদের ছানাগুলি নিয়ে আনন্দে সরোবরের জলে ভেসে বেড়াচ্ছিল, তারাও ভয়ে সরে গেল দূরে। খানিক বিশ্রামান্তে সকলেই সরোবরের জলে অবগাহন-স্নান করলাম। খুবই তৃপ্তি হল।

মানসসরোবরের উচ্চতা প্রায় ১৫০৯৮ ফুট (মতান্তরে ১৪৯৫০ ফুট)। জল অবশ্য বরফের মতন শীতল, কিন্তু গৌরীকুণ্ডে স্নানের তুলনায় এ স্নান বেশ আরামদায়ক বলা যেতে পারে। আমরা ভেবেছিলাম সমগ্র সরোবরই গৌরীকুণ্ডের মতন বরফে ঢাকা দেখব। তা না হয়ে সুনীল জলরাশি দেখতে পেয়ে আনন্দে নির্বাক হয়েছি। স্নানান্তে সরোবরের তীরে বসে পূজা ও স্তবস্তুতিপাঠ-সমাপন হতে বেজে গেল আড়াইটা। ততক্ষণে মধ্যাহ্নের গ্রীষ্ম বসন্তে রূপান্তরিত হয়েছে। আজ সকলের প্রাণ অফুরন্ত আনন্দে ভরপুর। বহুকালের ঈপ্সিত মানসসরোবর দর্শন করে চিত্ত-সরোবরে উঠেছে আনন্দহিল্লোল। কারো বিশ্রামের প্রবৃত্তি নেই। আহারাদির পরই সকলে সরোবরের তীরে তীরে বেড়াতে লাগল। নানাবর্ণ ও আকৃতির উপলখণ্ড সমাকীর্ণ খাড়া ঢালু বেলাভূমি। প্রবাদ আছে—মানসের তীরে 'পরশপাথর' পাওয়া যায়। স্বামী দুর্গাত্মানন্দ অক্লান্তভাবে তাই খুঁজে ফিরতে লাগলেন। তীরময় কত বিভিন্ন রং-এর ছোট ছোট পাথর।

তিব্বতী ও ভুটিয়া ঘোড়াওয়ালারা সরোবরের ধারে ঘুরে ঘুরে মরা মাছ সংগ্রহ করে এনেছে। বেশ বড় বড় মাছ। জোরে হাওয়া বইলে সরোবরে সাগরের মতন ঢেউ হতে থাকে আর ঢেউএর সঙ্গে মাছগুলি উঠে পড়ে তীরে কিন্তু নামতে পারে না—মরে যায়। ঐ মরা মাছগুলিই নাকি মানসসরোবরের প্রসাদ। সেগুলি তারা প্রসাদরূপে ঘরে নিয়ে যাবে। ঐ মাছ গুঁড়ো করে একটু একটু করে ঐ প্রসাদ খাবে সারা বৎসর ধরে। এ প্রসাদের মাহাত্ম্যের নাকি অন্ত নেই—সর্বপ্রকার বিপদ-নাশক—এমন কি বাঘের কবল থেকেও রক্ষা করে! ঐ মাছপ্রসাদের গুঁড়ো গৃহপালিত পশুদেরও খেতে দেয়—রোগ-মহামারীর ভয় থাকে না!

আরামদায়ক রৌদ্র। শান্ত মন। আজ দেহে মনে ফিরে এসেছে নূতন শক্তি, অপরিসীম প্রাণ। আজ আর ক্লান্তি নেই। অতীত যেন বিস্মৃতির কুহেলিকায় অবলুপ্ত। গত কয়েক সপ্তাহের দুঃখকষ্টের স্মৃতি যেন কোন অজানা দেবতার আশিসচুম্বনে একেবারে মুছে গেছে। দুর্গম? এত দুর্গম বলেই তো সেই বিরাটের পদতল এত মহিমময়। বসে আছি আপনমনে। সামনে পড়ন্ত রোদে মানসের অগাধ সুনীল জলরাশি সোনালী রং ধরেছে। খুব কাছে ও অতি দূরে নানাদিকে ভেসে বেড়াচ্ছে সাদাসাদা অসংখ্য মরাল—যেন শত শত শ্বেতকমল ফুটে আছে মানসের বুকে। ঝড় উঠল। আহা! কেমন ঢেউ খেলছে। ঢেউগুলি সজোরে আছড়ে পড়ছে বেলাভূমির উপর। এত উচ্চে এ অসীম জলরাশি—না দেখলে এ যে কল্পনায়ও আসে না! সৃষ্টি-বৈচিত্র্যের কী অপরূপ মহিমা! চারিদিকে পর্বতমালা। দিকচক্রবালের শেষ সীমায় আকাশ আর সরোবর মিশে এক হয়ে গেছে। শেষ যে কোথায় কিছুই তো বুঝা যায় না! প্রতিপলে চিত্রপটের পরিবর্তন—নব নব অপরূপ শোভা। পারবে কোনও শিল্পী এর কণামাত্রও রচনা করতে? পতনোন্মুখ সূর্যের স্বর্ণচ্ছটা পড়েছে সারাটি সরোবরে ছড়িয়ে। রক্তরাঙা আকাশের চন্দ্রাতপতলে সোনার সরোবর। নির্জন মানসের তীরে পরিপূর্ণ প্রাণে বসে আছি। দেখি, আর মুগ্ধ হই। আরও দেখতে ইচ্ছা হয়। জীবনে এমনটি আর কখনও দেখতে পাব না। মন, এঁকে নে আপন মানসপটে এ স্বপ্নলোকের ছবি! হয়তো মানসে এমন অপরূপ সৌন্দর্যের বিকাশ প্রতিদিনই হয়।

আলোকের গরিমা স্তিমিত হয়ে আসছে। অস্তগামী সূর্যটি দিকসীমান্তে দেখা যাচ্ছিল,যেন শিবানীর ললাটে একটি মঙ্গল-সিন্দুর-বিন্দু। বিদায় বাঁশী পূরবী রাগিনীতে আকাশে বাতাসে ও সারাটি প্রাণেও বেজে উঠল।

ক্রমে সায়াহ্নের শেষ স্বর্ণরেখা সন্ধ্যার বুকে মিলিয়ে গেল। উন্মুক্ত আকাশে কৃষ্ণাদশমীর অন্ধকার এল ঘনিয়ে। সারি সারি নক্ষত্রমণ্ডলী অনন্ত আকাশে মিট্‌মিট্‌ করছে। যেন দেবশিশুগণ অবাক্ নয়নে দেখছে মানসের অনুপম সৌন্দর্য।

মানসের পরিধি প্রায় ষাট মাইল। কোন কোন স্থানের গভীরতা প্রায় তিনশত ফুট পর্যন্ত। দুইশত বর্গমাইল আয়তনের এই বিশাল সরোবরটির চারিধারে তিব্বতী লামাদের আটটি গুম্ফা। তিব্বতী লামা বা ডাবারা বারোমাসই ঐ সকল মঠে বাস করে। পশ্চিমে গোছুল গুম্ফা, উত্তর-পশ্চিমে চিউ গুম্ফা, উত্তরে চারকিপ্, লাং পোনা ও পুনারি গুম্ফা, পূর্বদিকে সোরালাং আর দক্ষিণে ইয়াং গো এবং থুগলু বা থোকর গুম্ফা।

ডিসেম্বর মাসের শেষভাগে মানসসরোবরের জল জমতে আরম্ভ করে এবং সাত-আট দিনের মধ্যেই সমগ্র সরোবরের উপরিভাগ আট-দশ ফুট পুরু হয়ে জমে যায়। ঐ বরফের নীচে থাকে নির্মল অগাধ জল। উপরকার বরফ এমনই স্বচ্ছ যে, অনেক স্থানে বরফের ভিতর দিয়ে নীচের জলে মাছগুলি যে খেলা ক'রে বেড়ায় তা পরিষ্কার দেখা যায়। রাক্ষসতালের জলও প্রায় ঐ একই সময়ে জমে গিয়ে কঠিন বরফে পরিণত হয়। তখন তার উপর দিয়ে জীবজন্তু চলাচল করে থাকে, কিন্তু মানসের বরফ ফেটে গিয়ে ভিতর থেকে জলরাশি সবেগে ঊর্ধ্বে উত্থিত হয়। সঙ্কোচন ও প্রসারণের ফলে মানসের বরফে প্রায়ই এমন বিস্ফোরণ হয় যে, সমগ্র তীরদেশ পাহাড়-প্রমাণ বরফে আচ্ছাদিত হয়ে যায়। ঐ বিস্ফোরণের সময় পনর-বিশ হাত চওড়া বরফখণ্ডও সবেগে বহু দূরে নিক্ষিপ্ত হয়। সেজন্য বরফ জমে যাবার পরে শীতকালে কেউই মানসের ধারে আসতে

সাহস করে না। মানস ও রাক্ষসতালের উচ্চতায় প্রভেদ সামান্তই এবং দুটি সরোবরই একরকম পাশাপাশি অবস্থিত, অথচ রাক্ষসতালেব বরফে কখনও এরূপ বিপর্যয় হতে দেখা যায় না। ভূবিদ্যা-বিশারদগণের মতে এবং তিব্বতে জনশ্রুতিও আছে যে, মানসসরোবরের তলদেশে বহু উষ্ণ প্রস্রবণ আছে। সেজন্তই মানসে ঐপ্রকারে স্ফোরণ হয়ে থাকে। তিব্বতীদের বিশ্বাস যে, সরোবরের জলমধ্যে এক রমণীয় মন্দির বিদ্যমান, তাতে বাস করেন এক ভীষণাকৃতি দেবতা। ঐ দেবতাই নাকি তীরের দিকে বরফ নিক্ষেপ করেন।

অনেক যাত্রীই কৈলাস-পরিক্রমার ন্যায় এই পবিত্র সরোবরকেও পরিক্রমা করে থাকে। মোটামুটি তাতে সময় লাগে পাঁচ দিন। আমাদেরও ইচ্ছা ছিল পরিক্রমা করব কিন্তু নানা কাবণে বিশেষ করে জানোয়ারগুলি ক্রমে এত দুর্বল হয়ে পড়েছিল যে, তাদের দিকে চেয়ে আমাদের সে সঙ্কল্প ছাড়তে হয়েছিল।

পুরাকালের অনেক প্রথিতনামা কবি মানসসরোবরের বর্ণনায় তথায় প্রস্ফুটিত কমলের উল্লেখ করেছেন। মহাকবি কালিদাস তো মানসসরোবরকে 'স্বর্ণকমলের আকর'ই বলেছেন। তাঁর 'মেঘদূত' কাব্যে কৈলাসের বর্ণনায় (উত্তর মেঘ—তৃতীয় শ্লোক) দেখা যায়—"সেই অলকাপুরীতে (কৈলাস) যাবতীয় বৃক্ষেই ষড়ঋতুতে তৎকালীন পুষ্প বিকশিত হয়ে থাকে এবং উন্মত্ত ভ্রমরগণ নিরন্তর সেই সকল পুষ্পে উপবেশন ক'রে শ্রুতি-সুখকর ধ্বনি করে। সরোবরসমূহ সততই বিকশিত সরোজরাজি দ্বারা পরিশোভিত হয়ে থাকে; হংসযূথও সর্বদা সেই সকল কমল পরিবেষ্টনপূর্বক পরম শোভা সম্পাদন করে থাকে। তত্রত্য গৃহপালিত ময়ূরেরা নিরন্তর সানন্দে কেকা-রব বিস্তার করে; তাদের বর্ণ চিরদিনই নয়নের প্রীতিকর।"

অন্যত্র—'মন্দারতরু'রও উল্লেখ দেখা যায়। এ সব বর্ণনা হ'তে সাধারণের এই ধারণা আছে যে কৈলাস ও মানসসরোবর বৃক্ষ-লতা-ফলফুল-কমল-পশুপক্ষি-পরিশোভিত স্থান। কৈলাসের উচ্চতা যতটা, তাতে ভূতত্ত্ব-বিশারদদের মতেও তথায় বৃক্ষলতা, বিশেষ ক'রে সুরভি পুষ্পসম্ভার জন্মান অসম্ভব। আমরাও দেখি নি। ঐ সব বর্ণনা বোধ হয় কবি-কল্পনা বা বর্ণনার অলঙ্কার—কমল ব্যতীত সরোবরের শোভা অসম্পূর্ণ থেকে যায়।

মানসে কমল খুঁজে খুঁজে চোখে ব্যথা ধরে গেছে, কিন্তু কোথাও কমলদল তো দূরের কথা শালুকফুলও দেখতে পাওয়া গেল না। মানসে অসংখ্য মরাল অবশ্যই আছে, কিন্তু কমল নেই। বিগত শত বৎসরের বহু পর্যটকের বর্ণনায়ও মানসে কমলের উল্লেখ কোথাও দেখা যায় না। আমরা বহু হুনিয়া ও স্থানীয় তিব্বতী লামা—যাঁরা বারমাসই মানস-সরোবরের তীরে বাস করেন—তাঁদের নিকট অনুসন্ধান করেছি। ঐ সরোবরে কমল কেউ কখনও দেখে নি। নানাজাতীয় শৈবাল আছে এবং তাতে সাদা সাদা ছোট ফুল ফোটে—এইমাত্র।

মানসে ছোট-বড় ও নানাবর্ণের বিশ-পঁচিশ বিভিন্নজাতীয় অসংখ্য হাঁস দেখতে পেয়েছিলাম। রাজহংসগুলি খুবই বড়। ছোট ছোট ছানা সঙ্গে নিয়ে ঘন শৈবালের মধ্যে খাবার অন্বেষণ ক'রে আনন্দে ভেসে বেড়ায়। মানসে মাছও আছে বহু রকমের। 'গামা' জাতীয় এক প্রকার মাছ—দেখতে কতকটা ছোট মহাশোলের মতন—প্রচুর আছে।

মানসসরোবরের উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায় স্কন্দপুরাণান্তর্গত মানস-খণ্ডে। দত্তাত্রেয় ঋষি মানসের বর্ণনায় বলেছেন— "আমি মানসসরোবর

দর্শন করেছি। তথায় শিব রাজহংসরূপে বিরাজ করছেন।[১] এই সরোবর ব্রহ্মার মন হতে উদ্ভূত বলে উহার নাম মানস-সরোবর। তথায় মহাদেব ও অন্যান্য দেবতাগণ বাস করেন। এই সরোবর হতেই সরযূ, (কর্ণালী—তিব্বতী নাম মাপ-চু) শতদ্রু এবং অন্যান্য নদনদী নির্গত হয়েছে। যে-কেহ এই সরোবরের মৃত্তিকা স্পর্শ এবং এর পবিত্র সলিলে অবগাহন করবে, তারই শিবলোকপ্রাপ্তি হবে এবং শত জন্মের পাপ বিদূরিত হয়ে যাবে। এমন কি যে-সকল নরনারী মানসসরোবরের পবিত্র নাম জপ করে, তাদেরও ব্রহ্মলোক-প্রাপ্তি হয়। এই সরোবরের জল মুক্তার ন্যায় নির্মল। . . (জগতে) এমন কোন পর্বত নেই যার সঙ্গে হিমালয়ের তুলনা হতে পারে, কারণ এই পর্বতেই কৈলাস ও মানসসরোবর বিদ্যমান। প্রভাতে সূর্যকিরণস্পর্শে যেমন শিশির শুকিয়ে যায়, তেমনি হিমালয়দর্শনমাত্রেই মানবগণ পাপমুক্ত হয়।" দত্তাত্রেয় ঋষিও মানসে কমলের উল্লেখ করেন নি।

স্কন্দপুরাণান্তর্গত মানসখণ্ডের বর্ণনা হতে মনে হয়, পৌরাণিক যুগে তিব্বত, অন্ততঃপক্ষে তিব্বতের যে অংশে কৈলাস ও মানসসরোবর বিদ্যমান, তা ভারতেরই এক অংশ ছিল। তিব্বতীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশে এবং তাদের সঙ্গীত নৃত্যকলা ভাস্কর্য কলাবিদ্যা সামাজিক রীতিনীতি এবং ধর্মভাব প্রভৃতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হয়ে দেখেছি যে, তিব্বতে

---

১ শিব রাজহংসরূপ ধারণ করেছিলেন—অতি পুরাকাল হইতেই এই ধর্মবিশ্বাসের বশবর্তী হয়েই বোধ হয় তিব্বতীদের নিকট হংস অবধ্য। আর এই পৌরাণিক তথ্যে বিশ্বাসী বলেই তিব্বতে কিংবদন্তী আছে যে, মানসের অভ্যন্তরে দেবতা বাস করেন। তিব্বত যে এক সময়ে ভারতেরই অংশ এবং তিব্বতীরা যে হিন্দুধর্মাবলম্বী ছিল, তার প্রমাণ-স্বরূপ এপ্রকার বহু ধর্মবিশ্বাস ও কিংবদন্তীর উল্লেখ করা যেতে পারে।

এখনও ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির গভীর ছাপ বিদ্যমান। তিব্বত যে এক সময়ে ভারত অন্তর্ভুক্ত ছিল, সে বিষয়ে নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে।[১]

তিব্বত হতে চারটি প্রধান নদনদী নির্গত হয়ে নদীমাতৃক ভারত-ভূমিকে শস্য শ্যামলা করেছে। এই স্রোতস্বিনী-চতুষ্টয়ের উৎপত্তিস্থান-নির্ণয়বিষয়ে বর্তমানে ভৌগোলিকদের মধ্যে মতভেদের সৃষ্টি হয়েছে। বহু পুরাকাল হতেই প্রসিদ্ধি আছে যে, সরযূ ব্রহ্মপুত্র সিন্ধু ও শতদ্রু—এই চারটি বিশাল স্রোতস্বতী, পরম পবিত্র মানসসরোবর (তিব্বতী নাম—ছো-মাভং) হতে উৎপন্ন এবং সেজন্য হিন্দুমাত্রই এই চারটি জলপ্রবাহকে পুণ্যতোয়া মনে করে। বর্তমানে কোন কোন পর্যটক ও ভূতত্ত্ববিৎ প্রমাণ করতে চেষ্টিত যে, এই নদনদীগুলির উৎপত্তিস্থান ঠিক মানসসরোবর নয়। পরন্তু মানসের নিকটবর্তী বিভিন্ন স্থান হতে এরা উৎপন্ন। তাঁদের এ যুক্তি অবশ্য কোন বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান বা সুনিশ্চিত গবেষণার উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। তাঁদের মধ্যে কেহ কেহ এও স্বীকার করেন যে, মানসসরোবরের ভূগর্ভনিঃসৃত স্রোতের সঙ্গে এই নদীচতুষ্টয়ের উৎপত্তিস্থানের সংযোগ আছে।

---

১ বহু পুরাণ তন্ত্র ও মহাভারত প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থে উল্লিখিত আছে যে, পুরাকালে ভারতবর্ষ বিষ্ণুক্রান্তা রথক্রান্তা ও অশ্বক্রান্তা—এই তিনটি ক্রান্তাতে বিভক্ত ছিল। বিন্ধ্য হতে পূর্বদিকে জাভাদ্বীপ পর্যন্ত (বর্তমান ব্রহ্মদেশ সমেত) সকল দেশ বিষ্ণুক্রান্তা, বিন্ধ্য হতে উত্তরে তিব্বত মঙ্গোলিয়া প্রভৃতি দেশ পর্যন্ত রথক্রান্তা এবং বিন্ধ্য পর্বত হতে পশ্চিমে পারস্য মিশর ও রোডেসিয়া প্রভৃতি দেশ অশ্বক্রান্তা নামে প্রসিদ্ধ ছিল। বর্তমানে অনেক মনীষিগণের গবেষণায়ও অতীত বৃহত্তর ভারতের উক্ত ভৌগোলিক অবস্থিতি প্রমাণিত হয়।

তিব্বতীদের কৈলাসপুরাণ 'কাংবি কারছাক'-এ বর্ণিত আছে—"চারিটি বড় বড় নদীর উৎপত্তিস্থান 'ছো-মাভাং', অর্থাৎ অজেয় মানস-সরোবর : লাংচেন্ খাম্বাব অর্থাৎ হস্তিমুখাকৃতি নদী (শতদ্রু) এই সরোবরের পশ্চিম দিকে, সিংগী খাম্বাব অর্থাৎ সিংহ-মুখাকৃতি নদী (সিন্ধু) উত্তরে, 'টামচোক্ খাম্বাব' অর্থাৎ অশ্বমুখাকৃতি নদী (ব্রহ্মপুত্র) পূর্বদিকে এবং 'মাপচা খাম্বাব' অর্থাৎ ময়ূর-মুখাকৃতি নদী (কর্ণালী) দক্ষিণদিকে প্রবাহিত।"

স্কন্দপুরাণে প্রথম উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায় যে, সরযূ ও শতদ্রু মানসসরোবর হতে উৎপন্ন। মানসের দক্ষিণতীরস্থ থগলু বা থোকর-গুম্ফার প্রাচীরে খোদিত একখণ্ড শিলালিপিতেও রয়েছে—"চারটি বড় ও চারটি ছোটনদী মানসসরোবরের ভূগর্ভপথে নির্গত হয়েছে।"

এইসকল ভারতীয় ও তিব্বতের পৌরাণিক উল্লেখ হতে মনে হয় যে, সরযূ ব্রহ্মপুত্র সিন্ধু ও শতদ্রু—এই চারটি নদনদীর প্রকৃত উৎপত্তিস্থান মানসসরোবরই। সহস্র সহস্র বৎসরে ভৌগোলিক পরিস্থিতির বহুল পরিবর্তনের ফলে বর্তমানে এদের উৎপত্তিস্থান মানসের নিকটস্থ অন্যান্য স্থান বলে দেখা যাচ্ছে। আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি, মানসের পরিধি দুইশত-বর্গমাইল-ব্যাপী; গভীরতার পরিমাণ এখনও সঠিক পাওয়া যায় নি। (তিন শত ফুট পর্যন্ত স্থিরীকৃত হয়েছে)। উচ্চ পার্বত্য মালভূমির উপর এত বড় একটি জলাশয়ের জলের চাপের ফলে ভূগর্ভে যে ঐ জলের নির্গমপথ আছে তা খুবই বিজ্ঞানসম্মত। নূতন আবিষ্কৃত ও স্থিরীকৃত উৎপত্তিস্থানগুলি মানসের অপেক্ষা অনেক নীচে অবস্থিত এবং ঐ উৎপত্তিস্থানগুলি মানসসরোবর হতে খুব বেশী দূরেও নয়। সেজন্য নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে যে, ঐসকল উৎপত্তিস্থানের সঙ্গে ভূগর্ভ-

পথে মানসের জলরাশির সংযোগ আছে এবং এখনও ঐ মানসের জলই নদীগুলিব পুষ্টিসাধন করছে।

*   *   *

একদিক থেকে আজ আমাদের যাত্রার শেষ দিন। কৈলাস ও মানসসরোবরদর্শনই আমাদের মুখ্য কাম্য ছিল। তা দর্শন করেছি—পরিপূর্ণ দর্শন। দীর্ঘদিনের পথরেখাহীন পথযাত্রার বেদনাময় ইতিহাসটির দিকে এখন আর ফিরে তাকাতে ইচ্ছা হয় না। আজ দৃষ্টি প্রসারিত হয়েছে বিরাটের দিকে—অসীমের দিকে। মঙ্গলময়ের কৃপাদৃষ্টি হৃদয়-দেউলে জ্বেলে দিয়েছে আজ আনন্দ-প্রদীপ। মানসসরোবর এখন আর কল্পনাব বস্তু নয়—বাস্তব; এখন আর তিব্বতে নয়, বাইরে নয়—আমার মনমানসে। আপন মনের—অন্তরেই এখন দেখছি মানসকে। . . . রাতটা বড়ই আনন্দে কেটে গেল।

২৮শে আষাঢ় বৃহস্পতিবার। খুব ভোরে ভোরে উঠে যাত্রার আয়োজন করা গেল। গতরাত্রে বেশ ঠাণ্ডা ছিল। দিন ও রাতের মধ্যে তাপের তারতম্য প্রায় সত্তর ডিগ্রি। কেবলই মনে হচ্ছিল— যাত্রা শেষ। ধাপ ' তিন-চার দিন পরে তাকলাকোট হতেই আমাদের ঠিক ঠিক প্রত্যাবর্তন আরম্ভ হবে। তাড়াতাড়ি মানসে অবগাহন করে নিলাম। মানসকে সশ্রদ্ধ প্রণাম। বিদায়—বিদায়—বিদায়।

সরোবরের ধারে ধারে মাইল খানেক আসার পরে অসংখ্য মশা আমাদের অতর্কিত আক্রমণ করলে। পঙ্গপালের মতন তারা আকাশ ছেয়ে ফেলেছে—আর কী বড় বড় মশা! সহজাত সংস্কারের কত তীব্র প্রভাব! আমাদের পেয়েই কামড়ে অতিষ্ঠ করে তুলল। কিছুতেই ছাড়তে চায় না—ধাওয়া করে এল প্রায় এক মাইল ডাঃ দে কয়েকটি

মশা ধরে চমকে উঠে বললেন, "মশাই, এ যেন সত্যযুগের মশা!. কত বড় বড় দেখেছেন? তবে ম্যালেরিয়ার মশা নয়।" পনর হাজার ফুট উপরে, যে স্থান ছ'মাস ঢাকা পড়ে থাকে স্তূপীকৃত বরফের নীচে— সেখানেও মশকগুলি কি করে বেঁচে থাকে—আশ্চর্য! নিশ্চয়ই তারা কোন যৌগিক প্রক্রিয়া জানে—কুম্ভক করে পড়ে থাকে!

শান্ত অরুণোদয়। সমগ্র মানসের নীলজলে রক্তিম মঙ্গল-কিরণের বিপুল শিহরণ দেখে মুগ্ধ হয়ে যেতে হয়। পরপারে গুরলার শুভ্র কিরীট সূর্যরেখার স্পর্শে অপরূপশোভাময় হয়েছে। আমাদের আগমনে ভীত শত শত মরাল কলধ্বনি করে নিস্তব্ধ মানসে উড়ে পড়ছিল। মনোরম প্রভাত। দিকে দিকে রোমাঞ্চকর শোভার নিঃশব্দ সমারোহ। সেই ধ্যানমৌন প্রভাতে নির্জন মানসের তীরে তীরে প্রায় তিন মাইল পথ বেয়ে চলেছি। পর্বতচূড়ায়-চূড়ায় স্নিগ্ধ রোদ ঝিলমিল করছিল। চারদিক প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে। মানসের ধারেই একটু দূরে আর একটি ক্ষুদ্র সরোবর। প্রায় শুকনো। খড়িমাটির মতন সাদা মাটি। কীচখাম্পা বললে সোডা হ্রদ। তারা থলে ভরতি করে প্রচুর সোডা নিয়ে এল।

সোডা-হ্রদটি অতিক্রম করে খানিকটা এগিয়েছি। দূরে দেখা গেল একদল সশস্ত্র তিব্বতী। আমাদের যেতে হবে সেদিকেই। ভয়ে সকলকার মুখ বিবর্ণ হয়ে গেল। আমাদের দাঁড়াতে বলে কীচখাম্পা গিয়েছে এগিয়ে! খবর নিয়ে ফিরে এসে 'মার্চ অর্ডার' দিল। বন্দুকধারী তিব্বতীদল ব্যবসায় উপলক্ষ্যে যাচ্ছে তাকলাকোট মণ্ডিতে। আমাদের ভয়ে তারাও সশস্ত্র হয়ে চলেছে। শুনে হাঁপ ছেড়ে বাঁচা গেল। তিব্বতে পদে পদে বিপদ।

মানসসরোবরকে পেছনে রেখে এগিয়ে চলেছি। পর্বতের গা ঘেঁষে

কোথাও কণ্টকাকীর্ণ 'ডামা' ঝোপের ভিতর দিয়ে বড় বড় খরগোস দলে দলে ছুটে পালাচ্ছিল। একদল বন্য কুকুর হিংস্র লোলুপ দৃষ্টিতে আমাদের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে ঝোপের মধ্যে অদৃশ্য হল। ক্রমে রাক্ষসতাল ও মানসকে দুদিকে রেখে পথরেখা এগিয়ে গিয়েছে। দুদিকেই সুবিশাল সরোবর—সুনীল জলরাশি। এক শৈলশিরাব উপবে উঠতেই দেখা গেল পরমমহিমামণ্ডিত কৈলাসশিখর। রৌদ্রোজ্জ্বল পরিচ্ছন্ন নীল আকাশের চন্দ্রাতপতলে সেই চিবদুর্লভ রজতশুভ্র-কিরীট কৈলাস, আর নিকটে দুপাশে সুবিশাল দুটি সরোবর। সে শোভা অনির্বচনীয়। অতি বিস্তৃত উচ্চ কৈলাসশ্রেণীর পটভূমির নিম্নে একদিকে রাক্ষসতাল ও অন্যদিকে মানস-সরোবর—মধ্যে বিস্তীর্ণ মালভূমি। এমন অপরূপ রূপের সমাবেশ এস্থানটি ছাড়া আর কোথাও দেখা যায় না। কেবলই মনে হচ্ছিল, এ যেন মহাশিবের বিরাট শরীর। পরম পবিত্র কৈলাসশিখর দেবদেবের মস্তক—বিশাল হ্রদ দুটি তাঁর সজল নয়ন। জগতের দুঃখে বিগলিতচিত্ত পরমদেবতা বিশ্বমানবের প্রতি সকরুণ দৃষ্টিনিক্ষেপ করে বসে আছেন 'স্বে মহিম্নি'।

রোদের তেজ ক্রমেই বেড়ে চলেছে। আজ যেতে হবে অনেক দূর। পথও মহাদুর্গম। কোথাও বন্ধুর মালভূমির উপর দিয়ে, আব গিরিখাতের সংকীর্ণ বিপদসঙ্কুল পথে, বা শৈলশিরা অতিক্রম করে পর্বতের গা ঘেঁষে চলেছি। এদিকে বেলা বারটা বেজে গেছে, তবু পথের শেষ নেই। গাইড বললে, আব দু'মাইলের বেশী নেই। তার অর্থ ঘণ্টা দেড়েক আরও চলতেই হবে।

মানসসরোবর ও রাক্ষসতাল এতক্ষণে অদৃশ্য হয়ে গেছে। কৈলাস মাঝে মাঝে দেখা যায়। দেড়টার পবে অর্ধমৃত অবস্থায় 'রেজাং' নামক স্থানে এলাম। তাঁবু পড়ল। রান্নাদির আয়োজন হল। স্থানটি একটি

গিরিখাতের মধ্যে। চারদিকেই উচ্চ পর্বতমালা। একটি বড় ঝরনা কুলুকুলু করে বয়ে যাচ্ছে। সর্বত্র ঘিরে আছে একটা ভীতিপ্রদ নিস্তব্ধতা। তাঁবু পড়ার অল্পক্ষণ পরেই পেছনের পর্বতের বিপরীত দিক হতে মানুষের শিস্ দেওয়ার শব্দ শোনা গেল। তাড়াতাড়ি গাইড দুজন ঘোড়াওয়ালাকে ঐ শব্দ লক্ষ্য করে চুপি চুপি পাঠিয়ে দিয়ে ঘোড়াগুলিকে কাছাকাছি রাখবার নির্দেশ দিল।

রেজাং হতে থোকরমণ্ডি সাত-আট মাইল মাত্র। ইতঃপূর্বে ঐ মণ্ডিতে জামর-অভিযানের খবর পেয়েছিলাম। এ জনমানবশূন্য স্থানে তিব্বতীদের শিস্ দেবার শব্দ শুনে কীচখাম্পা শঙ্কিত হয়েছিল। আধ ঘণ্টা পরেই আমাদের লোক দুটি ফিরে এসে খবর দিল যে, পর্বতের পেছনেই একদল তিব্বতী ঘোড়া জব্বু প্রভৃতি চরাচ্ছে এবং তার কিছু নিম্নে পর্বতের তলদেশে কতকগুলি কাল তাঁবু। লোকজনও আছে। কীচখাম্পা মুখ ভার করে এসে বলল, "জামররাই খানিকদূরে তাঁবু ফেলেছে। খুব সাবধানে থাকতে হবে।" তখন প্রায় তিনটে। এসময় এগিয়ে কোন নিরাপদ স্থানে পৌঁছানও সম্ভবপর নয়।

তাঁবুতে তাঁবুতে জল্পনা-কল্পনা শুরু হল। অল্পক্ষণের মধ্যেই পার্শ্ববর্তী পর্বতগাত্র বেয়ে নেমে এল ভীষণাকৃতি তিনজন দুর্ধর্ষ তিব্বতী। তাদের হাতে কোন অস্ত্রশস্ত্র দেখা গেল না। অবশ্য তাদের প্রকাণ্ড ঢোলা আলখাল্লার মধ্যে সব সময়ই অস্ত্র লুক্কায়িত থাকে। গাইড একটু এগিয়ে গিয়ে নিজেদের তাঁবুর সামনে বসে ঐ লোকগুলির সঙ্গে কথা বলছিল। ওদের চেহারাটা একটু ভাল করে দেখবার জন্য আমি কমণ্ডলু নিয়ে গেলাম ঝরনার দিকে। গাইডদের তাঁবুর সামনে দিয়েই যাবার পথ। একটু দূরেই বসেছিল জামররা। আমার সর্বাঙ্গে গৈরিক পোশাক।

জল নিয়ে ফিরে তাঁবুতে বসে আছি। কারও মুখে কথাটি নেই। অল্পক্ষণ পরেই গাইড এসে বলল—"জামররা আপনার 'দর্শন'-প্রার্থী।" তাদের সঙ্গে কথাবার্তা যা যা হয়েছে তাও সংক্ষেপে বিবৃত করল। জামররা এসেই আমরা কে, কোথা থেকে এসেছি, দলে ক'জন লোক, কোথায় ফিরে যাব, কেন এসেছি, আগ্নেয়াস্ত্রাদি আছে কিনা, ঘোড়া কতগুলি—ইত্যাদি সব খবর খুঁটিয়ে জিজ্ঞাসা করেছে। তাদের পরিচয়েও বলেছে যে তারা জামর। চল্লিশ-পঞ্চাশ ঘর লোক একসঙ্গে রয়েছে। মাত্র আট-দশটি পরিবার এ পবতের বিপরীত দিকে এসেছে। দু-এক দিনের মধ্যেই দলের লোকেরা এসে জুটবে এবং একত্র হয়ে তারা যাবে গানিমা গণ্ডিতে।

আমি যখন তাঁবুর বাহিরে গিয়াছিলাম তখন বিশিষ্ট পোশাক দেখে তারা আমার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করেছিল। কীচথাম্প' বলেছিল—"ইনি একজন খুব বড় 'কাশীলামা', এঁর সিদ্ধাই ও শক্তি অসাধারণ। সঙ্গে যারা আছে সবই এঁর শিষ্য। এ লামা ইচ্ছা করলে মরা মানুষকে বাঁচাতে পারেন—আবার একটু ধূলোপড়া দিয়ে মানুষকে মেরেও ফেলতে পারেন। এঁর শক্তির কথা কি আর বলব?"

অমন সিদ্ধাইসম্পন্ন কাশীলামার কথা শুনেই জামররা একেবারে মুশ্‌ড়ে পড়ল। তিব্বতীমাত্রই লামাদের ভীষণ ভয় করে থাকে, বিশেষ সিদ্ধাই-সম্পন্ন লামাদের। জামরসর্দার তখন গাইডকে ধরে বসল, যে করেই হোক লামার কিছু চুল জোগাড় করে দিতে হবে। তার জন্য তারা অনেক টাকা দিতেও প্রস্তুত। কীচথাম্পা জানিয়েছিল—টাকার বিনিময়ে লামা যে চুল দেবেন তা তো মনে হয় না। তখন তারা লামার দর্শনের প্রার্থনা জানাল। তিব্বতীদের ধারণা—কোন বড় লামার চুলদাড়ি সঙ্গে রাখলে আধিব্যাধি সব কেটে যায়, এমন কি ভূতের ভয়ও থাকে না।

কীচথাম্পার নিকট সব শুনে নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করে জামররদের নিয়ে আসতে বলা হল। আমাদের তাঁবুর সামনে এসে তিনজনেই লম্বা জিভ্ বের করে এবং দুহাতের বৃদ্ধাঙ্গুলি দুটি নাড়তে নাড়তে হাঁটু গেড়ে মাথা নীচু করে বসেছে। (এ সবই আত্যন্তিক শ্রদ্ধাজ্ঞাপক) তাঁবুর ভেতরে তাদের আসতে ইঙ্গিত করলাম। সর্দার এল ঐভাবে জিভ বের করে হামাগুড়ি দিতে দিতে। কিন্তু বাকী দুজন ভেতরে আসতে সাহসী হল না। জিভ কেটে হাঁটু গেড়ে বসে রইল বাইরেই।

কীচথাম্পা দোভাষী। চুল দেবার প্রস্তাবে খুবই গম্ভীরভাবে বললাম —"লক্ষ টাকার বিনিময়েও একগাছি চুল দেওয়া হবে না।"

জামররা স্তম্ভিত। তাদের মুখ চোখ ভয়ে বিবর্ণ। নিজেদের মধ্যে নিম্ন স্বরে একটু পরামর্শ করে প্রসাদ পাবার প্রার্থনা জানাল। খানিকক্ষণ চুপ থেকে তাদের বললাম, "যদি তোমরা তিনটি-প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হও, তবে প্রসাদ দেওয়া যেতে পারে, নচেৎ তা-ও নয়। কখনও মিথ্যা কথা বলবে না, চুরি-ডাকাতি করবে না, জেনেশুনে অন্যের অনিষ্ট করবে না—এই তিন সর্ত।" শুনে জামররা মাথা নীচু করে বসে রইল। পরে নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করে স্বীকৃত হ'ল প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হতে। প্রতিজ্ঞাগুলি আবৃত্তি করে সকলেই নতশিরে প্রণাম করল। একটা পাত্রে কিছু পেস্তা বাদাম কিসমিস্ ও চুরমা তাদের দিলাম। সব জিনিসই একটু একটু খেয়ে প্রসাদ করে দেবার প্রার্থনা জানাতে, সব জিনিসই মুখে ঠেকিয়ে ঠেকিয়ে তাদের হাতে দিতে হল। একটু বস্ত্রও চাইল। সেই প্রসাদ ও একটুকরা গৈরিকবস্ত্র পেয়ে তারা নানাভাবে শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে চলে গেল।

জামররা তো চলে গেল। কীচথাম্পা আনন্দে অধীর হয়ে বললে—"আর

ভয়ের কোন কারণ নেই। আপনি ছিলেন বলে আজ আমরাও প্রাণে বেঁচে গেলাম। নইলে রাত্রে সব লুটে নিয়ে যেত—ঘোড়া খচ্চর সব। বাধা দিলে আর রক্ষা ছিল না। তারা আমাদের আক্রমণ করার পূর্বে পাহাড়ের বিভিন্ন স্থান থেকে তাঁবু লক্ষ্য করে গুলি চালিয়ে সব তচ্‌নচ্ করে দিত। জামররা কী ভীষণ ডাকাত! তাদের গুলির সন্ধান অব্যর্থ।"

জামরদের সঙ্গে যে প্রহসনের অভিনয় করতে হয়েছিল তা নিয়ে আমাদের তাঁবুর সকলেই খুব আমোদ করতে লাগলেন। এই অসামঞ্জস্য-পূর্ণ আচরণের জন্য আমার মনে অনুশোচনা এসেছিল, অথচ না করেও উপায় ছিল না। নইলে ঐ ডাকাতদের হাতে হয়তো অনেকেরই প্রাণ যেত। অবশ্য ঐ প্রকার প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়ে জামরদের জীবনে যদি একটা নৈতিক পরিবর্তন আসে, তা হলে আমার ঐ আচরণের কতকটা সার্থকতা আছে, এই ভেবে কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত হলাম।

ক্রমে সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে এল। নীরব নিঝুম রাত্রিটি নিরাপদে কেটে গেছে। ভোরবেলায় আবছায়া অন্ধকারের মধ্যেই তাঁবু গুটিয়ে পালাবার আয়োজন করছি, এমন সময় জামরসর্দার এক ভাঁড় দুধ নিয়ে হাজির। চামরী-গাইয়ের দুধ। আজ সে এসেছে একা—স্বচ্ছন্দ ও সহজ গতিতে স্মিতমুখে। গতকালের সেই ক্রূর বক্র দৃষ্টি নেই। মানুষের কাছে মানুষ যে ভাবে আসে তেমনি ভাবে সে এসেছে। তার পরিবর্তন দেখে অবাক হয়ে গেলাম। দুধ রেখে হাঁটু গেড়ে বলল—"খুব ভোরবেলা টাটকা দুধ দুয়ে এনেছি। আর খানিকটা মাখন।" আহা! এ যে অতি আপনজনের মতন কথা! প্রাণের ভেতরটায় একটা দোলা দিয়ে উঠল। দুধ বা অন্য কোন জিনিসেরই আমাদের প্রয়োজন ছিল না, বিশেষ তখন রওনা হচ্ছি। কিন্তু কীচখাম্পা বলল—"দুধ না নিলে খুবই

দুঃখিত হবে। রেগেও যেতে পারে।" সর্দারের হাত থেকে দুধের ভাঁড়টি নিয়ে শ্রীভগবানকে ঐ দুধ নিবেদন করলাম। দু-এক ছিটা মুখে দিয়ে বললাম, "এ দুধপ্রসাদ নিয়ে যাও। সকলে ভাগ করে খেও।" সর্দারের মুখে চোখে আনন্দ ফুটে উঠেছে। বলল, "কালকের প্রসাদও সকলকে দিয়েছি। আর খানিকটা প্রসাদ ঐ গেরুয়াবস্ত্রের পুঁটলি করে জলে ডুবিয়ে, সেই জল গরু ঘোড়া ছাগল ভেড়ার উপর ছিটিয়ে দিয়েছি। খানিকটা প্রসাদ রেখেও দিয়েছি, সঙ্গীরা এলে তাদের দেব।"

যতক্ষণ কথাবার্তা হচ্ছিল জামরসর্দার নতজানু হয়ে রয়েছে। আমি তার মুখে ও মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করে, শুভেচ্ছাদি জানিয়ে রওনা হলাম। লোকটি একেবারে অভিভূত হয়ে গিয়েছিল। জিঘাংসার স্থানে আজ তার মুখে চোখে ফুটে উঠেছে স্নিগ্ধ কমনীয়তা। এ পরিবর্তন আমার হৃদয় আলোড়িত করে দিল। যেতে যেতে সেও ফিরে তাকাচ্ছিল। অল্পক্ষণের মধ্যেই সে চলে গেল দৃষ্টিসীমার বাইরে। সে তো গেল; কিন্তু তার অজ্ঞাতসারে আমার মন ছুটে চলেছে তার সঙ্গে। . . .

গিরিখাত হতে বেরিয়ে ক্রমে এগিয়ে চলেছি গুরলামান্ধাতার ধারে ধারে। আজকের পড়াউ চৌদ্দ মাইল অর্থাৎ অনেকটা দূর। বরবুতে যেতে হবে। ভোরের দিকে বেশ কন্‌কনে ঠাণ্ডা। হাত-পা অসাড় হয়ে যাচ্ছিল। প্রায় ঘণ্টা দেড়ের চড়াই করে করে এক পর্বতের সানুদেশ হতে দেখা গেল কৈলাসের হিমানীমণ্ডিত চূড়াটি। স্থানের নাম 'থালাচুং'। কীচখাম্পা বললে, "এর পরে কৈলাস আর দেখা যাবে না। যাত্রীরা এখানেই কৈলাসপতির উদ্দেশ্যে মানত করে।"

ক্রমে সঙ্গীরা সকলে এলেন। তদগতচিত্তে অনেকক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে রইলাম সেই স্থানে। এবার ধীরে ধীরে প্রত্যাবর্তনের পালা। প্রাণ

কেঁদে উঠল। সে মহিমোজ্জ্বল নয়নাভিরাম রূপ আর যে দেখতে পাব না! অশেষ কষ্ট ও অপরিসীম দুঃখের মধ্যেও আমাদের দিনগুলি কী আনন্দ-পরিপূর্ণতার ভিতর দিয়েই কাটছিল!

শূণ্য প্রাণে চলেছি। আজ চড়াই-উৎরাই তেমন নেই। পথ খুব বন্ধুর ও প্রস্তরসমাকীর্ণ। আঘাতে আঘাতে পা-দুটি জর্জরিত—শরীর অবসন্ন। ঘোড়াগুলি আর মোটেই চলতে পারছে না।

ক্রমে পাওয়া গেল 'গুরলা-চু'। শুষ্কপ্রায় একটি ছোট নদী। গুরলা মান্ধাতার হিমবাহ হতে নেমে এসেছে! নদীখাতের ভিতর দিয়ে অনেকটা চলতে হল। গুরলার দৃশ্য অতীব মনোরম। পথে দু-তিন দল তিব্বতীর সঙ্গে দেখা—লোমবিহীন অনেকগুলি ভেড়া ছাগল নিয়ে যাচ্ছে। তাকলা-কোট মণ্ডিতে পশম বিক্রি করে ফিরছে। সকলের মুখে একই প্রশ্ন—"জামররা কোথায়?" ধন্য জামর!

ক্রমে গরমও বাড়ছে। অনুর্বর ধূসর মালভূমির উপর দিয়ে চলেছি। সবুজের চিহ্নমাত্র কোথাও নেই! বালি উড়িয়ে প্রচণ্ড ঝড় বয়ে যাচ্ছে বিপরীত দিক থেকে। চোখ বুজে কোনরকমে চলেছি এগিয়ে। দু'টো নাগাত 'বরবু'তে এক ঝরনার ধারে তাঁবু পড়ল; প্রচুর জল, প্রচুর ঘাস। ঘোড়াগুলির আনন্দ দেখবার মতন। নিকটেই কয়েকঘর তিব্বতীর বাস। লোকজন দেখতে পেলাম। আজ জলযোগের উপর দিয়ে চালিয়ে নেওয়া গেল। অনেককাল ঠিকঠিক স্নান করা হয় নি। গায়ে, জামাকাপড়ে দুর্গন্ধ হয়েছে—মুখে ফাটল ধরেছে—হাতগুলি বিবর্ণ, ঝলসে-কালো হয়ে গেছে। পিসু ও জুয়াপোকা কামড়ে অস্থির করে দিনরাত সব সময়ই। আজ সকলেই স্নান ও পরিচ্ছন্নতার দিকে মন দিলেন—শরীরের উপর দৃষ্টি পড়েছে এতকাল পরে।

বরবুতে একদল কৈলাসযাত্রীর সঙ্গে দেখা হল। দু'জন উত্তর প্রদেশের লোক, একজন সন্ন্যাসী, একজন বাঙ্গালী—কলিকাতা-ভবানীপুরে বাড়ী, আর তিনজন ভুটিয়া। সকলেই চলেছেন ঘোড়ায়। যাত্রা সম্বন্ধে অনেক কিছু জিজ্ঞাসা করলেন। এরই মধ্যে তাঁদের মতান্তর মনান্তরে পরিণত হয়েছে—একে অন্যের সঙ্গে মুখ ঘুরিয়ে কথা বলেন। আমাদের সামনেই আলাপ-আলোচনার সময় পরস্পরের মধ্যে অসংযত ভাষার ব্যবহার দেখে মর্মাহত হলাম। হাসিও পাচ্ছিল, আবার দুঃখও হচ্ছিল তাঁদের অবস্থা দেখে। এই মানসিক অবস্থা নিয়েই তো চলেছেন তীর্থপতির চরণতলে! কৈলাস-তীর্থযাত্রার দুর্যোগ-দুর্গম সুদীর্ঘ পথে চিত্তের প্রশান্তি অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য চাই অসীম ধৈর্য ও শ্রীভগবানে অটুট বিশ্বাস। নইলে দ্বন্দ্ববিক্ষত ও দোষমলিন মন নিয়ে দেবতার সামনে দাঁড়ালে সেই মনে দেবত্বের মহিমা সম্যক্ প্রতিভাত হওয়া সম্ভবপর নয়। সার হয় শ্রমজর্জরিত বিকল দেহ ও নৈরাশ্যপ্রপীড়িত কুরূপ মন নিয়ে ফিরে আসা মাত্র।

বরবুতে যে তিব্বতীরা রয়েছে তাদের ছেলে-মেয়েদের ডেকে ছাতুগুড় দিতেই তারা ভারি খুশী। সহযাত্রী দিলেন লজেন্স। চুষে চুষে খেয়ে দেখিয়ে দিতে হল কি করে খেতে হয়। আনন্দে নৃত্য করতে করতে খাচ্ছে—দেখেও তৃপ্তি! সন্ধ্যায় তিব্বতীদের কাছে দুধ পেয়ে অনেককাল পরে টাট্‌কা দুধের চা খাওয়া গেল। রাত্রে আরামের নিদ্রা।

সকালবেলা আবার নেমে এলাম পথে। আজ তাকলাকোটে কে কার আগে পৌঁছবে তাই নিয়ে রীতিমত প্রতিযোগিতা। পথ অনেকটা সমতল। ঘোড়াগুলিও যেন বুঝতে পেরেছে; তারাও বেশ চলছে। কয়েক মাইল আসার পরেই লোকজনের সঙ্গে দেখা হলো—এখানে সেখানে দু-একটা বাড়ী। কর্ণালীর ধারে ধারে চলেছি। ক্রমে 'সবুজ'

দেখে চোখ জুড়িয়ে গেল। গ্রামবাসীরা যব মটর সরষে শাকসবজী করেছে। কর্ণালীর ধার বেশ উর্বর।

হঠাৎ পথে দেখা হল একজন সাধু-যাত্রীর সঙ্গে—কম্বল কাঁধে কৈলাস-যাত্রায় বেরিয়েছেন। 'ওঁ নমো নারায়ণায়' অভিবাদন জানালাম। সাধুটি জিজ্ঞাসা করলেন—"শীত কেমন? বরফ আছে কি?" ইত্যাদি অনেক প্রশ্ন। যথাযথ জবাব দিয়ে এগিয়ে চলেছি। আর একজন সন্ন্যাসি-যাত্রীর সঙ্গেও দেখা হল। 'কৈলাসপতিকী জয়'-ধ্বনি করে স্বাগত করলাম। দু-চার কথার পরে সাধুটি পাথেয় চাইলেন, কিছু দিলাম। এ দু'জন সাধুর ভবিষ্যৎ কষ্টের ছবি কল্পনায় চোখের উপর ভেসে উঠতেই প্রাণটা কেঁদে উঠল। হয়তো এঁরা আর ফিরে আসবেন না। এ পথে প্রতি-বৎসরই এমনটি হয়। অনেকে অকালে প্রাণ হারায়। কেউ ফিরে আসে অকর্মণ্য হয়ে, কেউবা 'থালা দুং' থেকেই দর্শন করে ফিরে আসতে বাধ্য হয়। সেই চির দুর্লভের পদতল-স্পর্শের পথে পদে পদে আছে কত দুঃখ দুর্যোগ মহাকষ্ট যাতনা অকালমৃত্যু। কেদার-বদরী বা হিমালয়ের অন্যান্য কঠিন তীর্থের দুর্গমত্বের সঙ্গে কৈলাসযাত্রার কষ্টের তুলনা না করাই ভাল।

বারটা নাগাত তাকলাকোটে পৌঁছে দেখা গেল তারাপ্রসন্ন বাবুই প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করেছেন। তিনি গাইডকে সঙ্গে করে ঘণ্টাখানেক পূর্বেই এসে আমাদের পূর্বপরিচিত সেই ছাদহীন ঘরটিতে আশ্রয় নিয়েছেন। এখানে লোকজনের মুখ দেখতে পাওয়া গেল। মনে হল আমরাও এ জগতেরই লোক—আমরাও এদেরই একজন। তাকলা-কোট ছেড়ে অবধি প্রতিপদে বুঝতে পারছিলাম যে, একটা আজব দেশে এসেছি। লোকজন কচিৎ দেখা যেত, অথচ সারাটি পথেই ছড়িয়ে রয়েছে চোর-ডাকাতের ভয়।

আহারের পর নিশ্চিন্তমনে নিদ্রা। বৈকালে তাকলাকোট. মণ্ডি (বাজার) ঘুরে দেখলাম। ছোটখাট একটি শহরে পরিণত হয়ে গেছে। ভুটিয়া-ব্যবসায়ীদের অনেক দোকান সভ্যতার সাজসরঞ্জামে পরিপূর্ণ। এনামেল-এলুমিনিয়াম-এর বাসন, সুগন্ধি সাবান-তৈল স্নো, রেশমী চুড়ি, সেফ্‌টি-রেজার, টর্চলাইট, গগল্‌স্, টেলকাম পাউডার, সিল্ক ও পশমী পোশাক, নানারকমের কাপড়, বাটার জুতা, হ্যাট-টাই—কিছুরই অভাব নেই। তিব্বতীরা ঘুরে খুরে নেড়ে চেড়ে সব দেখছে অবাক্ দৃষ্টিতে—কিছু কিছু কিনছেও। অনেক তিব্বতী শত শত ভেড়া ছাগল নিয়ে এসেছে। বড় বড় কাঁচি দিয়ে পশম-ছাটাই হচ্ছে। কেনাবেচা-দেনাপাওনার কোলাহল। এ মণ্ডিতে প্রতিবৎসর প্রায় লক্ষ টাকার কারবার হয়ে থাকে নেপালী ভুটিয়া ও তিব্বতীদের মধ্যে। অধিকাংশ কারবারই হয় জিনিসের আদান-প্রদানে।

কর্ণালীর ধারে ঘুরে বেড়াচ্ছি। চারিদিকে সৌন্দর্যের অপূর্ব প্রকাশ। অস্তগামী সূর্যরেখায় অনুরঞ্জিত পর্বতমালা। প্রকৃতিদেবীর সান্ধ্য প্রসাধন-পারিপাট্য অতীব মনোহর। গুরলামান্ধাতার উপর দিয়ে ভেসে চলেছে বকের পালকের মতন সাদা ছোট ছোট মেঘখণ্ড। লিপুলেক গিরিবর্ত্মও রক্তিম হয়ে উঠেছে। সূর্যাংশু যেন দেবীর সীমন্তসীমায় মঙ্গলসিন্দুরবিন্দু! ক্রমে তামসী নিশা ধরণীর বুকে একখানি ঘন যবনিকা টেনে দিল। 'নবনীল নভস্তল' ছেয়ে গেল তারায় তারায়।

আমরা কৈলাসের হিম-জর্জর শীত সয়ে এসেছি—গৌরীকুণ্ডে বরফ ভেঙে স্নান করাও সম্ভব হয়েছে—এখন তাকলাকোটের ঠাণ্ডা তো আরামদায়ক! রাতটি বেশ কাটল। বসন্তের স্পর্শে একদিনেই শরীর-

মন যেন সঞ্জীবিত হয়ে উঠেছে। বিশেষ গত কয়েকদিন ডাকাতের ভয় সকলকে জ্যান্তেমরা করে ফেলেছিল।

সকালে তাড়াতাড়ি শিবলিং-গুম্ফা দেখবার জন্য তৈরী হয়েছি। যাবার সময় ঐ গুম্ফা দেখা হয় নি। পশ্চিম তিব্বতের মধ্যে উহা সর্বাপেক্ষা বড় মঠ। প্রথমেই চড়াই। তিনশত ফুটের বেশী উঠতে হল। গুম্ফাটি যেন একটি প্রকাণ্ড দুর্গ—এক পাহাড়ের উপরিভাগে বেশ সুরক্ষিত স্থানে অবস্থিত। গুম্ফার সমৃদ্ধি এবং আভিজাত্যও নেহাৎ কম নয়। প্রথমেই প্রস্তর-নির্মিত প্রকাণ্ড তোরণ। একটু নূতন ঢং-এর ভাস্কর্য। ফটক পেরুতেই দু'জন মঠবাসী মন্দিরের দিকে নিয়ে গেল। বেদীর উপর ভগবান তথাগতের শান্ত সৌম্য প্রকাণ্ড ধ্যানমূর্তি—কাঠের তৈরী সোনার জলে রং করা—ছয় সাত ফুট উঁচু। সম্মুখে স্তরে স্তরে প্রজ্বলিত মাখনের প্রদীপ, বিভিন্ন পাত্রে পিষ্টকের মতন ভোগ রক্ষিত। বেদীর নিম্নস্তরে বিভিন্ন দেবদেবীর ছোট ছোট ধাতব মূর্তি। দেয়ালে ও পার্শ্বে নানা-প্রকারের বাদ্যযন্ত্র। তন্মধ্যে ডমরু শঙ্খ কাঁসর ঘণ্টা দামামা বাঁশী বজ্র শিঙ্গা ভেরী, ভিতরে ছিদ্রযুক্ত মানুষের হাড় (বাদ্যযন্ত্র বিশেষ) প্রায় আমাদের পরিচিত। মানুষের মাথার অনেকগুলি খুলি ও হাড় পূজোপ-করণরূপে রক্ষিত। বিশেষ দিনে ও পুণ্য তিথিতে উৎসবাদিতে ঐ সকল পূজোপকরণ ব্যবহৃত হয়। মন্দিরের ভীতিপ্রদ নিস্তব্ধতা বিশেষ-ভাবে লক্ষ্য করার মতন।

প্রকাণ্ড মন্দির। একসঙ্গে তিন-চার শত লোকের সংকুলান হতে পারে। মন্দিরই উপাসনাগার, ধর্মোপদেশের স্থান ও বিচারালয়রূপে ব্যবহৃত হয়। মন্দিরের একপার্শ্বে পালিভাষায় লেখা স্তূপীকৃত অনেক পুঁথি। প্রদর্শক ডাবা বললে যে, ঐ পুঁথির সংখ্যা তিন হাজারের

অধিক এবং সবই ধর্মগ্রন্থ। অনেক দুষ্প্রাপ্য পুঁথিও নাকি আছে। অল্প-বয়স্ক অনেক কৌতূহলী বিদ্যার্থী ডাবা আমাদের সঙ্গে সঙ্গে চলেছে। জানা 'গল ঐ গুম্ফাবাসীর সংখ্যা প্রায় আড়াই শত, তন্মধ্যে লামা মাত্র দু'জন আর সকলেই (লামাবেশধারী) ডাবা।

এ গুম্ফার লামা দু'জনের মধ্যে একজন গুরুলামা। তিনিই আচার্য ও উপদেষ্টা, অন্যজন 'বর্ষাতি লামা' অর্থাৎ তাঁর ইঙ্গিতে বর্ষা বন্ধ হয়ে যায়। জনশ্রুতি—ঐ লামা নাকি অতিবৃষ্টির সময় বৃষ্টি বন্ধ ও অনাবৃষ্টির সময় বর্ষা আনয়ন করতে সক্ষম। তাঁর অঙ্গুলিসংকেতে নাকি সব কিছু হয়ে যায়! জনসাধারণের উপর লামাদের প্রতাপ অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য প্রত্যেক বড় বড় মঠেই ঐ প্রকার অদ্ভুতসিদ্ধাইসম্পন্ন লামা বাস করেন।

লামাদের সঙ্গে দেখা করার অভিপ্রায় জানাতে, আমরা প্রথম নীত হলাম 'বর্ষাতি লামার' কাছে। দোতলার উপর একটি অপ্রশস্ত ক্ষীণ আলোকযুক্ত প্রকোষ্ঠে একজন বৃদ্ধ লামা নিজ আসনে বসে আছেন। বয়স সত্তরের কাছাকাছি মনে হল। কৃচ্ছ্রসাধনায় শরীর ক্ষীণ, কিন্তু মুখমণ্ডল প্রদীপ্ত। সামনে গিয়ে অভিনন্দন জানাতেই লামা সাগ্রহে আমাদের বসতে বললেন। তিব্বতে আসার কারণ, কোথা থেকে এসেছি, কতদিন থাকা হবে ইত্যাদি অনেক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলেন। কৈলাস-যাত্রা নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয়েছে জেনে খুবই আনন্দিত হয়ে শ্রীভগবানকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানালেন। মানসসরোবর-পরিক্রমা করা হয় নি শুনে বললেন—ভালই হয়েছে আর একবার আসতে হবে।

কথাবলার সময় লক্ষ্য করছিলাম যে, লামা মধ্যে মধ্যে চোখ বুজে চুপ হয়ে যাচ্ছেন—যেন মনঃসংযম করছেন। এ লামাকে দেখে মনে হল কঠোরসাধনসম্পন্ন ও সংযতজীবন। অতীন্দ্রিয় তত্ত্বের কিছুটা সন্ধান

পেয়েছেন নিশ্চয়। ঘরে আসবাব কিছুই নেই, মেজেতে কম্বলশয্যা, গায়ে সামান্যমাত্র আবরণ। তান্ত্রিক সাধনা সম্বন্ধে কিছু জিজ্ঞাসা করার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু দোভাষী সব গোলমাল করে দিল।

এবার আমাদের নিয়ে যাওয়া হল গুরুলামার দর্শনে। জানা গেল, ইনি এ পদে নিযুক্ত হয়ে সম্প্রতি লাসার প্রধান মঠ হতে এসেছেন। প্রতীক্ষাকক্ষে একটু দাঁড়াবার পরেই ডাক পড়ল! বেশ হাসিহাসি মুখ, সুন্দর ও সপ্রতিভ চেহারা, বয়স চল্লিশের মতন। বেশ জাঁক করে মোহন্তের গদীতে বসে আছেন। পাশেই একটি ছোট আঙ্গেটি, গন্‌গন্‌ করে আগুন জ্বলছে। গায়ে মসৃণ খয়ের রং-এর পশমের সুন্দর পোশাক। আশপাশের আসরের পারিপাট্যও বেশ। রূপার চা-পাত্র ও পেয়ালা প্রভৃতি। পশ্চাতে মখমলে মোড়া প্রকাণ্ড তাকিয়া, কোলের উপর ছোট একটি 'ল্যাপ্‌ডগ্‌'। পাশেই শয়নকক্ষ। পরিচ্ছন্ন বিছানাপত্র। দরজা-জানালায় কারুকার্যময় সুন্দর পরদা।

আমরা যখন লামার ঘরে প্রবেশ করেছি, তখন বোধ হয় শাস্ত্রপাঠাদি হচ্ছিল। লামার পাশে নিয়ে আর একজন লামাবেশধারী এক প্রকাণ্ড পুঁথি খুলে বসেছিলেন। নমস্কার ও অভিবাদনের পরে লামা অনেক কথা জিজ্ঞাসা করলেন। আমরা দাঁড়িয়েই ছিলাম। তিনি আমাদের বসতে বলেন নি। ভাল দোভাষীর অভাবে কোন প্রশ্নেরই সন্তোষজনক জবাব শোনা সম্ভব হল না।

তিব্বতীরা বুদ্ধদেবকে 'শাক্যথুবা' বলে থাকে। গুরুলামার সঙ্গে আলাপাদিতে মনে হল যে, তথাগত-প্রদর্শিত নির্বাণের মার্গ তাঁরা ঠিক ঠিক ভাবে অনুসরণ করেন না এবং 'নির্বাণ' সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণাও তাঁদের নেই। গুরুপূজা ও দেবদেবীর উপাসনার উপরই লামা খুব বেশী জোর দিলেন। সুন্দর বললেন, "ভগবানের নানাভাবে উপাসনা, গুরুপূজা বা জপতপ কঠোরতা যা কিছুই করিনে কেন, মনের ময়লা না ধুয়ে গেলে

কিছুতেই কিছু হবে না। আর গুরুকৃপা ছাড়া মনের ময়লাও সাফ হবার জো নেই। ভগবানের সব আধ্যাত্মিক শক্তি গুরুর ভিতর দিয়েই মানুষ পেতে পারে। ভগবচ্ছক্তি-লাভের অন্য কোন উপায় নেই।"

গুরুলামার নিকট বিদায় নিয়ে গুম্ফার চারদিক প্রদক্ষিণ করার মতন সব ঘুরে দেখলাম। খুবই পুরাতন মঠ বলে মনে হল। মঠবাড়ীর সন্নিকটেই ও-অঞ্চলের শাসনকর্তা 'জংপান'-এর দুর্গ। বিচারালয়, জেলখানা সবই ঐ দুর্গের ভিতর। দেখতে ইচ্ছা হল না।

বর্তমানে তিব্বতের লামাদের হস্তে রাজশক্তি ও জমিদারী প্রভৃতি রক্ষণাবেক্ষণের ভার ন্যস্ত থাকার দরুন অনেক লামাকেই রাজকার্য ও অন্যান্য বৈষয়িক ব্যাপারে লিপ্ত থাকতে হয়। ফলে তাঁদের ভিতর প্রকৃত আধ্যাত্মিক জীবনের স্ফূর্তি ও পরিপূর্ণতা-লাভ সম্ভবপর নয়। ক্ষমতাপ্রিয়তা, রাজনীতি, রাজদণ্ড, বিষয়সম্পত্তি-রক্ষণাবেক্ষণ প্রভৃতি কার্য উচ্চ আধ্যাত্মিক জীবনের পরিপন্থী সন্দেহ নেই।

শিবলিং-গুম্ফার প্রকাণ্ড জমিদারী ও বড় ব্যবসায়। স্থানীয় লোকদের ধারণা ওখানে বার বৎসরের রসদ মজুত থাকে। মঠের যাবতীয় কাজকর্ম ও বৈষয়িক ব্যাপার গুরুলামার নির্দেশে বয়স্ক ডাবাদের দ্বারা পরিচালিত হয়—ব্যবসায়-বাণিজ্য জমিদারী-চালান সবই। অনেক ডাবা ব্যবসায়ের লভ্যাংশের বখরাও পেয়ে থাকে। ব্রহ্মদেশের ন্যায় তিব্বতেও শিক্ষাকার্যের ভার লামাদের উপরই ন্যস্ত এবং প্রত্যেক মঠই একটি শিক্ষালয়। বিদ্যার্থীদের শিক্ষা ও ভরণপোষণের যাবতীয় ব্যয়ভার গুম্ফাই বহন করে থাকে। বিশেষতঃ শুনেছি যে পশ্চিম তিব্বতে গুম্ফা ছাড়া পৃথক বিদ্যালয় একটিও নেই। পূর্ব তিব্বতেও অনেকটা ঐ ব্যবস্থা।

যাবতীয় কষ্টসাধ্য কাজ করবার জন্য প্রায় সকল গুম্ফায়ই চাকর-

চাকরাণী নিযুক্ত আছে এবং তারা পরিজনবর্গ নিয়ে গুম্ফাতেই বাস করে। সেজন্য সাধারণ যাত্রী বা দর্শকগণ মঠে স্ত্রীলোক দেখে মনে করে যে, তারা ভিক্ষুণী এবং চাকরাণীদের কোলে শিশুসন্তানকে দেখে 'ভিক্ষু'-জীবন সম্বন্ধে একটা কুৎসিত ধারণা পোষণ ও প্রকাশ করে। আমরা যতদূর জেনেছি তাতে মনে হল, মঠজীবন সংযত ও কঠোর। অন্ততঃ এ আদর্শ অনুসরণ করে চলার চেষ্টার ত্রুটি নেই। কোন গুম্ফাবাসী নৈতিক-চরিত্রভ্রষ্ট বা আদর্শচ্যুত হলে মন্দিরেই সর্বসমক্ষে তার বিচার হয়। আচার্য লামা বিচারা[illegible] অপরাধীর বিরুদ্ধে সকল অভিযোগ সর্বসমক্ষে প্রকাশ করেন এবং অপরাধীকে স্বপক্ষ-সমর্থনের সুযোগ দিয়ে বিচারের ভার গুম্ফাবাসীদের উপর ন্যস্ত করেন। ঐ বিচারের ফল অনেক সময়েই অতীব নির্মম ও কঠোর হ[illegible] থাকে। আমবা ইতঃপূর্বে শুনেছিলাম যে, পূর্ব বৎসর খোচরনাথ-গুম্ফার জনৈক চরিত্রভ্রষ্ট ডাবাকে উলঙ্গ করে জ্বলন্ত লৌহের ছাপ দিয়ে তাড়িয়ে দেওযা হয়েছে। দু'বৎসর পূর্বে শিবলিং-গুম্ফার জনৈক ডাবাকে বিশেষ কারণে লামার পোশাক খুলে নিযে দু'কান কেটে সর্বসমক্ষে বেত্রাঘাত করতে করতে বের করে দেওয়া হয়েছিল।

ডাবাদের থাকবার ঘর প্রভৃতি ঘু'র ঘুরে দেখলাম। শীতপ্রধান স্থান এবং জলাভাববশতঃ সর্বত্রই পরিচ্ছন্নতার বিশেষ অভাব। বাড়ীগুলি সবই পাথরেব তৈবী। প্রত্যেক প্রকোষ্ঠে দু'তিন জন করে থাকার ব্যবস্থা। বালক-বিদ্যার্থী ডাবাদের জন্য অন্য বন্দোবস্ত।

পশ্চিম তিব্বতে যে যে স্থানে গুম্ফা আছে তন্মধ্যে তাকলাকোটই অপেক্ষাকৃত কম ঠাণ্ডা। সেজন্য শীতের পাঁচ-ছয় মাস এ গুম্ফাতে চার-পাঁচ শত লামা ও ডাবা সমবেত হয়। আহারাদির ব্যবস্থা এই মঠকর্তৃপক্ষই করে থাকেন।

প্রত্যাবর্তন

বাসস্থানে ফিরে আসার পরেই গাইড তাড়া দিচ্ছিল। রওনা হতে হবে। এখন তাদের 'ঘরমুখো' মন। দুপুরের রোদেই বেরিয়ে পড়তে হল—যদিও ছ'মাইল মাত্র গিয়ে 'পালাতেই' রাত্রিযাপন। তাকলাকোটে তিব্বতী ঘোড়াওয়ালাদের পরিবর্তে নূতন ঘোড়া নেবার কথা, কিন্তু তিব্বতীরা আমাদের ছাড়তে চাচ্ছে না। রিং-বু মুখ নীচু করে দাঁড়িয়ে আছে। গাইড বললে—"তারা যেতে চায় গার্বিয়াং পর্যন্ত।" তারাই চলল সঙ্গে।

পথের পাশে শ্যামল শস্যক্ষেত্র। মাঠে মাঠে লোকজন চাষের কাজে রত। ঘণ্টাখানেক পরেই এক পসলা বৃষ্টি—ভিজিয়ে দিয়ে চলে গেল। আমরা গ্রাহ্য করি নে, ও সব গা-সওয়া হয়ে গেছে। ভিজে ভিজেই চলেছি। অনেকদূর' থেকে শিবলিং-গুম্ফা ও গুরলার ঢেউখেলান হিমানী-মণ্ডিত কিরীট দেখা যাচ্ছিল। বিদায়—সব কিছুকেই বিদায়।

চারটা নাগাত পালাতে তাঁবু ফেলা হল। দু-তিনটি ধর্মশালাও এখানে আছে, কিন্তু সবগুলিই ভুটিয়া-ব্যবসায়ীদের পণ্যদ্রব্যে বোঝাই। পালা লিপুর পাদদেশে—পাঁচ-ছয় মাইল মাত্র। আজই তিব্বতে আমাদেব শেষ দিন। কাল সকালে লিপু অতিক্রম করে হিমালয়ের ভিতর গিযে পড়ব।

ভোরের দুর্জয় শীতে কাঁপতে কাঁপতে বেরিয়ে পড়েছি। আকাশ মেঘমলিন—প্রভাত কি প্রদোষ ঠিক বোঝা যায় না। লিপুতে তুষারাক্রান্ত না হলেই বাঁচি! ক্রমে আরম্ভ হল চড়াই। লিপুর চড়াইটা কোন

রকমে অতিক্রম করতে পারলেই রক্ষা। এগুতে লাগলাম; অনেক ভুটিয়ার সঙ্গে দেখা হল। ঘোড়া ছাগল ভেড়া নিয়ে চলেছে তিব্বতের বিভিন্ন মণ্ডিতে। এখন লিপুর আর সে পরিচ্ছন্ন শোভা নেই। বরফ গলে গিয়ে অনেক স্থলেই নগ্নপাথর বেরিয়ে পড়েছে। এতো লিপু নয়! এ যেন নিরাভরণ লিপুর কঙ্কাল। শেষের দিকটা কঠিন চড়াই। পাহাড়ের দেয়াল আঁকড়ে ধরে ধরে কোনপ্রকারে উঠছিলাম; বর্ষণোন্মুখ মেঘের ফাঁকে ফাঁকে সূর্যালোক—আশার আলোকের মতন প্রাণে এনে দিচ্ছিল অনুপ্রেরণা। . :প্রকারে টেন-হিঁচড়ে হাঁপাতে হাঁপাতে উঠা গেল লিপুর শীর্ষস্থানে। 'তিব্বত-ফেরৎ' বলে ঠাণ্ডা খুব তীব্র বোধ হয় নি। ক্রমে মেঘনির্মুক্ত আকাশে হেসে উঠল সূর্যকিরণ। লিপুর উপর দাঁড়িয়ে চারিদিক দেখলাম। সেই অপরূপ গুরলামান্ধাতা—কুহেলিকাময় তিব্বত! লিপুর উপর বরফ খুব বেশী ছিল না; সহযাত্রীদের সঙ্গে সমস্বরে কৈলাস-পতির জয়ধ্বনি দিলাম। দেবদেবের চরণে প্রাণের শ্রদ্ধাঞ্জলি ও কৃতজ্ঞতা নিবেদন করে এবার হিমালয়ের দিকে নামতে আরম্ভ করেছি। এখন খাড়া-উৎরাই। পথ অতীব সংকীর্ণ ও প্রস্তরময়। যাবার সময় . ই ছিল বরফাচ্ছাদিত—পথের ঠিক চেহারাটা দেখতে পাই নি। এ পথে নিজের ইচ্ছামত চলবার জো নেই—পথই চালিত করে পথচারীকে। কেউ যেন পেছন থেকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিচ্ছে! খুব সামলে চলতে হয়। ক্রমে তিন মাইল পথ নেমে এসেছি সাংচুং-এ। একটু বিশ্রাম নিয়েই পুনরায় পথচলা। আরও প্রায় সাত মাইল পরে কালাপানিতে তাঁবু পড়বে।

একটা নাগাত আসা গেল—কালাপানিতে। চারিদিকেই পর্বতের আবেষ্টনী আর শ্যামল বনানী। বনানীর শোভা .মরা ভুলেই গিয়ে-

ছিলাম। স্থানটি চমৎকার। সন্ধ্যার পরে কুলিশগর্জন-মুখরিত বৃষ্টি আর দারুণ ঝড়। হিমালয়ে চলেছে শ্রাবণের ধারা। রাতটা কোনরকমে কাটল। বরফের রাজ্য অতিক্রম করে যেতে এখনও কয়েক দিন দেরী আছে।

২রা শ্রাবণ, মঙ্গলবার। কোনপ্রকারে গড়াতে গড়াতে আর এগারটি মাইল যেতে পারলেই গার্বিয়াং। কয়েকদিন বিশ্রাম নেওয়া যাবে। নদীর ধারে ধারে চলেছি। অরণ্য আর নিস্তব্ধতা। চারিদিকেই ঘন-শ্যামল বনানী—দেওদার-বন। দিকে দিকে প্রসারিত হয়েছে হিমালয়ের ধ্যানগম্ভীর পরিবেষ্টনী। কালীর তীরে তীরে স্নিগ্ধ রৌদ্রোজ্জল শস্যক্ষেত্র—মাঝে মাঝে মাটির ছাদবিশিষ্ট পাহাড়ীদের দরিদ্র কুটির। অত্যধিক বর্ষার দরুন পথ অতীব বন্ধুর। জলপ্রপাতগুলি হুহু শব্দে নেমে আসছে। পাহাড় অনেক স্থানে ধসে পড়েছে। পথের উপর দিয়ে বয়ে চলেছে জলস্রোত। নগ্ন পাথরগুলি ঝুলছে নিরালম্ব হযে। দেখলেই ভয় হয়—কখন চাপা দেয়! ওদিকে তাকাই নে। সামনের দিকে চোখ চেয়ে চলি।

বারটা নাগাত গাবিয়াং-এর উপকণ্ঠে পৌঁছেছি। খবর পেয়ে গ্রাম-বাসীরা অনেকেই আমাদের-প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে। ডাকবাংলোয় অন্য যাত্রিদল আশ্রয় নিয়েছে -প্রাঙ্গণেই আমাদের তাঁবু পড়ল। আজ মহা-তীর্থযাত্রার শ্রেষ্ঠ পর্ব শেষ হয়েছে। সঙ্গিগণ পরিজনবর্গের খবর পাবার জন্য উৎগ্রীব—স্নেহমমতা হাতছানি দিয়ে তাদের ডাকছে। সুদীর্ঘ দু'মাসে জগতে অনেক কিছুরই পরিবর্তন হয়। তাড়াতাড়ি ডাকঘরে লোক পাঠিয়ে চিঠিপত্র সব আনা হল। কয়েকখানি খবরের কাগজও এসেছে। আমরা এ জগতেরই—মন থেকে জগৎকে মুছে ফেলতে পারি নি—অসংখ্য গ্রন্থিতে এ সংসারের সঙ্গে নানাভাবে জড়িত।

অরুণ বাবুর নামে একখানি জরুরী তার এসে পড়ে আছে—অনেক দিন। তাঁর উপরওয়ালা পদোন্নতির সংবাদ দিয়ে তার করেছেন। শীঘ্র নূতন কার্যভার গ্রহণ করতে হবে। সহযাত্রী হাসতে হাসতে বললেন,—"হাতে হাতে তীর্থের 'সুফল'! তা একটা বড় ভোজ অন্ততঃ আমাদের তো পাওয়া উচিত।" এ প্রস্তাবে সকলেই একমত!

ঠিক করেছিলাম গার্বিয়াং-এ কয়েকদিন বিশ্রাম করে খেলা থেকে মজুর আনিয়ে নেবো—আলমোড়া পর্যন্ত যাবাব। আর সওয়ারী ঘোড়ারও ব্যবস্থা হবে কি- অরুণ বাবুর শীঘ্র নেমে যাওয়া দরকার। যে করেই হোক আগামী কাল রওনা হতেই হবে। তাঁকে একলা ছেড়ে দিতেও আমাদের প্রাণ চাইছিল না। কীচথাম্পা চলে গেল মজুরের সন্ধানে।

সারাটা বিকাল কেটে গেল হিসাবপত্র ও বিদায়-বকশিসে। রিং-বু বিদায় নেবার সময় কেঁদে ফেলেছে। উগ্র ও হিংস্র আবরণের ভিতর যে এমন কোমল ও স্নেহমমতাপূর্ণ প্রাণ থাকতে পারে তা ভাবতে পারি নি। তার কান্না আমাদেরও অভিভূত করে ফেলল। কদিনেরই বা পরিচয়? সে আমাদের কথা বুঝতে পারত না আমরা তার ভা বুঝি নি! কিন্তু আমরা তার প্রাণের অন্তস্তল স্পর্শ করতে পেরেছিলাম - সেও আমাদের ভিতরে পেয়েছিল তার প্রিয়জনকে খুঁজে। এই একটি জিনিস সকল প্রাণীমাত্রের ভিতরই আছে—ভালবাসা। সকলেই ভালবাসা পেতে চায়; ভালবেসে নিজ ভালবাসার বিকাশ করতে চায়। দেশকালের গণ্ডি—জাতি ও ভাষাব বিভাগ—এ প্রেমের স্রোতকে রুদ্ধ করতে পারে না। এক প্রাণের প্রেম যেন অন্য প্রাণে ঢেলে দিয়ে তার বিকাশ দেখতে চায়।

ঘোড়াওয়ালা দরবু—যার মুখে কথাটি কখনও শো না যায় নি—অক্লান্ত

পরিশ্রমী ও অতি বিশ্বাসী। আহা! সকলেই আমাদের জন্য কত খেটেছে! এদের সহযোগিতা না পেলে এ মহাদুর্গম তীর্থপথ এতটা নিষ্কণ্টক হত না। এরা সকলেই গরীব কিন্তু সৎ। দারিদ্র্য এদের মনুষ্যত্বকে মলিন করতে পারে নি। এদের সকলের নিকটই আমরা চিরকৃতজ্ঞ। চুক্তির উপর সাধ্যমত প্রচুর জিনিসপত্র ও বকশিস দিয়ে তাদের তৃপ্ত করে দিলাম। সকলেই সজলনয়নে বিদায় নিয়েছে। প্রতিদানে এইটুকুই আমাদের প্রাপ্য। তা প্রচুর পেয়েছি—সকলের প্রাণভরা কৃতজ্ঞতা ও শুভেচ্ছা। সন্ধ্যার পরে গাইড খবর দিল যে, মজুর ঠিক হয়ে গেছে।

৩রা শ্রাবণ বুধবার। সকাল হইতেই বাঁধাবাঁধি আরম্ভ হয়ে গিয়েছে। এখানে একটি অতি করুণ বিচ্ছেদের পালা। পথপ্রদর্শক কীচথাম্পাকে আমাদের ছেড়ে যেতে হবে। ভীষণ দুর্যোগের পথে, রাত্রে দিনে, দুঃখ-বিপদে দীর্ঘকাল সে একমাত্র নির্ভরযোগ্য বন্ধুরূপে আমাদের সঙ্গে সঙ্গে ছিল। স্বেচ্ছায় বুক পেতে দিয়ে আমাদের সকল কষ্ট ও পীড়নের অংশ সে নিয়েছে। তার সেবা যত্ন ও আন্তরিকতার তুলনা হয় না। আমাদের সুখস্বাচ্ছন্দ্যবিধানই ছিল তার একমাত্র ব্রত। পরম-আত্মীয়-জ্ঞানে তাকে আমরা হৃদয়ে টেনে নিয়েছি। আজ সত্যসত্যই তার কাছ থেকে বিদায় নিতে হবে। কাপড়, জামা, কম্বল, টাকা, উদ্বৃত্ত চাল-ডাল, আটা, চিনি প্রভৃতি অকৃপণভাবে সকলেই তাকে প্রচুর দিলেন। তার পাওনা গণ্ডার উপর চতুর্গুণ দিয়েও যেন তৃপ্তি হচ্ছিল না। সে আমাদের জন্য যা করেছে তার বিনিময়ে কোন পার্থিব জিনিসই যথেষ্ট হয় না। কীচথাম্পার মতন সজ্জন লোক খুব কমই দেখা যায়।

দশটার সময় গার্বিয়াং ছেড়ে চললাম। কীচথাম্পা সঙ্গে সঙ্গে প্রায়

দু মাইল এল। শেষটায় বুধির উৎরাই আরম্ভ করার পূর্বে নেহাৎ জোর করে তাকে ফেরাতে হল। বড়ই মর্মস্পর্শী। হাঁটুগেড়ে প্রণাম করে সে বালকের মতন অধীর হয়ে কাঁদছে—আমার চোখের জলও যেন বাধা মানছিল না। তাব সঙ্গে জানাশুনা অতি অল্প দিনের, কিন্তু তার গভীরতা খুবই বেশী। এ পবিচয়ের পটভূমি কষ্ট পীড়ন ও বিপদ-সঙ্কুল তিব্বতের মালভূমি। নিদারুণ দুঃখপূর্ণ আবেষ্টনীর মধ্যে আমরা পরস্পরকে পেয়েছিলাম। মুখে গায়ে হাত বুলিযে আদর করে তার কাছ থেকে বিদায় নিলাম। যতক্ষণ আমাদের দেখা যাচ্ছিল সে একই ভাবে দাঁড়িয়ে ছিল। কৈলাসযাত্রার স্মৃতির সঙ্গে কীচথাম্পা এক হয়ে রয়েছে।...

এবার আবস্ত হল বুধির হাঁটুভাঙ্গা উৎরাই। বর্ষার দরুন পথ বহু স্থানে ধসে গিয়ে আবও বিপদসংকুল হয়েছে। লিপর চূড়া প্রায় আঠার হাজাব ফুট। তা থেকে এখন গড়গড়িয়ে নেমে চলেছি—সমতলভূমি স্পর্শ করবাব জন্য। তারাপ্রসন্ন বাবু ও অরুণ বাবু দৌড়ে নেমে সকলের আগে বুধিতে পৌঁছে গেছেন। অত দ্রুত নামা ঠিক হয় নি—প্রতিক্রিয়া হতে পারে, তাঁদের বললাম। এখনও নয় মাইল বাকী। মালপা ত পৌঁছতে হবে আজ। ওঁরা দু'জনে এগিয়ে চলেছেন। পথ পরিচিত— সেজন্য আজ আর দলবদ্ধ হয়ে যাবার প্রয়োজন নেই। আমি ও পাহাড়ী সহযাত্রিদ্বয় একসঙ্গে, ডাক্তার বাবু ও আর আর সব পেছনে। শেষের দিকটা বেশ খাড়া চড়াই। তখনও দেড় মাইল বাকী। এমন সময় দেখা গেল পথের পাশে অরুণ বাবু লম্বা হয়ে পড়ে আছেন। আর তাঁর মাথাটা কোলে করে তারাপ্রসন্ন বাবু বিষণ্ণমুখে আমাদের আগমন প্রতীক্ষা করছেন। অরুণ বাবু চলচ্ছক্তিহীন ও ভীষণ অবসন্ন। নাড়ী ক্ষীণ, সর্বাঙ্গ ঘর্মাক্ত— একেবারে ফ্যাকাশে মেরে গেছেন। কী বিপদ! ...: দে তখনও পেছনে

ছিলেন। পাহাড়ী সঙ্গী তাড়াতাড়ি তাঁকে ডাকতে চলে গেল। প্রায় আধঘণ্টা পরে ডাঃ দে এসে ইনজেকসন্ দিলেন। জনমানব ও সহায়হীন পথ। মজুররা তখনও অনেক পেছনে। আরও খানিক বিশ্রাম নিয়ে তাঁকে কোনরকমে তিন-চার জনে বয়ে নিয়ে এলাম মালপার চালাঘরটিতে। ঔষধাদি ও বিশ্রামে রাত্রে তিনি অনেকটা সুস্থ হলেন।

যাবার সময় বৃষ্টি তেমন পাই নি কিন্তু এখন চলেছে পুরো বর্ষা হিমালয়ে। বিছানাপত্র প্রতিদিনই ভিজে যাচ্ছে—অয়েলক্লথেও বাঁচাতে পারছে না। শীতের রাজ্যে বড়ই কষ্ট। মালপা—জিপ্তির এই আট মাইল পথ 'মৃত্যুর পথ'। এ পথে প্রতি বৎসরই লোক মারা যায়—এবারও মরেছে। সকালে দু'দলে বিভক্ত হয়ে রওনা হয়েছি। জিপ্তিতে স্থানাভাব। আমরা তিনজন চলেছি এগিয়ে। আমরা তো পৌছে গেলাম এগারটায়। কোনপ্রকারে একটু জায়গা করে রান্নাদি সেরে বসে আছি, কিন্তু সহযাত্রীদের দেখা নেই। বড়ই দুর্ভাবনা হল। প্রায় দুটা নাগাত মুমূর্ষু অবস্থায় সকলেই এলেন—অর্থাৎ ঘণ্টায় এক মাইল করে। আকাশ ভেঙ্গে নামল বৃষ্টি। কী ভীষণ মেঘগর্জন! বিছানাপত্র তখনও এসে পৌছায় নি। চালাঘরটি খোলা; দারুণ শীতে ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছি। মজুররা ভিজতে ভিজতে এল সাড়ে-পাচটায়।

জিপ্তিতে পৌছে একটি দুর্ঘটনার সংবাদ খুবই বিচলিত করে ফেলেছিল। খেলার নীচে ধৌলীগঙ্গার কাঠের পুলটি ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছে—এখন দড়ি বেঁধে পারাপারের ব্যবস্থা এবং সে ব্যবস্থাও অস্থায়ী। পূর্তবিভাগের 'সড়ক্-জমাদার' এ গ্রামেরই লোক। তারই তত্ত্বাবধানে ঐ পথটি। প্রথমটায় জমাদার আমাদের কথা গ্রাহ্যের মধ্যেই আনলে না। কিন্তু সহযাত্রীদের পদমর্যাদার পরিচয় দিতেই তার সুর একটু নরম হল।

আমরা যাচ্ছিলাম আলমোড়ায়; তার বিরুদ্ধে রিপোর্ট করতে পারি—এই ভয়ে পরদিন সকালে মজুর নিযে আমাদের পার করার ব্যবস্থার জন্য চলে গেল।

এদিকে জিপ্তিতে এসেই দেখা গেল যে, একজন ব্রহ্মদেশবাসী বৌদ্ধ-সন্ন্যাসী (ফুঙ্গী) কৈলাসপ্রত্যাবর্তন-পথে ওখানে অর্ধমৃত অবস্থায় পড়ে আছেন—সহায়সম্বলহীন, গরম কাপড় কম্বলও অতি সামান্য। মাতৃভাষা ও দু'চারটি ইংরেজী শব্দ ছাড়া অন্য ভাষা জানেন না। তাড়াতাড়ি গরম দুধ কিনে তাঁকে খেতে দিলাম। ডাঃ দে এসে দেখলেন এবং বললেন—'নিউমোনিয়া'। ঔষধপত্র সবই মজুরদের কাছে ছিল। তারা এসে পৌছতেই ডাঃ দে খাবার ঔষধ ও ইনজেক্সন দিলেন। সে রাত্রিটা সেবা-যত্নাদি করা হল। পরদিন প্রাতে বেরুবার সময় দোকানীর কাছে পীড়িত ফুঙ্গীর পথ্যাদির জন্য কিছু দিয়ে এলাম।

প্রত্যাবর্তন-পথের বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া অনাবশ্যক। যাবার সময় যেখানে ছিল চড়াই, এখন তা উৎরাই। আর উৎরাই চড়াইতে পরিণত হয়েছে—এইটুকমাত্র প্রভেদ। অবশ্য গত দেড়-মাসের বর্ষার দরুন চেনা পথও অচেনা হয়ে গেছে। কোথাও পথ নিশ্চিহ্ন, কোথাও বা পাহাড় গড়িয়ে পড়ে বন্ধ—পাকদণ্ডি দিয়ে কোনরকমে অতিক্রম করতে হচ্ছে। সারাটি পথই হয়েছে প্রস্তরসমাকীর্ণ।

গত রাত্রির দারুণ দুর্যোগের চিহ্নমাত্র কোথাও নেই। সকালটি বড়ই মনোরম। সূর্যকিরণস্পর্শে পরিচ্ছন্ন আকাশ হেসে উঠেছে! শ্যামল-বনানীবেষ্টিত পর্বতমালা—সবুজের অপূর্ব মেলা। তিব্বতে বাস করে করে আমরা সবুজের কাঙ্গাল হয়ে পড়েছি।

জিপ্তিতে অনেক বিভ্রাট। গার্বিয়াং-এর মজুরদের ছেড়ে নূতন একদল মজুর ঠিক করতে হল—আলমোড়া পর্যন্ত। আজকার পাড়ি ষোল মাইল।

পঙ্গুতে রাতকাটান। প্রথম তিন মাইল উৎরাই নদী পর্যন্ত, তারপরে আরম্ভ হল চড়াই। এখন চড়াই-উৎরাই সবই সমজ্ঞান হয়ে গেছে, অথবা শরীর এমনই অসাড় ও অকর্মণ্য যে দুঃখকষ্ট তাকে স্পর্শ করতে পারছে না। চলেছি তো চলেছি। শরীরটাকে টেনে নিয়ে চলেছি। এখন সব ছন্দের মধ্যেই একটি মাত্র সুর—'আগে বাড়ো'। চড়াইর মাঝামাঝি বৃষ্টি আরম্ভ হল। তা হোক; ভিজে ভিজেই চলেছি। এই আশ্রয়হীন পথে উদ্বাস্তুর দল আমরা—মাথা গুঁজবার স্থান কোথাও নেই। চড়াইর শেষে তিন মাইলের উৎরাই, আবার দু মাইলের চড়াই। পাথরে ঠুকে ঠুকে চরণগুলির দুর্ভোগ! একটার সময় শিখরার ধর্মশালায় পৌছেছি; জামা কাপড় সব কিছুই ভিজে গেছে—নিংড়ালে জল বেরোয়। গায়ে গায়েই শুকাতে হল আগুনের কাছে বসে। আমরা গ্রামবাসীদের পূর্ব-পরিচিত। তাদের আত্মীয়তা খুবই প্রাণস্পর্শী। কিন্তু কি দারুণ মাছির উপদ্রব! হাজার হাজার মাছি—দু'হাতে সরালেও যেতে চায় না। এ আবার 'রক্তখেকো' মাছি—কামড়ে অস্থির করে তোলে।

তিনটের পর পথে নেমে পড়েছি। কেবলই নামা-উঠা। দশ হাজার ফুট স্পর্শ করে আবার নামছি—আট হাজারে, আবার উঠছি—এই চলেছে। সহযাত্রীরা এতকাল ঘোড়ায় চেপে ঘোড়ার উঠা-নামারই অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন, এখন কিন্তু অন্য রকম। স্বামী দুর্গাত্মানন্দ এখন মরিয়া হয়ে গেছেন। হিলষ্টিকের উপর অতিরিক্ত জুলুম করে হাতও ব্যথা হয়ে গেছে। অরুণ বাবু একেবারে ভেঙ্গে পড়েছেন, আর পারছেন না। অথচ বহু চেষ্টা করেও একটা সওয়ারী ঘোড়া যোগাড় হচ্ছে না। অবশ্য কোথাও দু'এক দিন অপেক্ষা করে চেষ্টা করলে যোগাড় করা সম্ভব হতো, কিন্তু আমরা থাকতেও রাজী নই।

বৃষ্টি আরম্ভ হল। তিন মাইল অতিক্রম করে সোসাতে পৌঁছেছি। গ্রামের সারাটি পথ জুড়ে 'ঢুঢুং' উৎসব চলেছে—মৃতের আত্মার সদ্‌গতির জন্য উৎসব। কার্তিক মাস হতে আষাঢ় মাস পর্যন্ত গ্রামে যত লোক মরে, তাদের সকলের ঔর্ধ্বদেহিক ক্রিয়া এই সময় একসঙ্গে করা হয়। নিকটবর্তী কয়েকটি গ্রামের সুসজ্জিত নরনারীতে পথ ছেয়ে গেছে। উন্মুক্ত তরবারী হস্তে, কেউবা বন্দুক নিয়ে, মদ্য পান করে তাণ্ডব নৃত্য! গ্রামের প্রধানের সঙ্গে যাবার পথে পরিচয় হয়েছিল—তার দোকান থেকে কিছু জিনিস কিনেছি[illegible]। এখন তাদের উৎসবে যোগদান করে গ্রামেই সেদিন থাকার জন্য প্রধান জিদ্ করতে লাগল। বুঝলাম সেও প্রকৃতিস্থ নয়। বাপরে বাপ্, যে মাতামাতি! এর মধ্যে থাকা। বৃষ্টির মধ্যেই সকলে নৃত্য করছে। এই '[illegible]' উৎসব পাঁচদিন ধরে চলে। যে গ্রাম যত বেশী বর্ধিষ্ণু সে গ্রামে তত বেশী মদ্যপান করান হয় সকলকেই। উৎসবের প্রথম দিন প্রচুর মদ তৈরী হয়, দ্বিতীয় দিন মৃত ব্যক্তিদের হাড় গুড়িয়ে তা দিয়ে অন্য জিনিসের সঙ্গে মিশিয়ে পুতুল গড়ে। তৃতীয় দিন পুরি হালুয়া মিঠাই প্রস্তুত করে। চতুর্থ দিন একটি তিব্বতী চামরী গাভীকে নানা[illegible] নূতন কাপড় দিয়ে শিং হতে পা পর্যন্ত মুড়ে সজ্জিত করে হাড়ের তৈরী পুতুলগুলি সাজিয়ে দেয় ঐ গরুর পিঠে। পুরোহিত (ব্রাহ্মণ নয়) মন্ত্রপাঠ করে। গরুটিকে পুরি হালুয়া খাওয়ান হয়। পঞ্চম দিনে সেই গাভীটিকে পুরোবর্তী করে বিরাট শোভাযাত্রা—গান বাজনা নৃত্য মাতামাতি কাণ্ড! সবস্ত্র গাভীটি পুরোহিতের প্রাপ্য (বোধ হয় গোদান)। আমরা যেদিন যাচ্ছিলাম সে দিন উৎসবের শেষ দিন। তখন বন্দুকের শব্দ হচ্ছিল, আর উন্মুক্ত তরবারীহস্তে কৃত্রিম যুদ্ধ চলেছে। পথের ধারে মদের জালা। যে যত পারে খাচ্ছে। নেশার ঝোঁকে অনেক সময় খুনজখম হয়ে যায়। সে সব অবশ্য

ধর্তব্যের মধ্যেই নয়। মেয়ে-পুরুষ সকলেই নাচছে, গাইছে, ঢলে পড়ছে, আবার মদ খাচ্ছে! কোন প্রকারে ঐ স্থানটি অতিক্রম করে হাঁপ ছেড়ে বাঁচা গেল।

সন্ধ্যার পূর্বে পঙ্গুর ধর্মশালায় পৌছে গেছি। মণিপ্রধান ধর্মশালার একটি ঘর খুলে দিল। আজ গ্রাম থেকে একটু দুধ ও কিছু শাকসবজি সংগ্রহ করে অনেক দিনের একঘেয়ে মুখ একটু পালটে নিয়েছি।

ধর্মশালায় একজন প্রৌঢ় নাগাসন্ন্যাসীও ছিলেন—কৈলাসযাত্রী। বেশ ভজনানন্দী সাধু। যাত্রাসম্বন্ধে অনেক কথাবার্তা হল। সাধুটি রাত্রে বেশ তন্ময় হয়ে মধুর কণ্ঠে গাইলেন—

"......সব বন তুলসী ভঁয়ো, সব পাহাড় শালগ্রাম।
সব পানী গঙ্গা ভঁয়ো, জব ঘটমে বিরাজে রাম।... ..."

নিস্তব্ধ আবেষ্টনী, তীর্থ অবগাহী মন, হিমালয়ের ধ্যানগম্ভীর আবহাওয়া। গানের মর্মবাণীটি প্রাণে ধ্বনিত হতে লাগল। সাধুজী তীর্থখরচ কিছু চাইলেন। যথাসাধ্য তাঁকে কিছু দিয়ে তৃপ্ত হয়েছিলাম।

ধর্মশালায় যদিও পিস্থু-পোকার ভীষণ উৎপাত, তবু তো পাকা বাড়িতে রাতকাটান। শেষরাত্রে আরম্ভ হল মুষলধারে বৃষ্টি। পঙ্গুর উৎরাইপথে পাথর গড়িয়ে পড়ে লোক মারা যায়। ভাবনা হল। মণিপ্রধান সকালবেলা এল ঔষধ নিতে। বড় ভাল লোক। সংসারে সে একা—স্ত্রী পুত্র সব মরে গেছে। শেষ বয়সে পড়েছে খুবই কষ্টে। নিজের দুঃখ জানিয়ে কেঁদে বলছে—"আমি তো জীবনে কোন পাপ করি নি—কারও কোন অনিষ্টও করি নি; তবু আমার উপর ভগবানের এ অভিসম্পাত কেন? আমায় সর্বহারা করেছেন!" জবাব আর কি দেব? তার গভীর নিঃশ্বাসে বাতাস ভারাক্রান্ত হয়ে উঠল।

সকাল সকাল আহারাদি শেষ করে বৃষ্টি বন্ধ হবার অপেক্ষায় বসে

আছি। দশটা নাগাত পথ আমাদের টেনে বের করল। আমরা বেশী সময়ই পথে পথে কাটাই। দুঃখ ও দুর্যোগের ভিতর দিয়ে এপথের সঙ্গে আমাদেব পরিচয়। সেজন্যই বোধ হয় পথটি বন্ধুজনের মতন অতিপ্রিয় হয়ে উঠেছে। সবুজ বনানীর বুক চিরে রজতশুভ্র বহু বারিধারা নেমে এসেছে পথে পথে। চার হাজার ফুটের উৎরাইটি গড়াতে গড়াতে কোন প্রকারে শেষ করে ধৌলীর তীরে এসে দাঁড়ালাম। যাবার সময় যে কাঠের সেতুটি দেখে গিয়েছিলাম তা বর্ষায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। এখন তার স্থানে পাবাপারের জন্য দু'ধারে খোঁটা পুঁতে তাতে বাধা হয়েছে তিন খানি ঘাসের মোটা কাছি। আর ঐ কাছিতে ঝুলছে একখানি ত্রিকোণাকৃতি কাঠ। ঐ কাঠটিতে কোনপ্রকারে বসে পা ঝুলিয়ে কাঠটি আঁকড়ে ধরে থাকতে হয়। ঐ কাঠের সঙ্গে বাঁধা থাকে একখানি দড়ি; অপর পার থেকে ঐ দড়ি টেনে টেনে সওয়ার সহ কাঠখানি পর পারে নিয়ে যায়। কোনপ্রকারে হাতফসকালেই নদীগর্ভে পড়ে নিশ্চিত মৃত্যু। এ যে আদিম যুগের ব্যবস্থা। এদিকে ধৌলীর ভীষণ গর্জনে কানে তালা লেগে যাচ্ছিল। দুর্গা বলে তো ঝুলে পড়লাম। ঐ ত্রিকোণ কাঠটির সঙ্গে বোঝার মত আষ্টেপিষ্টে বেধে দিয়ে অপর পার থেকে কাণ্ডারী যখন হেঁচকা টান্ মারল, তখন বেশী কিছু ভাববার অবকাশ ছিল না। মনে হল—ব্যস্, এবার সব শেষ! চোখ কান বুঁজে কোন রকমে কাঠটি আঁকড়ে ধরে বসে রইলাম। নীচে ধৌলীর দুরন্ত স্রোতবেগের দিকে চাইতে সাহস হচ্ছিল না। এইভাবে এক এক করে যাত্রী, মজুর, মালপত্র সব পার করতে লেগে গেল তিনটি ঘণ্টার বেশী—অথচ নদীটি পঞ্চাশ-ষাট ফুট মাত্র চওড়া। রাস্তার জমাদারকে বক্‌শিস্ দিয়ে চলে এলাম। খেলার সেই পরিচিত দোকানঘরটি পুরাতন বন্ধুর মতন হাত বাড়িয়ে বুকে টেনে নিল।

মজুররা সকলেই এ গ্রামের লোক। পরিবারবর্গের সঙ্গে দেখা করবার জন্য কাল রাত্রে বাড়ী গেছে। প্রায় পনের দিনের জন্য যাচ্ছে তারা আলমোড়া পর্যন্ত। সকালে মজুররা আসতে দেরী করেছে—তা হোক, তখনই বেরিয়ে পড়লাম। দশ মাইল মাত্র পথ বইতো নয়। আর সবটাই উৎরাই। কালীর ধারে ধারে চলেছি। দেবদারুবন শেষ হয়ে গেছে। পাঁচহাজার ফুটের নীচে দেবদারু বড় একটা জন্মায় না। এখন চলেছি পাইন, ওক, রোডরেণ্ডাম-জংগলের ভিতর দিয়ে। এক একস্থানে পথ ধুয়ে এমন নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে যে, কোনকালে ওখানে পথ ছিল বলেই মনে হয় না। একটি অতি সংকীর্ণ 'বাটিয়া' ধরে চলেছি 'কালীর' গর্ভে। বর্ষার জলস্রোতগুলি অতি দুরন্ত হয়ে উঠেছে। সব কিছুকে গ্রাস করাতেই যেন আনন্দ! কালীর ভীমনাদ বুকের রক্ত শুকিয়ে দেয়। বিপরীত দিকে ঝুঁকে মাটি আঁকড়ে ধরে, বসে বসে কোনপ্রকারে সে সঙ্কটপূর্ণ স্থানটি অতিক্রম করা গেল। হু হু করে বইছে বাদলা হাওয়া। আকাশ ঘন মেঘে ঢাকা। বর্ষণোন্মুখ মেঘ আমাদের ছুঁয়ে ছুঁয়ে ভেসে চলেছে। আমরাও বাস করছি মেঘের ভিতর।

এগারটা নাগাত ধারচুলার উপকণ্ঠে এসেছি। মাঠে মাঠে চলেছে চাষের কাজ। ধানক্ষেতে কাদা করে ধানরোপা হচ্ছে। ভুট্টাগাছগুলি এরই মধ্যে মানুষপ্রমাণ বড় হয়ে গেছে। যাবার সময় মাঠগুলি খাঁ খাঁ করছিল। এখন সবুজে ভরা মাঠ। বেশ লাগছে। আম কলা পেয়ারা প্রচুর। ডাকবাংলোটি খালি পেয়ে তাতেই উঠলাম। সওয়ারী ঘোড়ার চেষ্টা করা গেল, কিন্তু একটিও জুটল না। স্নান আহার করে নিশ্চিন্ত মনে নিদ্রা। পাকা আম ও কলা বহুকাল পরে খাওয়া হল। সহযাত্রী বললেন, "এবার তো আর নেংড়া বোম্বাই জুটবে না—দুধের স্বাদ

ঘোলেই মেটান ছাড়া উপায় কি?" তা আমগুলি নেহাৎ অখাদ্য নয়—অম্ল-মধুর।

সন্ধ্যা থেকে আরম্ভ হয়েছে জোর বৃষ্টি। তা আমরা গ্রাহ্য করি নে—পাকা বাড়ীতে আশ্রয় পেয়েছি। বেশ গরম বোধ হচ্ছিল—মাত্র তিন হাজার ফুট। কোথায় উনিশ হাজার, আর কোথায় তিন হাজার। বৃষ্টি হয়ে বরং একটু ঠাণ্ডা হল।

সকালের দিকে আকাশ পরিষ্কার। বেরিয়ে পড়লাম। পথের দু'ধারে সবুজ শস্যক্ষেত্র: ধান, মকাই, চাঁউলিয়া, মাড়ুয়া। চোখ জুড়িয়ে যায়। জমি বেশ উর্বর। সবুজ বনময় পথ, অরণ্যপক্ষি-কাকলি-মুখরিত। কালীর প্রচণ্ড স্রোতগর্জন শুনতে শুনতে চলেছি। পথে নেমে এসেছে অসংখ্য ঝরনা। ক্রমে রোদ খুবই প্রখর হয়ে উঠেছে। একটু পরে-পরেই তৃষ্ণার্ত হই। ঝরনার শীতল জল পান করে আবার চলছি। বেলা এগারটায় এলাম বলবাকোটে। পথিপার্শ্বে একটিমাত্র ক্ষুদ্র দোকান—পথিকের দল দখল করে নিয়েছে। আমরা আশ্রয় নিলাম তরুতলে। পাশেই কালী। স্নান আহার বিশ্রাম সেরে মুসাফিরের দল বেরিয়ে পড়েছি। পড়ন্ত রৌদ্রে সকলেরই খুব কষ্ট হচ্ছে। তিব্বতের ঠাণ্ডার জন্য প্রাণ আটপাট করে। লুব্ধ দৃষ্টিতে ফিরে তাকাই হিমকণাময় সেই তিব্বতের দিকে। এই তিব্বত হতে পরিত্রাণ পাবার জন্যই আমাদের প্রাণ ছটফট করে উঠেছিল—আজ আবার পেতে চাই সেই তিব্বতকেই। আমাদের সুখদুঃখের অনুভূতির পশ্চাতেও এমনিধারা মনের একটা লুকো-চুরিখেলা চলেছে সারা জীবন। আজ যা দুঃখপূর্ণ, তাকেই কাল বলি আনন্দময়।

ছ'টায় জৌলজীবিতে এসে গেলাম। অতি মনোরম স্থান। যাবার

পথে সতৃষ্ণ নয়নে শুধু দূর থেকে স্থানটিকে দেখে গিয়েছি। কালী ও গৌরীর সঙ্গমস্থলে ঘন আম্রকাননের মধ্যে সুন্দর একটি ক্ষুদ্র দেবালয়। 'কালী-গৌরী-মহেশ্বর' ঐ মন্দিরে পূজিত হচ্ছেন গত চল্লিশ-বৎসর যাবৎ। আসকোটের রাজা এই দেবালয়টি প্রতিষ্ঠিত করে অশেষ পুণ্য অর্জন করেছেন। জৌনজীবি গ্রামটি মুসলমানপ্রধান। মন্দিরের পূজারী ও অন্য হিন্দুরা একটু উপরে পৃথকভাবে বাস করে। মন্দিরের পাশেই থাকেন এক প্রৌঢ়া পাহাড়ী 'সন্ন্যাসিনী-মাতা' গত দশ বৎসর ধরে। পূজারীর চেষ্টায় আমরাও এক পাহাড়ীর খালি বাড়ীতে আশ্রয় পেলাম। মন্দিরে বসে পূজা-পাঠাদিতে সন্ধ্যাটি বেশ কাটল। হিমালয়ের শান্ত আবেষ্টনী—ঋষিসেবিত স্থানে, দেবসান্নিধ্যে বসলে মন স্বতঃই আত্মস্থ হয়ে যায়। পূজারীর যত্নাদির অন্ত ছিল না। আমরাও তাঁকে যথাশক্তি পরিতৃপ্ত করলাম। গরীব ব্রাহ্মণ—দেবমন্দির ও দেবতাকে আশ্রয় করে পড়ে আছেন।

গৌরী নেমে এসেছে মিলাম হিমবাহ হতে, আর লিপুলেক থেকে বেরিয়েছে কালী। নিঝুম রাতে ঐ প্রশান্ত পরিবেশের মধ্যে কালীর সঙ্গে গৌরীর মিলন—দেখবার মতন। সন্তান যেন সোহাগভরে ঝাঁপিয়ে পড়েছে মায়ের বুকে। সেই উচ্ছ্বাসমুখরিত সঙ্গমস্থলে অনেক রাত পর্যন্ত বসেছিলাম। . . .

ভোরেই রওনা হয়েছি। অনেক চেষ্টায় একটিমাত্র ঘোড়া পাওয়া গেছে আসকোট পর্যন্ত। অরুণ বাবু উঠলেন ঘোড়ায়! মেঘমলিন আকাশ। আমরাও চলেছি ক্ষীণ মেঘজালের ভিতর দিয়ে। গৌরীর উপরকার পুলের পরেই কর্কশ ও নির্দয় চড়াই। তিন মাইল। হামাগুড়ি দিয়ে উঠছি। সাড়ে-আটটায় পৌঁছে গেলাম আসকোটে 'ভূপেন্দ্র ধর্মশালায়'।

সুন্দর ধর্মশালাটি। ভাল করে স্নান করে প্রচুর আম ও কলার ফলার করা গেল। মধ্যাহ্নে সঘৃত 'বাসমতি' চালের ভাত, কলাইর ডাল ও রুচিকর তরকারি-সংযোগে প্রত্যেকেই খুব তৃপ্তিপূর্বক খেলেন।

সহযাত্রীদের জন্য সওয়ারী-ঘোড়া যোগাড় হয়েছে আলমোড়া পর্যন্ত। আড়াইটার সময় সেজেগুজে তারাপ্রসন্ন বাবু ঘোড়ার রেকাবে পা দিয়ে খুব দম্ভভরে বলছেন—"এবার আর পায় কে? কেল্লা ফতে কর্ দিয়া।" তা বটে! আজ সাত মাইল মাত্র যেতে হবে—ডিডিহাট পর্যন্ত। খানিকটা আসার পরই লোহাঘাট—টনকপুর আর আলমোড়ার পথ পৃথক হয়ে গেল। আমরা চলেছি আলমোড়ার দিকে। অন্য পথটি পেছনে পড়ে কাঙ্গালের মতন আমাদের দিকে চেয়ে রইল। এখন আর প্রয়োজন নেই, তাই তাকে পরিত্যাগ করেছি। অথচ ঐ পথটিই একদিন পরম বন্ধুর মত আমাদের নিয়ে চলেছিল কৈলাসের দিকে। কী স্বার্থান্ধই না আমরা!

চড়াই পথে ধীরে ধীরে চলেছি। একটু পরেই চিরবন মথিত করে এল প্রবল ঝড় আর শপ্ শপ্ বৃষ্টি। আশ্রয়হীন পার্বত্য পথ—চলেছি ভিজে ভিজে। ছাতা খুলবার উপায় নেই। বৃষ্টির ঝাপটায় বিভ্রান্ত করে তুলেছে। পথের উপর দিয়েই ছুটে চলেছে জলস্রোত। চড়াই করে উঠতে হচ্ছিল।

পার্বত্য প্রদেশের বৃষ্টি। আধঘণ্টা পরেই মেঘ ক্রমে হালকা হয়ে গেল—ঝড়ও হল শান্ত। ক্রমে রাঙ্গা হয়ে উঠল পশ্চিমের আকাশ। ডানদিকের পর্বতচূড়ায় পৌঁছতেই অনতিদূরে দেখা গেল একটি ক্ষুদ্র জনপদ। বোঝা গেল—ডিডিহাট। ক্রমে পৌঁছে গেলাম। উচ্চতা ছয় হাজার ফুট। স্থানটির আভিজাত্য মন্দ নয়। দুটি পর্বতের মাঝে

অনেকটা সমতল স্থানে এ বর্ধিষ্ণু গ্রামটি গড়ে উঠেছে। প্রচুর জল, কয়েকটি দোকান, একটি মধ্য ইংরেজী স্কুল। স্কুলের ছাত্রসংখ্যা একশত। স্কুলবাড়ীটি ও বেশ। ছেলেদের জন্য বোর্ডিং-হাউসও আছে। আশ্রয় নিলাম একটি দোকানের উপরে। রাত্রিটি স্মরণীয় হয়ে আছে এখনও। পিস্সুপোকা ও ছারপোকার উৎপাতে কেউ শুতে পারি নি। পিঁপড়ের সারির মতন সারিবদ্ধ ছারপোকা আর অসংখ্য পিস্সু! ঘুম? আত্মরক্ষা করা গেছে এই যথেষ্ট!

১৫ই শ্রাবণ বুধবার। অন্ধকারে বৃষ্টির মধ্যেই বেরিয়ে পড়েছি। দুর্জনের সংসর্গ থেকে মুক্তি পেলেই বাঁচি। শরীর অবসন্ন—বেতসলতার মতন দুলছে। মন ক্লান্ত। ধীরে ধীরে চড়াই আরম্ভ হল। এই চলেছে—উঠা আর নামা। কাল তিন হাজার থেকে ছয় হাজার ফুটে উঠেছি, আর আজ সাড়ে-সাত হাজারে উঠে আবার নামতে হবে তিন হাজারে। সকালে পাই বাতাসে বাতাসে বনমল্লিকার সুমিষ্ট গন্ধ, মধুমক্ষিকার গুঞ্জন, জঙ্গলী বনলতা, গোলাপের বিতান, অরণ্যপক্ষীর কাকলী, মনোহর পার্বত্য শোভা—মধ্যাহ্নে গরমে ছটফট করি, আবার প্রদোষ-সময়ে শীত-জর্জরিত দেহে কাঁপতে কাঁপতে কোন কুটিরে আশ্রয় নেই। এই চলেছে।

বৃষ্টির মধ্যেই চার মাইল পথ অতিক্রম করলাম। 'ছাটা'য় খ্রীষ্টান মিশনারীদের একটি কেন্দ্র রয়েছে দেখা গেল। বৃষ্টি থেমে গেছে, এখন নামতে শুরু করেছি। পরিচ্ছন্ন আকাশ, শ্যামল বনানী, শস্যক্ষেত্র, আম্র-কানন, কদলীবন—সবই ভরে গেছে রাঙ্গা রোদে। গাছে গাছে প্রচুর আম—এখনও পাকে নি।

সাড়ে-দশ মাইল পথ বেয়ে দশটার পর থল্-এ এলাম। স্থানটি বেশ বর্ধিষ্ণু। অনেক লোকের বাস। রামগঙ্গার দু'ধারে খানিকটা দূরব্যাপী

লোকের বসতি—ডাকখানা, দোকান, একটি উচ্চ-প্রাইমারী স্কুল। স্কুলে নব্বইটি ছেলে ও তিনটি মেয়ে পড়ে। স্কুলমাস্টার দয়া করে বিদ্যালয়ের উন্মুক্ত বারান্দায় আমাদের থাকতে দিলেন।

রামগঙ্গা মিলাম-হিমবাহ থেকে নির্গত হয়ে পড়েছে সরযূতে। থল্ হতে মিলাম যাবার একটি রাস্তা আছে। নিকটেই রামগঙ্গার তীরে একটি প্রাচীন শিবমন্দির—নাম 'একহাতিয়া দেবল'। ঐ মন্দিরে অধিষ্ঠিত দেবতা বাণেশ্বর মহাদেব। জনশ্রুতি যে, একহাতবিশিষ্ট জনৈক রাজমিস্ত্রী একটি প্রকাণ্ড পাথর কেটে কেটে এ মন্দিরটি তৈরী করেছিল।

অপরাহ্ণে অপ্রত্যাশিতভাবে এল প্রবল ঝড়বৃষ্টি, আর কী মেঘ-গর্জন! যেন একটি ক্ষুদ্র প্রলয়কাণ্ড। পার্বত্য প্রদেশকে জর্জরিত ও মথিত করে চলেছে বরুণদেবের তীব্র শাসন। বিকট শব্দে আমাদের ঘরটির ঠিক সামনেই বজ্রপাত হল। এক ঝলকা আগুন যেন আমাদের চোখমুখ ঝলসে দিয়ে গেল। আতঙ্কে শিউরে উঠেছি। এত কাছে, যেন আমাদের উপরই পড়ল বজ্রটি। স্রোতাকারে বয়ে যাচ্ছে জলধারা বারান্দার উপর দিয়ে—বিছানাপত্র ভিজেছে, আমরাও কুকুর-ভিজে হয়েছি। তবু একটা আশ্রয়ে ছিলাম। ঝড়বৃষ্টি বন্ধ হতে দেখা গেল স্কুলের পঁচিশ-ত্রিশ হাত দূরে এক প্রকাণ্ড পাইনগাছকে বাজ পড়ে চৌচির করে দিয়েছে।

খুব ভোরে ভোরেই বেরিয়ে পড়েছি - রামগঙ্গার ধারে ধারে পথ। যেতে হবে দেড় পড়াউ—ষোল মাইল। শিবলোক থেকে বিদায়—চলেছি মর্ত্যলোকের আকর্ষণে। শিবসান্নিধ্যে শিবলোকে বাস আমাদের শেষ হয়ে গেছে। আজ চলেছি সেই আনন্দলোকের স্মৃতি হৃদয়মণিকোঠায় সযত্নে বয়ে নিয়ে।

গুড়গাটিয়া চটিটি পেছনে পড়ে রইল। আমরা উঠছি—আজ তিন-হাজার থেকে সাত হাজার ফুটে উঠতে হবে, আবার যেতে হবে পাঁচ হাজার ফুটে। ।'বস্থা মন্দ নয়। রাস্তা পাহাড়ী পথ হিসাবে প্রশস্ত, যদিও বর্ষাবিধ্বস্ত। ঘন পাইনবন। দৃশ্য অতি মনোরম। চলি, আবার ফিরে ফিরে তাকাই। পর্বতগাত্রে শ্যামল বনানীর উত্তরীয়। আধরোদ, আধছায়া। সবুজ পাহাড়ের গায়ে গায়ে সাদা কুটীরগুলি ছবির মতন।

আনমনে চলেছি। বেরীনাগের চড়াই প্রায় শেষ।

"নমস্তে মহারাজজী। জয় হিন্দ্।" অপরিচিত কণ্ঠস্বর শুনে চমকে উঠে তাকাতেই দেখি যে, একজন পাহাড়ী যুক্তকরে দণ্ডায়মান।

'জয় হোক' বলে শুভেচ্ছাজ্ঞাপন করলাম। "বাবাজী, ৺কৈলাসদর্শন করে ফিরছেন?" —"হাঁ-জী। আপনার অনুমান ঠিক।" —"আজ আমার মহা পুণ্যদিন। অহো ভাগ্য! আজ আমারও কৈলাসদর্শন হল।"

জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকিয়ে রইলাম। ভদ্রলোকটি বললেন, "মহারাজ, আমি দরিদ্র ব্রাহ্মণ। স্থানীয় বিদ্যালয়ে সামান্য বেতনে শিক্ষকতা করি। বহুদিনের ইচ্ছা যে কৈলাসদর্শনে যাই। কিন্তু অনেকগুলি পোষ্য—অর্থাভাবে এযাবৎ কৈলাসদর্শন আমার হয়ে উঠে নি। তিনি দয়াময়—তাই আজ আপনার দর্শনলাভ হল। আপনি কৈলাস থেকে আসছেন।" চিত্তপ্রসাদ তাঁর মুখে চোখে ফুটে উঠেছে, আর শ্রদ্ধাবনত দেহ ক্রমে ভূমিতে লুটিয়ে পড়ল। সাদরে হাত ধরে তুলে তাঁকে গাঢ় আলিঙ্গনপাশে বদ্ধ করলাম। শুভেচ্ছা জানালাম। একজনকেও সেই পুণ্যস্পর্শের অংশ দিতে পেরেছি! হৃদয়-মনে আনন্দের প্লাবন বয়ে গেল।

বেলা দশটা লাগাত দূর থেকে দেখা গেল বেরীনাগ—ছোটখাট একটি পাহাড়ী শহর। অনেক দোকানপাট, স্কুল-হাসপাতাল, বনবিভাগের

বিশ্রামাগার, ডাকঘর, ঔষধালয়, দুধ ও মেঠাইয়ের দোকান। স্কুলে ব্যবস্থা সুন্দর। সকালবেলা পড়ে ছোট ছেলেমেয়েরা আর দুপুরে যথারীতি ক্লাস বসে বড় ছেলেদের জন্য। মাধ্যমিক ইংরেজী স্কুল। হাসপাতালে রোগী নেই শুনে আনন্দ হল, অর্থাৎ লোকজনের স্বাস্থ্য ভাল। একটি দরজীর দোকান, কামারশালা, স্বর্ণকারের দোকান—সব কিছুই আছে। অনেককাল পরে হারমোনিয়াম ও তবলার আওয়াজ শোনা গেল। একদল পাহাড়ী মেয়ে-পুরুষ বাজনা বাজিয়ে নেচে নেচে গান গেয়ে ভিক্ষা করছে। সভ্য জগতের কাছা কাছি এসে পড়েছি। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন সুন্দর ধর্মশালাটিতে আশ্রয় পেলাম। সহযাত্রীরা ইতঃপূর্বেই এসে গরম জিলাপী আর দুধ খেয়ে বসে আছেন। ভারী খুশী। বললেন, "অনেকদিন দুধ না খেয়ে মুখটা কেমন যেন ব ' দুর্বল হয়ে পড়েছিল—তাই মুখের একটু ইলাজ করে নিলুম।"

বেরীনাগ আসবার পথে বদরীনাথ নন্দাদেবী নন্দাকোট ত্রিশূল পঞ্চচুল্লি প্রভৃতি হিমালয়ের চিরতুষারমণ্ডিত পবিত্র শিখরগুলির শোভা অতীব অতুলনীয়। সব কিছুই পিছনে ছেড়ে চলেছি—শুধু ছবি এঁকে ... মানসপটে।

আড়াইটা নাগাত আবার রাস্তা ধরেছি। খাড়া উৎরাই পথ—প্রস্তর-সমাকীর্ণ ও পিচ্ছল। দেখে দেখে খুব সাবধানে পা ফেলতে হচ্ছে। অনেকটা আসার পরে পাওয়া গেল প্রকাণ্ড চা-বাগান। বেরীনাগের চা বিখ্যাত। ঘন পাইনবন। সুক্কাডি চটি পেরিয়ে এলাম। মাঠে মাঠে প্রচুর ধান। হুড়কা বাজিয়ে গান গেয়ে বহু পাহাড়ী স্ত্রী-পুরুষের একত্রে ধান-নিড়ানো দেখবার মতন। গ্রামের সব লোক মিলে পালা করে সারা গ্রামের ধান নিড়োয়। ধান-নিড়ানোর ব ' শেষ হলে চাঁদা

করে বকরী মারে—পুরি পাকায়। মদ খেয়ে মাংস পুরি খায়, আর নাচগান করে। উৎসবের মতন।

এদিকে আমের চাষ খুব। চটিতে চটিতে প্রচুর আম পাওয়া যাচ্ছে—যদিও অমৃতফল নয়। প্রায় ছটায় বনস্পটনে এসে গেছি। গৌরীগড়ের তীরে প্রকাণ্ড গ্রাম। তিনটি ছোট পার্বত্য নদী এখানে মিশেছে—প্রচুর শাকসব্জী, চাষ-আবাদ।

একটি দোকানে আশ্রয় নিয়েছি। সন্ন্যাসী দেখে হাত দেখাতে এল অনেক স্ত্রী-পুরুষ। হাত গুণতে জানি নে শুনে এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ ভ্রূ কুঞ্চিত করে বললে, "যোগী হাত দেখতে জানে না– সে কি রকম? তা ওষুধ তো কিছু দাও, বাবা।" পরে নিজেদের ভাষায় নিম্নস্বরে বলাবলি করছে, "এরা সাধু নয়' অমনি ভেগুয়া নিয়ে বেরিয়েছে। লোক ঠকিয়ে খায়। জটাও নেই, দেখছ না?" তথাস্তু। আমি যে পাহাড়ী ভাষা জানি, তা তারা জানবে কি করে? ডাঃ দে কয়েকজনকে ঔষধ দিলেন। তাতে বিশ্বাস হল না। সাধুর কাছ থেকে ভস্ম জড়িবুটি চাই।

আজ প্রায় দু'পড়াউ—সতরো-আঠারো মাইল। এখন একেবারে মরিয়া হয়ে গিয়েছি। অস্পষ্ট অন্ধকারের মধ্যে পথ ধরা গেল—গৌরীগড়ের তীরে তীরে। দু'পাশে নিবিড় অরণ্য। দূরে বাঘের গর্জন হল। খুব গম্ভীর শব্দ, বন কেঁপে উঠেছে। আমরা সকলে গা ঘেঁষাঘেঁষি করে চলেছি। মজুরদের সর্দার বললে—"ও কিছু নয়। একটু দূরে আছে। ওরা বনচারী—বাঘের প্রতিবেশী। বাঘকে তত গ্রাহ্য করে না। সহযাত্রী মজুরের পিঠ থেকে বন্দুকটা নিয়ে লোড করে ফেললেন। তা বাঘ এল না। একজন বললেন, "এত অন্ধকারে বের হওয়া ঠিক হয় নি।" দূরে দূরে গ্রামগুলি তখনও নিদ্রাচ্ছন্ন।

প্রত্যাবর্তন

শরীর একেবারে অচল। আজ সকালেই মনে হচ্ছে যেন সমস্ত দিনের পরিশ্রমে দেহ জর্জরিত। পা দুটো একেবারে পঙ্গু হয়ে গেছে! তাদেরই বা অপরাধ কি? বেচারীরা খুব চলেছে, অনেক সয়েছে, আর পারে না। গত দু'মাস ধরে অবিরাম গতিতে দুরতিক্রম্য পবত দুর্লঙ্ঘ্য ববফ—সব অতিক্রম করেছে। আব সামান্যই বাকী—ত্রিশ মাইল মাত্র, কিন্তু শেষরক্ষা বুঝি আর হয় না। বসলে হতচেতন হয়ে একেবারে বসে যেতে হবে। রোক্ করে কোনরকমে চলছি। কথা বলার শক্তিও নেই, প্রবৃত্তিও নেই।

নিজেকে টেনে ছয় মাইল অতিক্রম করে এক সময়ে এসে পৌছলাম গনাই চটিতে। সুন্দর স্থানটি। বড় বড বাড়ী, দোকানপাট, প্রকাণ্ড গ্রাম। লোকজনের পোশাক-পরিচ্ছদে যথেষ্ট পারিপাট্য। দূরের এক ঝরনা থেকে নল-সংযোগে প্রচুর জল এনেছে। শহরের আমেজ পাওয়া গেল। একটি দোকানেই ডাকঘর। আমাদের পৌছবার তারিখ জানিয়ে আলমোড়ায় চিঠি ছেড়ে দিলাম। গরম দুধ ও কলা খেয়ে একটু তাজা হয়ে আবার চলেছি। দুপ্রহরের আহারাদি হবে সেরাঘাটে সরযূর তীরে। আরও ছয় মাইল যেতে হবে—শুনলেই গায়ে যেন জ্বর আসে।

গনাইর পরই মন্দমন্দ চড়াই শুরু হল। পাহাড়ের খাঁজে খাঁজে চরে বেড়াচ্ছে গরু মহিষ; রাখালের বাঁশীর স্বর, পাহাড়ী গান, বন্য পক্ষীর কলরব সবই সুন্দর। সহযাত্রীরা এগিয়ে গেছেন—আমি একা একা। সেরাঘাটে দেখা হবে এই বন্দোবস্ত। তিন মাইলের চড়াই শেষ করে নরুভাব্বা-ঘোল চটির ধারে দুটো পথ দুদিকে গিয়েছে। আমি চলেছি অন্য পথটি ধরে। দোকানী দয়া করে ডেকে বললে, "বাবাজী, তুম্ তো আলমোড়া যানেওয়ালা? ওধার মৎ যাও।" দোকানীর ডাকে চমক

ভাঙলো, ফিরে এসে একটু বসলাম। দোকানে চমৎকার মধু, এক টাকা সের। দোকানী অনেক পীড়াপীড়ি করলে, কিন্তু বইবে কে? মধু কেন, অমৃতও যে বইবার শক্তি নেই।

পথ কর্দমাক্ত, অতি পিচ্ছিল, পাথরধসা, সংকীর্ণ ও বিপদসঙ্কুল। প্রায় দেড় মাইল দূর থেকেই সরযূর শব্দ পাওয়া যাচ্ছিল। সাড়ে-এগারটায় পৌঁছে দেখি যে, সহযাত্রীরা প্রচুর আম খেয়ে মৌজকরে বসে আছেন। খুব গরম জায়গা। মনে হল সাড়ে-তিন হাজার ফুট। দুদিকে উচ্চ পর্বতের আবেষ্টনী। খানিক বিশ্রামান্তে সকলে মিলে সরযূতে স্নান করতে গেলাম। মনে পড়ল তুলসীদাসের গানটি—

"···সখাসহিত সরযূতীর, বিহরে রঘুবংশবীর।

তুলসীদাস হরষ নিরখি, চরণরজ পাই।"

এখানে সরযূ নেহাৎ কম চওড়া নয়। বর্ষার দরুন জল ধূসর, স্রোত প্রখর। নদীর জলে ভেসে যাচ্ছিল বড বড় কাঠ। বালক-বালিকাদের ঐ কাঠ কুড়ানোর প্রতিযোগিতা দেখবার মতন। সাঁতার কেটে কাঠের গুঁড়ির উপর চেপে বসে দু'হাত দিয়ে জল কেটে কাঠটি তীরে নিয়ে আসে। অনতিদূরে একটি ক্ষুদ্র শিবালয়। সারাটি হিমালয় জুড়েই শিবজী বাসা বেঁধেছেন!

আহারের পর পুনরায় হাঁটতে আরম্ভ করেছি। কানারীচীনা লক্ষ্য। পাঁচ মাইল। পথ ভুলে যাবার ভয়ে মজুরসর্দার খড়গসিংকে সঙ্গে রেখেছি। জলন্ত রোদ। গরমে আইঢাই করছি। পথে পথে ঝরনা আছে, কিন্তু সে শীতল জল নেই। আহা! তিব্বতের জল কি মিষ্টি, কি ঠাণ্ডা! জল খাই কিন্তু তৃষ্ণা মেটে না। এখন ছায়াশীতল পথ—ঘন চির-বনের ভিতর দিয়ে চলেছি। জালিখেত চটিতে একটু বিশ্রাম নিলাম। দোকানী

বেশ আমুদে লোক। তার কাছে এক 'আদম খোর' বাঘের রোমাঞ্চকর গল্প শোনা গেল। অনেক ভণিতা করে বললে—"বাবাজী, য়্যা জস্‌কস সের ন হৈতি। সো ভগবতী বাহন ছু। আদমি জস্ বোলছ্। আউর দিয় খুটলেন হিট্‌স। কুল্ নিস্তন্ পক্‌ড়ি খাঁছ। এক মহিনা ভিতর পাঁচ পাঁচ আউৎ খৈ হাঁলী।" অর্থাৎ বাবাজী, এ যেমন-তেমন বাঘ নয়—এ ভগবতীর বাহন! মানুষের মতন শব্দ করে, আর দুপায়ে চলে। কেবলমাত্র মেয়েলোকদের ধরে ধরে খায়। এক মাসের মধ্যে পাঁচ-পাঁচ জন মেয়েছেলেকে খেয়েছে।

ছয়টা নাগাত কানারীচীনার এক দোকানে আশ্রয় নিলাম। দৃশ্য অতি মনোরম—দুদিকে প্রশস্ত উপত্যকা। দক্ষিণ-পশ্চিমে 'বিন্‌সর' পাহাড়ের উপর বাংলোগুলি সাদা বিন্দুর মতন দেখাচ্ছে, আর দক্ষিণে ধৌলীচিনা। বিন্‌সরের উচ্চতা নয় হাজার ফুট। অনেকগুলি গ্রীষ্মাবাস আছে বড়-লোকদের।

আজ আর কাউকে তাড়া দিয়ে তুলতে হল না। ভোরে ভোরে সকলে উঠে তৈরী হচ্ছেন। দশ মাইল পথ মাত্র যেতে হবে। টিপ টিপ বৃষ্টির মধ্যেই রওনা হয়েছি। ধৌলীচীনায় এক দোকানে বসে চা পান শেষ করে পথে বেরিয়ে পড়েছি। বেদীচীনাতে পৌঁছে সকলেই গেলেন 'নওলাতে' (ঝরনা) স্নান করতে। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে সভ্য জগতে আলমোড়া শহরে প্রবেশ করতে হবে! আজ আর বিকালে পড়াউ নেই—সহযাত্রীরা অস্বস্তি বোধ করছেন। একজন বললেন, "এখানে পিসুর কামড় খাওয়ার চেয়ে আলমোড়ায় চলে গেলেই হতো। আট মাইল পথ তো!"

আজ যাত্রার শেষ দিনের পথচলা। কখনও মনে হচ্ছে—তাইতো,

এত শীঘ্র শেষ হয়ে গেল? কাল থেকে কি করা যাবে? পথযাত্রাটা যেন আ'াদের দৈনন্দিন অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে। কাল আর হাঁটতে হবে না ভেবে প্রাণটা কেমন যেন ভারাক্রান্ত হয়ে উঠল। তীর্থযাত্রার দুঃখ-আনন্দমধুর বেদনা। ছাড়তে প্রাণে বড় বাধে। . . .

আলমোড়া শহরের টৌলঘরের নিকটেই স্থানীয় শ্রীরামকৃষ্ণ কুটীরের জনৈক স্বামীজীর আলিঙ্গনপাশে বদ্ধ হয়ে বুঝলাম আলমোড়ায় এসে গেছি। শহরে প্রবেশ করে পিচঢালা প্রশস্ত রাস্তার উপর দিয়ে চলতে প্রথমটা কেমন যেন বেখাপ্পা লাগছিল। দু'মাস ধরে করে আসছি চড়াই আর উৎরাই—প্রস্তরময় সংকীর্ণ পথের উপর দিয়ে ৫৯৮ মাইল চলেছি। ক্রমে সাজান-গোছানো বড় বড় বাড়ী, সুন্দর দোকানপাট, লোকজন, ব্যস্ততা! কোথায় এলাম? কেন এলাম এ সভ্যতার কোলাহলের মধ্যে?

তীর্থদেবতার অপার করুণায় দুর্গম তীর্থযাত্রা নির্বিঘ্নে সমাপ্ত হয়েছে। পরম দেবতার চরণে প্রাণের ভক্তি-অর্ঘ্য নিবেদন করে পরিপূর্ণ প্রাণে ফিরে এসেছি; চাই নি কিছুই কিন্তু অনেক কিছু পেয়েছি। এখন সেই দুর্গম পথের সকল স্মৃতিগুলিই মধুর ও আনন্দময়। এতকাল পরেও সেই পুণ্যস্মৃতির ধ্যানে মনে হয় যেন সেই অজানা দেবতার স্নিগ্ধ জ্যোতিতে হৃদয়-দেউল আলোকিত হয়ে উঠে। এখনও তিনি যেন আমার প্রাণের ভিতর নিত্য আনাগোনা করেন। আকুল প্রার্থনা জানাই—

"চন্দ্রোদ্ভাসিতশেখরে স্মরহরে গঙ্গাধরে শঙ্করে
সর্পৈর্ভূষিতকণ্ঠকর্ণযুগলে নেত্রোত্থবৈশ্বানরে।
দন্তিত্বক্‌কৃতসুন্দরাম্বরধরে ত্রৈলোক্যসারে হরে
মোক্ষার্থং কুরু চিত্তবৃত্তিমচলামন্যৈস্তু কিং কর্মভিঃ॥"

—চন্দ্র যাঁর মস্তক আলোকিত করেছে, যিনি মদনভস্ম ও (মস্তকে)

গঙ্গাধারণ করেছেন, যিনি মঙ্গলবিধায়ী, সর্পসমূহ দ্বারা যাঁর কণ্ঠ ও কর্ণযুগল ভূষিত, যাঁর নয়ন হতে নির্গত হচ্ছে অগ্নিশিখা—সেই হস্তিচর্মরূপ-রমণীয়-বসনপরিহিত, ত্রিভুবনসার মঙ্গলময়ের (চরণে) মুক্তিলাভের জন্য চিত্তবৃত্তি স্থির কর। অন্য কর্মের কি প্রয়োজন ?

পরিশিষ্ট

তীর্থযাত্রা শেষ হয়েছে অনেক দিন। কিন্তু মনঃপ্রাণ চিরদিনের মতন হয়ে রয়েছে তীর্থময়—তীর্থের ধূলিতে অনুরঞ্জিত। এখন চকিতে চলে যাই কৈলাসের পাদমূলে, দেহমনের সকল অণু-পরমাণু অনুনাদিত হয়ে উঠে সেই শাশ্বত অনাহত ধ্বনিতে—অবলুণ্ঠিত প্রণাম জানাই। গৌরীকুণ্ডে স্নান করি, মানসের তীরে বসে বসে মুগ্ধমানসে দেখি সেই অনুপম রূপ-গৌরব। তিব্বতের কত বিচিত্র চিত্র ভেসে উঠে মানসপটে! সব কিছুর সঙ্গে মিশে গিয়েছি; আর অনিকেত আমার কৈলাসপতিই হয়েছেন পরম-আশ্রয়। অনুদাত্ত কণ্ঠে গাই কৈলাসপতির জয়গান—চলে যাই এক লোকাতীত লোকে।

*　　　*　　　*

কৈলাসযাত্রা-পথের অনেক প্রয়োজনীয় ইঙ্গিত যদিও পথের বর্ণনার ভিতর প্রচ্ছন্ন ভাবে রয়েছে, তবু পৃথক করে যাত্রা সম্বন্ধে সামান্য একটু নির্দেশ দিয়ে গ্রন্থের পরিসমাপ্তি করব।

সাধারণতঃ বাংলাদেশের যাত্রিগণ বেশীর ভাগই আলমোড়া হতে যাত্রা করে আসকোট, খেলা, গার্বিয়াং ও লিপুপাস হয়ে তাকলাকোটের পথে কৈলাসদর্শন-পরিক্রমা ও মানসে অবগাহন করে ঐ পথেই আলমোড়া ফিরে আসে। এ পথে দূরত্ব প্রায় ৫০৬ মাইল। তার মধ্যে কৈলাস-পরিক্রমায় ৩২ মাইল অতিক্রম করতে হয়। অবশ্য তিব্বতের মাইল কতকটা আন্দাজ করে ধরা। আর কাঠগুদাম রেলস্টেশন হতে মোটর-বাসযোগে আলমোড়ার দূরত্ব ৮৩ মাইল।

পরিশিষ্ট

যদিও আমাদের তীর্থযাত্রার পরে বিগত কয়েক বৎসরের মধ্যে জগতের অন্যান্য স্থানের ন্যায় তিব্বতের অবস্থারও অনেক পরিবর্তন হয়েছে—বিশেষ করে চীন-অধিকারের পরে—তবুও তিব্বতের দুর্গমত্বের ইতরবিশেষ কিছু হয়েছে বলে মনে হয় না।

জুন মাসের গোড়ায় আলমোড়া হতে যাত্রা করে জুনের তৃতীয় সপ্তাহে গার্বিয়াং হতে তিব্বতের দিকে রওনা হওয়া বিধেয়। তাতে করে যাবার সময় ঠিক বর্ষা আরম্ভ হবার পূর্বেই সমগ্র হিমালয় ও তিব্বত অতিক্রম করা সম্ভব। অথচ ফিরবার পথে বর্ষা অনিবার্য।

তিব্বত-যাতায়াতের পথে বিশ্রামোপযোগী স্থানগুলি ও পূর্ব পড়াউ থেকে পরবর্তী পড়াউর দূরত্ব সংক্ষেপে পর পর দেওয়া হল। আলমোড়া একটি জিলা শহর, স্থানের উচ্চতা ৫,৪১৪ ফুট। এখানে হোটেল, বাজার, মোটর এজেন্সি, কুলি এজেন্সি সবই আছে। আলমোড়া হতে গার্বিয়াং পর্যন্ত পথে যে-সকল স্থানে দিনে বা রাত্রে বিশ্রাম নিতে হয়, সর্বত্রই প্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্যাদি সুলভ। এ পথে আহার্য দ্রব্যাদি বয়ে নেবার দরকার হয় না। কুলি এজেন্সির সঙ্গে বন্দোবস্ত করলে কুলি, সওয়ারী বা বোঝাবাহী ঘোড়া, খচ্চর এবং পথপ্রদর্শক—সব কিছুরই বন্দোবস্ত হতে পারে।

আলমোড়ার পরেই বেদিছিনা—দূরত্ব ৮½ মাইল, উচ্চতা ৪,০০০ ফুট, পোষ্ট আফিস, ফরেষ্ট ডাকবাংলো, বাজার দোকান আছে। পরে ধৌলিছিনা—৪½ মাইল, উচ্চতা ৬,০০০ ফুট—ডাকবাংলো, দোকান। এর পরে পরে কানারিছিনা—২½ মাইল—সুন্দর দোকান, ফরেষ্ট ডাকবাংলো বর্তমান। সেরাঘাট—৪¾ মাইল, গনাই ৬ মাইল, বনস্পটন ৬ মাইল। এ-সব স্থানের দৃশ্য অতীব নয়নাভিরাম। [illegible] বা ৩ মাইল পরেই

সুক্লাড়ি—দোকানাদি আছে। পরে বেরিনাগ বা বেণীনাগ—৩½ মাইল, উচ্চতা ৭,০০০ ফুট—বেশ বড় জায়গা, ডাকঘর, অনেক দোকান, ডাকবাংলো। বেরিনাগ হতে চির-হিমানীর অবাধ দৃশ্য মনোরম। থাল—৯½ মাইল, ৩,০০০ ফুট। এখানে রামগঙ্গার দু'কূলব্যাপী অনেক দোকান। পরে ডিডিহাট—১০½ মাইল, ৬,০০০ ফুট। আসকোট—৭ মাইল, ৫,০০০ ফুট। এখানকার ধর্মশালাটি বেশ বড়, নিকটেই বাজার দোকান ও প্রচুর জল। বিশ্রামের উপযুক্ত স্থান।

সাধারণতঃ যাত্রিদল প্রতিদিন ১০।১২ মাইল পথ চলে, এবং কোথায় রাত কাটাতে হবে তা পূর্বদিন রওনা হবার পূর্বেই স্থির করে নেয়। আসকোটের পরে পরে জৌনজীবী ৫ মাইল; বালোবাকোট ৬½ মাইল, ধারচুলা ১০ মাইল (৩,০০০ ফুট)—ডাকঘর, ডাকবাংলো, অনেক দোকান, গণ্ডগ্রাম। এখান হতে গার্বিয়াং পর্যন্ত ঘোড়া চলে না। বোঝাও নিতে হয় কুলির সাহায্যে। যাঁরা পায়ে হেঁটে যেতে একান্তই অসমর্থ তাঁদের কাণ্ডিতে যাওয়া উচিত। কাণ্ডির ব্যবস্থা হতে পারে।

ধারচুলার পরে খাড়া চড়াই পথে খেলা নামক স্থান, দূরত্ব ১০ মাইল—উচ্চতা ৫,৫০০ ফুট; দোকান, ধর্মশালা, ডাকঘর, স্থানীয় কুলিদের বাড়ি। খেলাতে রাত কাটিয়ে উৎরাই পথে ধৌলিগঙ্গার উপরকার পুল পার হয়ে পঙ্গুর চড়াই আরম্ভ হয়, খুব কষ্টকর চড়াই। পঙ্গুর দূরত্ব ৬ মাইল—(৯,০০০ ফুট)। পঙ্গুর ধর্মশালাটি বেশ। এখান থেকে সোসা—৩ মাইল (৮,৪০০ ফুট)—এই প্রথম ভূটিয়া গ্রাম। ধর্মশালা এবং স্থানীয় স্কুল বিল্ডিং-এ আশ্রয় পাওয়া যায়। আরো প্রায় ১৪ মাইল পরে জিপ্তি—(৮,০০০ ফুট), একটি ধর্মশালা, দোকান ও যাত্রিনিবাসের মত প্রকাণ্ড চালাঘর আছে। জিপ্তি হতে মালপা ৮½ মাইল, পথে নিজাং জলপ্রপাত। মালপা ধর্মশালাতে

রাত কাটিয়ে পর দিন বুধিতে (দূরত্ব ৮$\frac{3}{8}$ মাইল, উচ্চতা ৮,৫০০ ফুট) দু'প্রহরে আহার ও বিশ্রামান্তে আরো ৫ মাইল চড়াই পথে গেলেই গার্বিয়াং —১০,৩২০ ফুট।

এখানেই তিব্বতযাত্রার গাইড, ঘোড়া, খচ্চর, জব্বু এবং তিব্বত-ভ্রমণের প্রয়োজনীয় আহার্য দ্রব্যাদি, তাঁবু, মোটা কম্বল, রান্নার বাসন-পত্র, ষ্টোভের কেরাসিন তেল ইত্যাদি বন্দোবস্ত করে নিতে হয়। অনেক জিনিসই ভাড়া পাওয়া যায়। জিনিসপত্রের মূল্য সমতল প্রদেশের তুলনায় বেশী, তবু স... কিছুই নেওয়া উচিত।

সব আয়োজন সম্পূর্ণ করার জন্য গার্বিয়াং-এ দু-এক দিন অপেক্ষা করা দরকার। ভারতবর্ষের ও-দিককার শেষ পোষ্ট আফিস গার্বিয়াং। এখান হতে রওনা হবার পূর্বে তিব্বতে কোন্ কোন্ স্থানে যাওয়া হবে তা পাকাপাকি ঠিক করে সে অনুপাতে ততদিনের জন্য খাদ্যদ্রব্যাদি সঙ্গে নেওয়া উচিত। অন্যথায় বিশেষ অসুবিধায় পড়ার সম্ভাবনা।

আলমোড়া হতে গার্বিয়াং পর্যন্ত কোন পথপ্রদর্শকের প্রয়োজন হয় না, কারণ এ পথে লোক চলাচল প্রচুর। সাধারণতঃ কুলিসর্দারই গাইডের কাজ করে। তীর্থযাত্রী ভারতবাসীদের পশ্চিম-তিব্বতভ্রমণের জন্য এখনও কোন ছাড়পত্রের দরকার হয় না। কিন্তু চীন অধিকারের পর হতে ভারতবাসীদেরও বিদেশী বলে গণ্য করা হয়, এবং লিপুপাস অতিক্রম করে তিব্বতে প্রবেশ করার পরেই প্রথম পালা মিলিটারী আউটপোষ্টে একবার যাত্রীদের নামধাম সব লিখাতে হয় এবং পুনরায় তাকলাকোটে পাকাপাকি-ভাবে অঙ্গীকারপত্রে সই করতে হয়—এই সাধারণ নিয়ম। অবাঞ্ছনীয় জিনিসপত্রও সব তালিকাভুক্ত করে ঐ স্থানে রেখে যেতে হবে—ফিরতি পথে ঐ সব জিনিস তালিকার সঙ্গে মিলিয়ে ফেরত দেওয়া হয়।

তিব্বতে অনুকূল আবহাওয়াতেও ২৪° ডিগ্রি—অর্থাৎ ফ্রিজিং পয়েণ্টের আট ডিগ্রি নীচের ঠাণ্ডা ভোগ করতে হবে। তার উপর বরফপাত, শিলাবৃষ্টি অতিরিক্ত বর্ষা ত আছেই; সেজন্য ভাল গরম পোশাক নেওয়া দরকার। ধুতি চাদর ব্যবহারে অনেক অসুবিধা আছে—তার চাইতে গরম পা-জামা বেশী আরামদায়ক। তিব্বতে বিছানার জন্য অন্ততঃ তিনখানি কম্বল, লেপ, মশারি নেওয়া উচিত। পোশাক সবই গরম কাপড়ের হলে ভাল। পুরুহাতা গেঞ্জী, জামা, সোয়েটার, কোট, ওভার-কোট, পা-জামা, বেলাক্লেভাটুপী, মোজা, পট্টি, গ্লাভস্, চামড়াব জুতা, ওয়াটার-প্রুফ কোট, বিছানাপত্র-বাঁধার জন্য ২ খানি রবার ক্লথ ও পাহাড়-চলার জন্য লাঠি—এ-সব অত্যাবশ্যক।

যাঁরা পার্টি করে যাবেন তাঁদের পক্ষে কিছু ঔষধপত্র সঙ্গে নেওয়া ভাল। ফার্ষ্ট এইডের ঔষধাদি, কুইনাইন, ইনফ্লুয়েঞ্জা টেবলেট, কিছু সালফা ড্রাগ, একটি হট্‌বেগ এবং রান্নাদির বাসনপত্র, বাসন ধোবার সাবান, ষ্টোভ, স্পিরিট, থার্মোফ্লাস্ক, কিছু পেস্তাবাদাম, কিস্‌মিস্, লজেন্স, আচার, চাটনি, কন্‌ডেন্সড্ মিল্ক আর টর্চলাইট, লণ্ঠন গগল্‌স—নিতে হবে। চা চিনি তাকলাকোটেও পাওয়া যায়।

তিব্বত-যাতায়াতের খরচ তিন'শ থেকে হাজার টাকা অর্থাৎ বেশী টাকা খরচ করতে পারলে আরামও বেশী। যাঁদের সামর্থ্য আছে তাঁরা অর্থের কার্পণ্য যেন না করেন। তিব্বতে সঙ্গে বেশী টাকা নিয়ে যাওয়ার কোন প্রয়োজন নেই—বরং উহা বিপজ্জনক। গার্বিয়াং থেকে যাত্রার সময় যে-সব জিনিস ভাড়া করে নেওয়া হবে এবং কুলি, ঘোড়া, খচ্চর, গাইড —এসকলের টাকাও চুকিয়ে দিতে হয় গার্বিয়াং-এ ফিরে এসে, অতএব খাস্ তিব্বতে টাকা-খরচের বিশেষ দরকার হয় না। সেজন্য গার্বিয়াং

থেকে যাত্রার পূর্বেই উদ্বৃত্ত টাকাকড়ি গাবিয়াং পোষ্ট আফিসে রসিদ নিয়ে জমা রেখে যাওয়াই নিরাপদ। ফিরে এসে ঐ টাকা তুলে সব দেনা-পাওনা মিটিয়ে প্রত্যাবর্তন করা যেতে পারে। যদিও বর্তমান গ্রন্থের পরিশিষ্টে প্রতিদিন কতটা যেতে হবে, কোথায় রাত কাটান উচিত—এ-সব বিষয়ের একটা সাধারণ নির্দেশ দেওয়া হল, তবুও আমরা একথা বলতে বাধ্য যে, —বিশেষ করে তিব্বতে—গাইডের পরামর্শের উপর নির্ভরশীল হওয়াই ভাল। কারণ অনেক কিছু নির্ভর করে পারিপার্শ্বিক অবস্থা, আবহাওয়া এবং পার্টির প্রত্যেকের স্বাস্থ্য ও সুবিধার উপর।

আর একটা সাধারণ নিয়ম—দুর্গম অপরিচিত পথে সঙ্গী, কুলি, গাইড্ প্রভৃতির সঙ্গে বন্ধুভাবে সপ্রেম মধুর ব্যবহার করা নিতান্ত প্রয়োজন। তাদের সহযোগিতা ও আন্তরিকতার অভাবে অনেক অপ্রত্যাশিত সমস্যা, অসুবিধা ও বিপদের সৃষ্টি হওয়া অতি স্বাভাবিক। সে-সব ক্ষেত্রে—অন্ততঃ নির্বিঘ্নে তীর্থযাত্রাসিদ্ধির জন্যও—বিশেষ সহনশীলতা ও বিচক্ষণতা অবলম্বনের দরকার। আর পার্টির প্রত্যেককেই সেবাধর্মপালনের মনোভাব অর্জন করতে হবে, নইলে কষ্টবহুল বিপদসঙ্কুল তীর্থযাত্রায় পরস্পরের মধ্যে সম্প্রীতি রক্ষা করা অসম্ভব; ফলে তীর্থযাত্রার মুখ্য উদ্দেশ্যটিই ব্যর্থ হয়ে যায়—সার হয় শুধু পণ্ডশ্রম ও কৃচ্ছ্রসাধন।

বর্তমান গ্রন্থে বিভিন্ন স্থানের বর্ণনার ভিতর দিয়ে এসব প্রয়োজনীয় ইঙ্গিতগুলি নানা ভঙ্গিতে দেওয়া হয়েছে। বিশেষ অনুধাবন সহকারে পাঠ করে সেই সূত্রগুলির মর্ম-উদ্ঘাটনের অনুরোধ জানাই। লেখক উত্তরাখণ্ডের চার ধাম (যমুনোত্রী, উত্তরকাশী, গঙ্গোত্রী, গোমুখী, কেদারনাথ, বদরীনারায়ণ, শতপন্থ, স্বর্গারোহণ (সর্বসমেত প্রায় ৭৫০ মাইল) ও পশ্চিম-তিব্বতের সকল তীর্থ (প্রায় ৬০০ মাইল) এবং কাশ্মীরের অমরনাথ,

ক্ষীরভবানী, সারদাপীঠ প্রভৃতি তীর্থসকল—পদব্রজে বড় পার্টি নিয়ে দর্শন করার সৌভাগ্য লাভ করেছে। সেজন্য দুর্গম তীর্থযাত্রার নানা অভিজ্ঞতা থেকেই লেখক তীর্থযাত্রীদের এ অনুরোধটি জানাতে উৎসুক।

বর্তমানে চীন-অধিকারের পরে কোন বিদেশীকেই তিব্বতে আগ্নেয়াস্ত্র, ক্যামেরা, সিনেমেটোগ্রাফির যন্ত্র, ছবি আঁকার বা লিখবার সাজ সরঞ্জাম ইত্যাদি কিছুই নিয়ে যেতে দেওয়া হয় না।

গার্বিয়াং-এর পরে পরে কালাপানি—১১ মাইল (১২,০০০ ফুট), সিয়াং চুং—৬ মাইল (১৫,০০০ ফুট)। এর তিন মাইল পরেই লিপুলেক্ পাস (১ ,১৬০ ফুট)। ভোরের দিকে লিপু অতিক্রম করে তিব্বতে প্রবেশ করতে হয়। লিপুর পরে প্রথম ধর্মশালা পালাতে—৬ মাইল (১৪,০০০ ফুট), আরো ৫½ মাইল পরে তাকলাকোট—(১৩,১০০ ফুট)।

তাকলাকোটে পৌঁছে পরদিন খোচরনাথ দেখে নেওয়া উচিত, ফিরবার পথে অনেক সময় খোচরনাথ দেখা হয়ে উঠে না। যাতায়াতে প্রায় ২৪ মাইল পথ, দর্শনাদি করে একদিনেই ফিরে আসা যায়। তাকলাকোটে প্রকাণ্ড বাজার—কোন জিনিসেরই অভাব নেই। একটু দুর্মূল্য। এখানে বেশ আরামদায়ক হাঁটু পর্যন্ত পশমের বুট জুতা পাওয়া যায়। ঠিক তাকলাকোট বাজারের নিকটেই প্রায় তিনশত ফুট উপরে পশ্চিম তিব্বতের সর্বাপেক্ষা বড় বৌদ্ধমঠ—শিবলিং গুম্ফা। দেখবার মত মঠ। যাবার মুখেই দেখে যাওয়া ভাল।

তাকলাকোট হতে কৈলাস অভিমুখে রওনা হলে প্রথমেই তিন মাইল দূরে টয়োগ্রাম, আরো ৮½ মাইল গিয়ে রিঙ্গুং (১৪,০০০ ফুট), পরে পরে বালডক্—৪½ মাইল (১৫,০০০ ফুট), গুরলা ফুক্ বা গৌরী উডার—৪½ মাইল, গুরলা-লা অথবা গুরলা পাস—৪ মাইল (১৬,২০০

ফুট)। এ স্থান হতেই প্রথম কৈলাস (২২,০২৮ ফুট), মানসসরোবর ও রাক্ষসতাল দর্শন হয়। গুরলা-লা-র পরে একটি পথ সোজা গিয়েছে রাক্ষসতালের ধার ঘেঁসে বরখা (বা পরখা) হয়ে টারচানে। আর একপথে মানসসরোবব—৭ মাইল (১৪,৯৫০ ফুট), গুছোল গুম্ফা—৪ মাইল (১৫,১০০ ফুট), চিউ গুম্ফাব ধারে গঙ্গাচু—৮½ মাইল, ও বরখা (৯ মাইল) হয়ে আরো ৭½ মাইল দূরে কৈলাসের দক্ষিণে অবস্থিত টারচান (১৫,১০০ ফুট)।

এস্থা: হ:তই আরম্ভ হয় কৈলাস-পরিক্রমা। টারচানের ৫ মাইল দূরে নৈয়াণ্ডি বা ছুকু গুম্ফা। ক্রমে ডিরিফুক গুম্ফা—৭½ মাইল দোলমা-লা—৪ মাইল (১৮,৬০০ ফুট, কৈলাসযাত্রাপথের সর্বোচ্চ স্থান), আরো ছ' ফার্লং নীচে গোবীকুণ্ড, পরে ৯½ মাইল দূবে জুনথুলফুক্ গুম্ফা। এর পরে টারচান—৬½ মাইল। কৈলাসপরিক্রমা ৩২ মাইল পথ।

এবার প্রত্যাবর্তন। ফিরবার পথে অনেকেই মানসসরোবর-পরিক্রমা করে থাকেন। মোটামুটি ৭ দিনের পথ (৬৪ মাইল), চড়াই উৎরাই বিশেষ নেই। টারচান থেকে মানসের তীবাস্থত গুছোল গুম্ফায় এসে পরিক্রমা আরম্ভ হয়। গুছোলের পরে চিউ গুম্ফা—৮½ মাইল, কিপ্ গুম্ফা—৪½ মাইল। চারকিপ-এব পরে ৪½ মাইল এসেই লংবোনা গুম্ফা, আরো ৮ মাইল গিয়ে পুন্রি গুম্ফা এবং ১১½ মাইল পরে সেরালুং গুম্ফা। সব গুম্ফা অবশ্য মানসসরোববের তীরেই নয়। কোন কোন গুম্ফা দেখবার জন্য এক মাইলেব অধিকও যেতে হয়। যাঁদের গুম্ফা দেখবার ইচ্ছা নেই তাঁব৷ মানসে তীরে উপযুক্ত স্থানে তাঁবু খাটিয়ে বাস করতে পারেন।

সেরালুং গুম্ফার পরে পরে ইয়ারন্গো গুম্ফা—১৪½ মাইল (এখান

হতে কৈলাসের দৃশ্য অতি সুন্দর), খোগল্ গুম্ফা—১½ মাইল, গোচুল গুম্ফা ১০½ মাইল। এখানেই পবিক্রমা শেষ।

যাঁরা তীর্থাপুরীও দর্শন কবতে চান তাঁদের পক্ষে প্রথম কৈলাসদর্শনে না গিয়ে নিম্নে প্রদত্ত পথে যাওয়া সমীচীন। তাকলাকোট হতে পর পর টয়ো—৩ মাইল, কার্ণালি—৭¾ মাইল, হারকং—৩½ মাইল, মাপচা চুঙ্গু—৮¾ মাইল, মাপচু—২ মাইল, আনলাং—৩¾ মাইল, সিংলাপচা-লা ১½ মাইল, ছুজুলা—৯¾ মাইল, ছক্রামণ্ডি—৪ মাইল, গ্যানিমা মণ্ডি—৫ মাইল, গ্যানিমা রাফ্—৪½ মাইল, শিথুম—১১½ মাইল, তীর্থাপুরী—১১½ মাইল, টোক্‌পোসাব-চু—৬ মাইল ও তুলচুগুম্ফা—৮¾ মাইল, টারচান—১৯½ মাইল। টারচান হতে কৈলাসপবিক্রমা কবে প্রত্যাবর্তন পূর্ব নির্দেশ অনুযায়ী।

আলমোড়া হতে রওনা হয়ে—গার্বিয়াং, তাকলাকোট, খোচবনাথ, তীর্থাপুরী দর্শন, কৈলাস পরিক্রমা ও মানসে অবগাহন-স্নান করে পুনরায় গার্বিয়াং হয়ে আলমোড়ায় ফিরে আসতে সর্বসমেত প্রায় ৫৯৭ মাইল পথ অতিক্রম করতে হয়। এতে সময় লাগে প্রায় ২ মাস। যাঁরা মানসসরোবরও পরিক্রমা করতে চান তাদের আরও ৬৪ মাইল বেশী হাঁটতে হবে এবং সময়ও লাগবে আরো ৪ দিন বেশী।

* * *

নর্থ ইষ্টার্ণ রেলওয়ের টনকপুর স্টেশন হতে আসকোট হয়ে গার্বিয়াং যাবার আর একটি পথ আছে। সে পথে যাতায়াতে প্রায় ৯।১০ দিন সময়ের লাঘব হয়। টনকপুর স্টেশনের কাছেই বড় বাজার, হোটেল, ডাকবাংলো। টনকপুর হতে পিথরাগড় পর্যন্ত মোটরবাস চলাচল আছে—দূরত্ব প্রায় ৯০ মাইল (হাঁটা পথে প্রায় ৭০ মাইল), বাসে ঐ ৯০ মাইল পথ সাধারণতঃ

একদিনেই অতিক্রম করা সম্ভব। পিথরাগড় কুলি-এজেন্সিতে পূর্ব হতে লিখে ব্যবস্থা করলে মোটরবাস্ থেকে নেমে সঙ্গে সঙ্গেই বোঝার জন্য কুলি, ঘোড়া এবং সওয়ারী ঘোড়া প্রভৃতির বন্দোবস্ত হতে পারে। পিথরাগড় হতে আসকোটের দূরত্ব ত্রিশ মাইল। এই পথটুকুর নির্দেশ গ্রন্থের গোড়ার দিকেই দেওয়া আছে। আর আসকোট হতে গার্বিয়াং পর্যন্ত পথও পরিশিষ্টে অন্যত্র দ্রষ্টব্য। এ পথে প্রাকৃতিক দৃশ্য নয়নাভিরাম। পিথরাগড় একটি মহকুমা শহর; এখানে ধর্মশালা, ডাকবাংলো, হোটেল ও অনেক দোকান আছে, প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রেরও অভাব নেই।

এ পর্যন্ত আলমোড়া বা টনকপুর হতে লিপুলেক্ পাস অতিক্রম করে তিব্বতে প্রবেশপথের বিবরণ দেওয়া হয়েছে। লিপুলেক ছাড়াও বিভিন্ন দিক থেকে এসে তিব্বতে প্রবেশের আরো অনেকগুলি প্রবেশদ্বার আছে। (গ্রন্থের অন্যত্র দ্রষ্টব্য)।

আলমোড়া হতে খেলা নামক স্থান হয়ে আর একটি পথ গিয়েছে দরমা পাস্ অতিক্রম করে কৈলাস ও মানসসরোবরে। আলমোড়া ও খেলার (আলমোড়া ও গাবিয়াং-এর মধ্যবর্তী স্থান) দূরত্ব ১৽ ই মাইল। খেলার পরে পরে যে যে স্থানে হল্ট্ করা যেতে পারে সে-সব স্থানের নাম উল্লেখ করা হল। খেলার পরেই নয়ো—৯½ মাইল, উডথিং—১০½ মাইল, বালিং—১০ মাইল, গো—৭ মাইল (শেষ ভুটিয়াগ্রাম), বিডাং—৬ মাইল, ডাভে—১৩ মাইল, দরমা পাস্—৫½ মাইল (১৮, ৫১০ ফুট), ভারতের শেষ সীমা। অতঃপর স্নুণ্টি—৯½ মাইল, লামা ছোরটেন—৪½ মাইল, ছক্রামণ্ডি—১২ মাইল, গ্যানিমা মণ্ডি—৫ মাইল (এই মণ্ডিতে প্রয়োজনীয় অনেক জিনিস পাওয়া যায়)। গ্যানিমার পরে ছুমারসিলা—১৫½ মাইল, লেজ্ঞানড়াক—১০½ মাইল ও টারচান—১৩½ মাইল।

টারচানের পরে—কৈলাসপরিক্রমা ও প্রত্যাবর্তন দ্রষ্টব্য। এপথে আলমোড়া হতে কৈলাস পরিক্রমা ও মানসে স্নান করে আলমোড়ায় ফিরে আসা পর্যন্ত ৪৬৬ মাইল অতিক্রম করতে হয়।

*　　　*　　　*

আলমোড়া হতে মিলাম হয়ে উণ্টাধুরা পাস, জয়ন্তী পাস ও কুংরিবিংড়ি পাস অতিক্রম করে তিব্বত যাবার পথ।

আলমোড়ার পরেই টাকুলা ১৩ মাইল (গণ্ডগ্রাম), বাগেশ্বর—১৩ মাইল (৩,২০০ ফুট, ডাকবাংলো, গোমতী ও সরযুর সঙ্গম), কাপ্‌কোট—১৪ মাইল, শ্যামধূরা—১১ মাইল, টেজাম্—৭ মাইল, গিরগাম্—৯ মাইল, রথি—৮ মাইল (অপর নাম মানসিইয়ারি, ডাকঘর আছে), বোগদ্বার—১২ মাইল, মিলাম—১৭ মাইল (১১,২৩২ ফুট)। (জোহার ভুটিয়াদের শেষ গ্রাম, এখানে গ্যানিমা মণ্ডি পর্যন্ত যাবার খাদ্যদ্রব্য ও অন্যান্য ব্যবস্থা করে নিতে হয়)। এর পরে ডুঙ্—৮½ মাইল (১৩,৭২০ ফুট, এখান হতেই উণ্টাধূরা পাসের চড়াই আরম্ভ), উণ্টাধূরা পাস—৬½ মাইল, উচ্চতা ১৭,৯৫০ ফুট। এ পাস অতিক্রম করে ২ মাইল উৎরাই পথে ও ১ মাইল চড়াই করে জয়ন্তী পাস (১৮,৫০০ ফুট), পুনরায় ২½ মাইল উৎরাই পথে নেমে এবং ২ মাইল চড়াই করে শেষ গিরিবর্ত্ম কুংড়িবিংড়ি পাস—উচ্চতা ১৮,৩০০ ফুট। এই তিনটি গিরিবর্ত্ম পরে পরে একদিনেই অতিক্রম করে আরও ৫ মাইল পথ চলে ছিরচিন্-এ রাত্রিবাস করতে হয়। স্থানের উচ্চতা—১৬,৩১০ ফুট।

এর পরে থাজাজ—১০ মাইল, গুণবন্তী (অথবা গুণীবন্তী) নদী—১২½ মাইল। (এ নদীটির দুধারেই ক্যাম্পিং গ্রাউণ্ড আছে, এখান হতে গুরলামান্ধাতার দৃশ্য অতীব চিত্তাকর্ষক), এর ৫ মাইল পরে আর একটি

লাভ করেন দীর্ঘ দু'মাস ধরে বিভিন্ন পরিবেশ ও অনিশ্চিত পরিস্থিতির মধ্যে, সেই কষ্টের চিত্রগুলিই এই ভ্রমণবৃত্তান্ত পাঠের ভিতর দিয়ে দু-এক দিনের মধ্যেই মনের উপর একটা তীব্র প্রতিক্রিয়া এনে দেয়। তা বলে কৈলাসযাত্রা শুধু দুঃখময় নয়। তাতে আছে অপার্থিব শাশ্বত আনন্দও।

কৈলাসপতির চরণে প্রণত হয়ে নিবেদন জানাই—

"মম ত্বেতাং বাণীং গুণকথনপুণ্যেন ভবতঃ।
পুনামীত্যর্থেঽস্মিন্ পুরমথন বুদ্ধির্ব্যবসিতা।"

হে ত্রিপুরান্তক! আমি কিন্তু তোমার গুণকথনপুণ্য দ্বারা আমার বাক্যকে পবিত্র করবার অভিপ্রায়ে তোমার মহিমাকীর্তনে বুদ্ধিকে প্রবর্তিত করেছি।
